প্রথম সংস্করণ

জুন ১৯৬০

॥ প্রচ্ছদ ॥

সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

মূল্য : ছয় টাকা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস (১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯) হইতে মুদ্রিত ॥

অগ্রজ বোম্মানা কালিদাসের

করকমলে—

কে. এম. পাণিক্কর

সংসদ সদস্য

(রাজ্যসভা)

শ্রীবোম্মানা বিশ্বনাথম্ আমার 'কেরল সিংহম্' উপন্যাসটিকে বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন জানিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। শ্রীবোম্মানা একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যকে ব্যাপক পরিচিতি দানের জন্য নিজেকে তিনি নিয়োজিত করিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষার ছোট গল্পের কয়েকটি গ্রন্থ যে ইতিপূর্বেই তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, আমি তাহা জ্ঞাত আছি। এই প্রচেষ্টার তাৎপর্য সমধিক ; এই পারস্পরিক আদান প্রদানের কাজে শ্রীবোম্মানা বিশ্বনাথম্ নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন—তাহার জন্য নিঃসন্দেহে তিনি প্রশংসার পাত্র।

তাঁহার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

৩ ওয়েস্টার্ন কোর্ট
নয়া দিল্লী
১৬ই অক্টোবর, ১৯৫৯

স্বাঃ কে. এম. পাণিক্কর

বোম্মানা বিশ্বনাথম্ অনূদিত অন্যান্য গ্রন্থ :

আধুনিক ভারতের গল্প সঞ্চয়ন
কেরালার গল্পগুচ্ছ
আধুনিক ভারতের কবিতা সঞ্চয়ন
অন্ধ্রের গল্পগুচ্ছ
সাগরে যার শয্যা
দুধের স্বাদ
একই সূত্রে গাঁথা
চিংড়ি (মালয়ালম্ উপন্যাস)
রথের চাকা (তেলুগু উপন্যাস)

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনা করেছেন পূর্ণ বিকশিত পদ্মের সঙ্গে যা হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতার সম্মিলিত রূপ,—এক এবং অবিচ্ছেদ্য কিন্তু বহু দলে বহুমুখী।

ইংরেজ শাসনের গুণেই হোক আর আমাদের পরাধীন মনোবৃত্তির জন্যই হোক আমরা বিদেশকে যতটা জেনেছি, দেশের সংস্কৃতিকে আমাদের ততটা জানা হয় নি। আজও যে এই অবস্থার অবসান হয়েছে তা বলা চলে না। সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। ইংরেজী সাহিত্য সম্পর্কে আমরা যতটা ওয়াকিবহাল এমন বোধ করি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও নয়। রুশ ও ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যতটুকু পরিচয় আছে, পাশের দেশ চীন বা ব্রহ্ম সাহিত্যের সঙ্গে যোগ বোধ করি তার শতাংশ। নরওয়েজিয়ান অনেক লেখকের নাম আমাদের কণ্ঠস্থ, কিন্তু একজন মারাঠী, কানাড়ী কিংবা ওড়িয়া সাহিত্যিকের সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ। অথচ এই না জানার আড়ালে সে সব সাহিত্য কিন্তু দ্রুত বিকশিত হয়েছে। আর তার চেয়ে বড় কথা এরা আমাদের স্বদেশের সাহিত্য—যা না পড়লে দেশকে জানাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ভাষা সমস্যা বর্তমান ভারতের একটি বড় সমস্যা। একই ভূগোল ও ইতিহাসের বিষয়বস্তু, একই শাসনে অনুশাসিত এত ভাষাভাষীর দেশ পৃথিবীতে বিরল। গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশের সাহিত্য যে পরিমাণে বাঙালীর চোখের সামনে অনুবাদের মাধ্যমে দেখা দিয়েছে, দ্বারের পাশের প্রাদেশিক সাহিত্যাবলী সে তুলনায় কণামাত্র পরিচিত হয় নি। গত কয়েক বছর ধরে বাঙালীপাঠকের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা চলেছে। এই অনুবাদ সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে ইতিমধ্যে যে বৈচিত্র্য দান করেছে, বাহুল্য হলেও সবিনয়ে নিবেদন করা প্রয়োজন যে তাতে আমারও কিছুটা অংশ আছে।

'কেরল সিংহম্' বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত সর্দার কে. এম. পাণিক্করের সুপ্রসিদ্ধ মালয়ালম্ উপন্যাসের অনুবাদ। এই উপন্যাসের পটভূমিকা

ঐতিহাসিক। বণিকের মানদণ্ড কিভাবে কেরলে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল তার একটি ইতিবৃত্ত এই উপন্যাস। ইতিহাসবিদ্ হয়েও শ্রীপাণিক্কর এই গ্রন্থে কেরলের রাজা ও জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা-শক্তিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রাণমাতানো কথাকলি প্রভৃতিতে ভবা অনিন্দ্যসুন্দর এক প্রেমকাব্যেব মাধ্যমে অনবদ্য সাবলীল ভঙ্গিমায় রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

এই গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ এবং প্রকাশ করার অনুমতি পাওয়ায় আমি শ্রদ্ধেয় পাণিক্করের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এই উপন্যাসের তর্জমা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী যাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, তিনি হলেন বন্ধু শ্রীবঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পরেই নাম করতে হয় বন্ধু শ্রীধনপতি বসু ও শ্রীসত্য চক্রবর্তীর। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সর্বপ্রথমে যাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত ছিল, তিনি হলেন বিদ্যোদয় লাইব্রেরীর কর্ণধার শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পরিশেষে, প্রাদেশিক সংস্কৃতির বিনিময় ঘটানোর এই প্রয়াসের জন্য পাঠকমহলের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভের আশা পোষণ করি।

৬২ নিমতা রোড
বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা
২০শে জুন ১৯৬০

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

এক

পায়ে-হাঁটা পথ। কোট্রায়াম থেকে সোজা পান্নুর চলে গেছে। মানুষ পারতপক্ষে এপথ মাড়াত না তখনকার দিনে। দস্যুদল, পদচ্যুত নৃপতি অথবা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগৃহীত লোকজনের উপদ্রবে ভৌতিক বিভীষিকাময় ছিল এপথ। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনেও ধনীরা পর্যন্ত দেহরক্ষী বা সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে না নিয়ে এপথে যাতায়াত করত না। পথের তু পাশে তু-একটা অবহেলিত ক্ষয়িষ্ণু উদ্যান চোখে পড়ে। জনশূন্যতায় সেগুলি হৃত-যৌবন—বিগতশ্রী। পরিচর্যার অভাবে পুষ্পবৃক্ষগুলি নিঃশেষপ্রায়। পরগাছায় ভরে গেছে চারিদিক। জনবিরল এই আস্তানাগুলি একে একে পরিণত হয়েছে দস্যু-তস্করের আশ্রয়স্থলে। কোম্পানীর সঙ্গে কোট্রায়াম রাজার বিবাদের ফলেই একদা-শোভন এই স্থান আজ জনশূন্য হয়ে পড়েছে।

কাহিনীর উদ্বোধন দিবসে সূর্যাস্তের দণ্ড তুই পূর্বে ঐ ভয়াবহ নির্জন বনপথে একজন যুবক ও একটি যুবতীকে অগ্রসর হতে দেখা গেল। যুবকটি সবে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়েছে। যুবতী অষ্টাদশী। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাদের। ক্লিষ্ট পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে তারা। যুবকের কটিদেশে ছুরিকা, তার দক্ষিণ হস্তে শাণিত কৃপাণ। বাহ্য লক্ষণে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে নায়ার গোষ্ঠীভুক্ত। শ্রম আর উদ্বেগ-ক্লান্ত দেহ তার পদক্ষেপকে কিন্তু শ্লথ করতে পারে নি। দৃঢ়তাপূর্ণ সতর্কতা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার উজ্জ্বল তু চোখের তীক্ষ্ণ

ক্ষীণতম একটি শব্দও তার সদাজাগ্রত শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রতারিত করতে অক্ষম। পেশল সুগঠিত দেহ, বীরোচিত ধীর ও নির্ভীক অগ্রগমন এবং ভয়লেশহীন অথচ ক্লান্ত মুখসৌষ্ঠবে মনেই হয় না যে পথিক বয়সে অতি নবীন।

সঙ্গিনী যুবতীর পরিধানে সেকালের প্রথা-সিদ্ধ পোশাক। তার নিম্নদেহার্ধ আবৃত শ্বেত শুভ্র ধুতিতে। দেহের অপরার্ধে বক্ষ ঘিরে এক বস্ত্রখণ্ড তার সুপুষ্ট স্তনযুগলের ঔদ্ধত্যকে লোকচক্ষুর কিছুটা অন্তরালবর্তী করে রেখেছে মাত্র। পরিশ্রান্ত দেহ—নয়নযুগলে তার বুঝিবা বিশ্বের স্বপ্ন এসে বাসা বেঁধেছে। নারিকেল বনবীথি ঘেরা কেরলের শ্যামল সৌন্দর্য যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তার দেহের প্রতি অঙ্গে। প্রথম দর্শনেই বোঝা যায়, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে সে।

নিঃশব্দ পথ পরিক্রমা চলেছে দুজনের। চারিদিকের স্থির অচঞ্চল নিস্তব্ধতা শুধু অল্প মাত্র ব্যাহত হচ্ছে তাদের গতিবেগের চঞ্চলতায়। যুবতীর প্রতি পদক্ষেপে ঝরে পড়ছে ক্লান্তি। তারা চলেছে তো চলেছেই। মনে হয় এ চলার শেষ বুঝি আর হবে না। হঠাৎ তরুণীর ব্যথাতুর অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে ভেঙে-চুরে খানখান হয়ে গেল সেই নিঝুম বনভূমির নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা—

'আমি আর এক পা-ও হাঁটতে পারছি না; ক্ষিদের জ্বালা আর সহ্য হয় না—তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে।'

'আর অল্প পথ মাত্র বাকি।'—যুবক তাকে সাহস যোগাবার ভঙ্গিতে বলে, 'দেরি করলে রাত হয়ে যাবে। ধারে কাছে কোনো লোকালয়ও দেখতে পাচ্ছি না। তুমি বরং এসো আমার হাত ধরে চলো।'

'আমি আর পারছি না ভাই, আর এক পা-ও এগোনোর শক্তি আমার নেই।'—থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মেয়েটি বলে, 'আমি এই পথের ধারে বসি। তুমি একটু এগিয়ে দেখে এসো কাছাকাছি সাহায্য করার মতো কাউকে পাও কি না।'

'এই গভীর বনের মাঝখানে তোমাকে একা ছেড়ে যাই কি করে?

আর এই নির্জন পথের ধারে একা বসে থাকা তোমার পক্ষেও কি সম্ভব? যতদূর মনে হয় তাতে কোনো সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাই এখানে আমাদের নেই। তার চেয়ে এসো আমরা বরং এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিই। তারপর চলতে চলতে ভগবতীর কৃপায় যদি কোনো উপায় হয়তো ভালোই।'—অনুনয়ের স্বরে যুবক বলে।

শেষ পর্যন্ত তারা দুজনে ঐ পথের ধারে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে পড়ে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জর্জর আর সারাদিনের পথশ্রান্ত তার ক্লান্ততনুকে যুবতী এলিয়ে দিল ঐ বৃক্ষমূলে। মুহূর্তমধ্যে নিদ্রাদেবীও তাঁর মায়া বিস্তার করলেন। আয়তনয়নার চক্ষু দুটি নিমীলিত হয়ে এলো।

সূর্যাস্তের তখনও বেশ কিছু সময় বাকি ছিল। গন্তব্যস্থল আর মাত্র তিন মাইলের মতো দূরবর্তী। দূরত্বটা এমন বেশী কিছু নয়। কিন্তু সহোদরার অবসাদ ও অসামর্থ্য যুবককে ভাবিয়ে তুলল। যে ধীর গতিতে তারা অগ্রসর হচ্ছে তাতে এই অরণ্যপথ অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই বুঝিবা সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসবে। দিনেই এপথ ভয়াবহ। রাত্রে এপথের পথিক হওয়ার কথাও অচিন্তনীয়, বিশেষ করে একমাত্র সঙ্গিনী যখন শ্রমকাতরা নারী। দেশে অরাজকতা এমন পর্যায়ে উঠেছে যে সঙ্গীহীন অসহায় মানুষকে অপহরণ করে হরণ-কারীর দাসত্ব বরণে বাধ্য করতেও নরাধমদের বাধে না। নরপিশাচ কুঞ্জিক্কোয়া মারাক্কারের অনুচরবর্গের অন্যতম পেশাও তো এই-ই। ক্ষুধার্ত ফেরুপালের মতো তারা অহরহ ঘোরাফেরা করে এই সব বিপদভরা পথে-প্রান্তরে। সুতরাং যে কোনো প্রকারেই হোক সন্ধ্যা সমাগমের পূর্বেই নিরাপদ আশ্রয়ের সান্নিধ্যে পৌঁছানো ছাড়া যুবকটি পরিত্রাণের দ্বিতীয় কোনো পথই খুঁজে পায় না। আরো কিছুক্ষণের বিশ্রাম যদি তার ভগ্নীর দেহে এবং মনে কিছু পরিমাণ শক্তির সঞ্চার করতে পারে তবে তারা সূর্যাস্তের আগেই অরণ্যপথ অতিক্রম করে লোকালয়ে পৌঁছাতে পারবে। আর তাহলে কোনো-না-কোনো নায়ারের বাড়িতে রাত্রির আশ্রয় খুঁজে নিতে তাদের অসুবিধা হবে না।

নিদ্রিতা সহোদরার পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবক উপস্থিত সমস্যার আশু সমাধানের চেষ্টায় উদ্‌গ্রীব, হঠাৎ তার দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি অগ্রসরমান অস্পষ্ট দুটি অপরিচিত মূর্তির উপর পড়ল। চিন্তাপ্রবাহে ছেদ পড়ল তার। নির্জন স্থানে অজ্ঞাতকুলশীলদের আকস্মিক আবির্ভাবে ভরসার চেয়ে যেন ভয়েরই সঞ্চার হয় বেশী। তাই যুবক মনে মনে কিছুটা বিচলিত বোধ করল। আগন্তুক মূর্তি দুটিও ক্রমে স্পষ্টতর হতে থাকে। বেশভূষা ও গতির সাবলীলতায় পুরোবর্তী ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত বলে নিশ্চিত প্রতীতি জন্মায়। অপরজনে মনে হয় প্রথমোক্ত জনেরই পার্শ্বচর শ্রেণীর। মূর্তি দুটি নিকটতর হবার অবসরে যুবকও যে কোনো অবস্থার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। তার দক্ষিণ হস্ত স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই কোষবদ্ধ তরবারির সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়ে পড়ে।

আগন্তুকদ্বয়ের দৃষ্টিও দূর থেকেই তরুণতরুণীর উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। জনমানবহীন বিপদসংকুল পথে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এদের উপস্থিতি তাঁদের কিছুটা অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছিল। তবে এরা যে বিপদগ্রস্ত সে বিষয়ে তাঁদের কোনো সন্দেহই ছিল না। বৃক্ষতলে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যুগপৎ কৃপাণ ও রিভলভারে সজ্জিত অগ্রবর্তী গম্ভীর প্রকৃতির লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার উভয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখমণ্ডলে নেমে এলো কোমল সহানুভূতির মৃদু ছায়া। কিন্তু নিরুদ্বেগ মোলায়েম কণ্ঠে যুবকের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন—

'অনুমান করছি তোমরা বিপদগ্রস্ত। সাহায্যের প্রয়োজন থাকলে বলতে পারো।'

'আজ সকাল থেকে আমরা হাঁটছি',—যুবক উত্তর দেয়, 'আমার এই বোন ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে এখানেই বসে পড়েছে। এদিকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে দেরিও হয়ে যাচ্ছে। এখন ভগবতী পোর্কলীই একমাত্র ভরসা।'

মুহূর্তমাত্র কি যেন ভেবে নিয়ে আগন্তুক তাঁর সঙ্গীকে আদেশের

সুরে কয়েকটি নারিকেল ফল সংগ্রহ করে আনতে বললেন। আদেশ প্রতিপালিত হতে বিলম্ব হলো না।

ডাব সংগৃহীত হওয়ার পর যুবক তার নিদ্রিতা ভগ্নীকে ডাক দিল। সুপ্তোত্থিতা তন্বী দুটি পুরুষমূর্তিকে দেখে বিহ্বল ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ভ্রাতার দিকে চেয়ে রইল। নারিকেল ফলের স্নিগ্ধ নির্মল বারি পানে অনুরুদ্ধা হতেই সে অবশ্য বুঝল ভয়ের কিছু নেই। পরম তৃপ্তির সঙ্গে প্রকৃতিদত্ত শীতল জলপানে তার দেহ যেন নবশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। শান্ত, শীতল আর সতেজ একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল তার তনুর অণুতে অণুতে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে কতভাবে কত রকমের সঞ্জীবনী সুধা যে সঞ্চিত আছে ভেবে সে মনে মনে আন্তরিক প্রণাম জানায় দেবী পোর্কলীর উদ্দেশে। চারিদিকে ভালোভাবে চোখ মেলে দেখার আর বিচার করার মতো স্বাভাবিক অনুভূতিকে আবার সে যেন ফিরে পেয়েছে। আর তাই তার আঁখিপদ্মের কোরক দুটি ঈষৎ বিকশিত হয়ে ন্যস্ত হলো প্রথমোক্ত আগন্তুকের উপর। কিন্তু বেশীক্ষণ সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা অসম্ভব। যৌবনের জ্বালাভরা সে মুখের গাম্ভীর্যময় দ্যুতিতে যে কোনো যৌবনবতীর মুখ আরক্ত এবং নয়ন আনত হতে বাধ্য। তাছাড়া শুধুমাত্র তারুণ্যের দ্যুতি নয়—আরো কিছু যেন তাদের চারি চক্ষুর চকিত মিলনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল ঐ কেরলকন্যা। নয়নে প্রতিফলিত হৃদয়ের স্বতোৎসারিত ভাষাকে গোপন করার জন্যও নবযৌবনা তার শির আনত করল। তখন নতমুখীর উদ্দেশে সেই যুবা পুরুষ বললেন, 'ক্লান্তি যদি দূর না হয়ে থাকে তবে আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও। অন্ধকার হবার আগেই আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবো।'

'এখনো আমাদের তিন-চার মাইল পথ হাঁটতে হবে, কাজেই আর কালবিলম্ব না করাই বোধ করি সঙ্গত হবে।'—যুবতীর ভ্রাতা জবাব দেয়।

আগন্তুকের প্রশ্নে যুবক তাদের মর্মান্তিক দুঃখজনক কাহিনী

শুরু করল। তার বিবৃতিতে জানা গেল সেই দিবসের পূর্বরাত্রে কয়েকজন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত আকস্মিকভাবে তাদের কণ্টেরী গ্রামস্থিত বাসভবনে হানা দেয়। তাদের অভিভাবক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ঐ দস্যুদলের নৃশংসতার যূপকাষ্ঠে প্রাণ হারিয়েছেন। যাবতীয় ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে আর তাদের বাসগৃহ হয়েছে ভস্মীভূত। তারাই কেবলমাত্র আত্মগোপন করে কোনোমতে প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে।

সমস্ত ঘটনা শুনে ক্রোধক্ষুব্ধ কণ্ঠে আগন্তুক বললেন, 'কোট্টায়ামের এত কাছেও তাহলে আক্রমণ শুরু হয়েছে! আচ্ছা, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ ঐ শয়তানরা কারা? শুনেছ কিছু?'

'শুনেছি কুরুং প্রদেশের শাসকের লোকেরাই এসব কাজ করছে, কর আদায়ের জন্য তারা কণ্টেরী এসেছিল। আমার ভাই রাজার দলভুক্ত লোক, তাই তাদের সঙ্গে কিছু তর্কবিতর্ক হয়। হয়তো এরই জন্য এ ঘটনা—'

যুবকের কথা শেষ হবার আগেই মেয়েটি বলে উঠে,—'কিছু লোকের কাছে আবার শুনেছি কৈনেরীর আম্পু নায়ারই এইসব করিয়েছেন।'

'দিদি, রাজার লোকদের মিছামিছি দোষ দিচ্ছ কেন? আম্পু-বাবু এ ধরনের কাজ কখনই করতে পারেন না।'—অনুযোগের সুরে যুবক বলে।

ভাইয়ের অভিযোগে থতমত খেয়ে যুবতী আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে জবাব দেয়,—'আমি কাকীমার মুখে শুনেছি, তাই বললাম।'

'কাকীমা তো বলবেনই। তিনি যে কুরুং প্রদেশের শাসকের সমর্থক।'—ভাইয়ের প্রতিউত্তর আসে।

'আচ্ছা',—ঐ লোকটি জিজ্ঞাসু-চোখে প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কৈনেরীর আম্পুকে জানো নাকি? নতুবা তিনি এসব করান নি এত জোর দিয়ে একথা বলার পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে?'

'এ কখনো হতে পারে না।'—যুবক বলতে থাকে—'দাদা বলতেন আম্পুবাবু রাজার ডান হাত। তাঁর অজ্ঞাতে কিছু হয় না। সত্য কথা বলতে কি আমরা সবাই, এমন কি আমার এই দিদি যে আম্পুবাবুর উপর দোষ দিচ্ছে সেও রাজার পক্ষেই আছে।'

'আমি তো পরের মুখে শোনা কথাটুকুই বললাম।'—পূর্বোক্ত উক্তির উদ্দেশ্যকে পরিষ্কার করার জন্য মেয়েটি বলে ওঠে।

কি যেন ভেবে নিয়ে যুবক আগন্তুকের প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব না দিয়ে উলটে সেই প্রশ্নই তাকে করে বসে,—'আপনি কি আম্পুবাবুকে চেনেন ?'

'নিশ্চয়ই, ভালোভাবেই চিনি।'—স্পষ্ট জবাব আসে ভদ্রলোকের কাছ থেকে।

যুবক আবার বলতে শুরু করে,—'দাদা বলতেন আম্পুবাবুর মতন এমন বাহাদুর আর যোগ্য মানুষ খুঁজে মেলা ভার। তাঁর সান্নিধ্যে আসার ইচ্ছা আমার এত প্রবল যে তার জন্য আমি রণক্ষেত্রে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়তেও প্রস্তুত। আপনি কি আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারেন ?'

লোকটি মৃদু হাস্যে জবাব দেন,—'তুমি এখনো ছেলেমানুষ ; বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে তুমি আম্পুর সঙ্গে লড়বে কি করে ? তোমার অস্ত্রশিক্ষাই তো এখনো শেষ হয় নি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আজকাল তো সেই সাবেকী আমলের লড়াইয়ের কায়দা অচল। হাতে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে সৈনিকের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়লে তো এখন চলবে না। তোমাকে বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে গা ঢাকা দিয়ে লড়তে হবে। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। তোমার দ্বারা এসব কি সম্ভব ?'

'ও-সবের কোনো চিন্তাই করবেন না,'—যুবক গর্বের সঙ্গে বলতে থাকে,—'আমার অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে কেন রাজা এবং আম্পুবাবু যেখানে আছেন সেখানে আমার স্থান হবে না ?'

'কি সব আবোল-তাবোল বকছিস',—অভিমানে গুমরে ওঠে যুবতী,—'মনে হচ্ছে আমাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে পালাতে পারলেই যেন তুই বেঁচে যাস।'

আগন্তুকদ্বয়কে অনুসরণ করে দুই ভাইবোন আবার তাদের যাত্রা শুরু করল। গত দিনের আকস্মিক ভ্রাতৃবিয়োগ-ব্যথা এক দিনের অভাবনীয় কৃচ্ছ্রসাধন আর উদ্বেগের তলায় যেন চাপা পড়ে গেছে। নবজন্ম লাভ করেছে যেন তারা। বিগত জীবনের সমস্ত স্মৃতি ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে তাদের মন থেকে। আসন্ন বিপদ তাদের কাছে এমনই অচিন্তনীয় ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে এসেছে যে এই বিপদ থেকে উদ্ধারকারীর ছাড়া এ মুহূর্তে যেন তাদের মনে আর কারো স্থান হওয়া সম্ভব নয়। এখন তারা ভুলে গেছে যে মাত্র এক দিন আগে তাদের ঘর-সংসার ছিল, আর ছিল তাদের মাথার উপরে অভিভাবক হিসাবে তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়। চরমতম অসহায় অবস্থায় যে বীর আগন্তুক অযাচিতভাবে তাদের দিকে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেছেন তাঁর কথা চিন্তা করতে গিয়ে তাদের মনে পড়ে কেরলের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা পয়শীর আত্মত্যাগ এবং কীর্তির কথা। তাদের মাথা নত হয়ে আসে সেই সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিকের মহত্ত্বের উদ্দেশে যিনি মাতৃভূমির মুক্তিসাধনায় ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে হাসি মুখে বলি দিয়েছেন। দেশমাতৃকার এই সুসন্তান কোন্ জাদুমন্ত্র বলে এই চরম সংকটের দিনে তাদের মনে অভূতপূর্ব এক দেশ-প্রেমের ভাব জাগ্রত করে দিলেন!

নবাগত ভাবতে থাকে, কি ভাবে সে দেশের কাজে আসতে পারে, তারই কথা। চলার পথের সমস্ত বাধা-বন্ধনকে মুক্ত করার সংকল্প নেয় সে মনে মনে।

যুবতীর মনোমন্দিরের সবটুকুই জুড়ে বসেছে নবাগত ঐ ত্রাণকর্তা। সাধারণ শ্রেণীর সংসারী মানুষ যারা ব্যক্তিগত সমস্যার পাঁকেই হাবুডুবু খায় এ ব্যক্তি মোটেই সে ধরনের নয়। তা যদি হতো তবে

নিশ্চয়ই তিনি এই অপরিচিত তরুণতরুণীর জন্য সহযোগিতার সরল হস্ত প্রসারিত করতেন না। আর এ ব্যক্তির শুভ আগমন যথাসময়ে যদি না হতো তাহলে হয়তো বা তারা কোনো দিনই এ অরণ্য-গহ্বর থেকে মুক্তি পেতো না। সুতরাং সাধারণ শ্রেণীর লোক যে তিনি নন এ ব্যাপারে যুবতী স্থিরনিশ্চয় হয়েছে। আর কথাবার্তায় মনে হয় আম্পু নায়ারের সঙ্গে এঁর বেশ ঘনিষ্ঠতাও আছে। আবার চন্ত্রোত-বাবুর সঙ্গে দেখা করাবেন তাও বলছেন। চিন্তা আর চলার ফাঁকে লোকটিকে বারবার ভালোভাবে দেখে নেয় সে।

এইভাবে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চলার পর যুবতী তার ভ্রাতার উদ্দেশে বলে,—'কাম্মু, তুমি কাল আমাকে ছেড়ে এঁর সঙ্গে চলে যাবার পর আমি কি করব? আমাকে কি সারা জীবন মামার কাছেই থাকতে হবে?'

'দিদি, অযথা চিন্তা করছ কেন? যদি আম্পুবাবুর আশ্রয়ে আমরা থাকি তাহলে তিনি আমাদের সুবিধা এবং সুরক্ষার দিকে অবশ্যই নজর দেবেন। এখানে তাঁর অনেক বন্ধু এবং বিশ্বস্ত লোক আছে। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে কাজ করলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের উপেক্ষা করতে পারবেন না।'—ভগ্নীকে আশ্বস্ত করে কাম্মু বলে।

'উনি এমন কি করেছেন যে ওঁর উপর তোমাদের এত বিশ্বাস?' —লোকটি প্রশ্ন করেন।

তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর কাম্মুর বদলে তাঁর দিদি উন্নিই দেয়— 'আম্পুবাবু কি করেছেন জিজ্ঞাসা করছেন? এ তো দেশের সবাই জানে। তিনিই একমাত্র লোক যাঁর নামে অত্যাচারীর হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয় আর অত্যাচারিত শোনে আশার বাণী। অসংখ্য ঘটনায় তাঁর মহত্ত্ব বারবার প্রমাণিত হয়েছে।'

কথায় কথায় তারা দু মাইলের মতো পথ অতিক্রম করেছে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর উৎসাহের আতিশয্যে পথিকদের মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। সবচেয়ে কষ্টসাধ্য এবং অপটু পদক্ষেপ হচ্ছে উন্নির

কিন্তু তাকেই এখন সকলের পুরোবর্তী দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যার পূর্বে চন্দ্রোত পৌঁছানো সম্ভব নয় একথা অনুভব করেও এখন আর কেউ বিচলিত বোধ করছে না।

ক্লান্ত ও দুর্বল উন্নি যাতে উৎসাহ না হারায় তারই জন্য তারা সকলে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। অবশেষে চারিটি পথের সংযোগস্থলে এসে পৌঁছায় তারা। এইখান থেকে একটি পথ চলে গেছে চন্দ্রোতে। ইতিমধ্যে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারিদিকে। এ পর্যন্ত পথও ছিল সমতল। কোনো অসুবিধাই হয় নি। সম্প্রতি সীমার সমীপবর্তী এই পথটুকু প্রকৃত-পক্ষে মেঠো আলপথ। অসমতল এই পথ ধরে কিছুদূর অগ্রসর হলেই পৌঁছানো যাবে চন্দ্রোত-বাড়ি। কিন্তু অন্ধকারে অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে অপরিচিত সর্পিল আলপথ পরিক্রমা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই পা টিপে অতি সাবধানে চলতে থাকে তারা; এবার সর্বাগ্রে চলতে থাকে অস্ত্রধারী ঐ অনুচর, তার পিছনে কাম্মু, তারপর উন্নি এবং সর্বশেষে ঐ লোকটি।

এইভাবে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর অস্ফুট এক শব্দ করে উন্নি থমকে দাঁড়ায়। উদ্বেগপূর্ণ ভঙ্গিতে সকলেই ঝুঁকে আসে তার দিকে। ঘটনা ভয়াবহ কিছু নয়। তার পদতলে একটি কাঁটা আমূল বিদ্ধ হয়েছে মাত্র। কিন্তু চলার উদ্‌যোগ করতেই দেখা গেল কাঁটা তুলে না ফেললে মাটিতে পা পেতে চলা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এই অবস্থায় কাম্মু আর তার ভগ্নী যখন সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় চিন্তাকুল তখন পশ্চাৎবর্তী ভদ্রলোক অগ্রসর হয়ে নেতৃসুলভ কণ্ঠে বললেন, 'চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি একে এটুকু বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। —চল।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল উন্নির স্থান হয়েছে শূন্যদেশে—বক্তার সুবিস্তৃত বক্ষোদেশ আর বাহুদ্বয়ের মধ্যে।

লজ্জায় সংকোচে উন্নির বাগ্‌রুদ্ধ হয়ে গেছে। নীরবে এই ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য হলো সে। তাদের যাত্রা আবার শুরু হলো।

পুরুষস্পর্শ-শিহরিতা তরুণী-দেহকে বক্ষোলগ্ন করে ধীর পদক্ষেপে আগন্তুক অগ্রসর হলেন। অবশিষ্টরা তাঁকে অনুসরণ করতে থাকল। এইভাবে অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হলো।

গৃহস্বামী চন্দ্রোত নাম্প্যার গৃহচত্বরে বসেছিলেন অনুচরবৃন্দ পরিবৃত হয়ে। তিনিই সকলকে স্বাগত জানালেন। অপরিচিত যুবক-যুবতীকে দেখে একটু অনুসন্ধিৎসুও হলেন। কাম্মুদের সাহায্যকারী ভদ্রব্যক্তিটিকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'আম্পু, তোমার হঠাৎ আগমন কি উপলক্ষে ? রাজা ভালো আছেন তো ? এদের পরিচয় কি ?'

তাদেরই সাহায্যকারী সঙ্গীর উদ্দেশ্যে 'আম্পু' সম্বোধন শুনে ভাইবোন উভয়েই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। তারা ভাবতেই পারে না যে তাদের এতক্ষণের সঙ্গী হচ্ছেন বহুপ্রশংসিত আম্পু নায়ার।

আম্পুর কাছ থেকে যুবক-যুবতীর কাহিনী সংক্ষেপে জ্ঞাত হয়ে নাম্প্যার তৎক্ষণাৎ তাদের মাতুলালয়ে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। তারপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য চন্দ্রোত নাম্প্যার এবং আম্পু নায়ার গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন।

দুই

ইরুব দেশের শাসনকার্য পরিচালনকারী সামন্তদের মধ্যে চন্ত্রোতরা একটি গোষ্ঠী। এঁদের চেয়ে ধনী এবং পূজ্য ব্যক্তি উত্তর কেরলে আরো ছিলেন, তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে নেতৃত্বে তাঁদের সামনে দাঁড়ানোর মতো আর কেউ ছিলেন না। তাঁদের একটি গর্ব ছিল যে, তাঁরা কখনো কারো কাছে মাথা নত করেন নি বা কারো তাঁবেদার হয়ে শাসন পরিচালনা করেন না। অনেকেই তাঁদের উপর খবরদারি করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরা কখনো কারো অধীনতা স্বীকার করেন নি। এমন কি কোনো রাজার দেওয়া পদবীও গ্রহণ করেন নি।

সেই সময় ইরুব দেশের ধনীদের মধ্যে চন্ত্রোত নাম্প্যারেরই প্রাধান্য ছিল। তাঁর নাম কুঞ্জিকান্নান। তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। মাংসল শরীর, শাঁসালো ভুঁড়ি, আর অর্ধনিমীলিত চোখ এই সবই যেন তাঁর বিলাস-প্রিয়তার স্বাক্ষর বহন করছে। সত্যি কথা বলতে কুঞ্জিকান্নান নাম্প্যার লড়াই বা কুস্তিতে কোনো আনন্দই পেতেন না। হায়দর আলীর আক্রমণের সময় তিনি খুব অল্প বয়সের ছিলেন। ময়য়ীতে নিজেদের সম্পত্তি দেখা-শোনা করে ফরাসীদের অধীনতায় থাকতেন। হায়দরের মৃত্যুর পর টিপু কেরলে গিয়ে গোলমাল লাগালেন, ভাগ্যক্রমে তাতেও কুঞ্জিকান্নান নাম্প্যারের কোনো ক্ষতি হয় নি। ইরুব দেশের নাম্প্যারদের টিপুর উপদ্রব সহ্য করতে হয়েছিল, চোখে তাদের ঘুম ছিল না। সেই অবস্থাতেও ময়য়ীতে বউকে নিয়ে কুঞ্জিকান্নান নাম্প্যার বেশ নিশ্চিন্তভাবেই দিন কাটাতেন। মাত্র

চার বছর আগে তিনি বাড়ির কর্তার পদে উত্তীর্ণ হয়ে চন্ত্রোতে এসে থাকতে শুরু করেছেন।

ময়য়ীতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার ফলে সাধারণ কেরলীয় অভিজাতদের সঙ্গে কুঞ্জিকান্নান নাম্প্যারের অনেকটা মিল গড়ে উঠেছিল। তিনি ফরাসী ভাষা জানতেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। তরুণ বয়স থেকেই জীবনকে বিশেষ ঢঙে পরিচালিত করার জন্য নাম্প্যার শুধু নিজের দেশেই নয়, সারা ভারতবর্ষের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতেন। জনসাধারণ লক্ষ্য করল, বাড়ির কর্তা হয়ে চন্ত্রোতে আসার পর থেকে আগের সেই পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ যেন নাম্প্যারের কমে যেতে লাগল। নিজের পদমর্যাদা এবং সামর্থ্য অনুসারেই তিনি কাজ করতেন। শুধু তাই নয়, কোম্পানীর লোক রাজাকে নিজেদের এক্তিয়ারে এনে শাসন করতে শুরু করার পর থেকে কুঞ্জিকান্নান নাম্প্যারের ব্যবহারিক জ্ঞান এবং ইউরোপীয় ভাষায় দক্ষতা ইরুব দেশের নাম্প্যারদের খুব সহায়ক হয়ে ওঠে। কোম্পানীর লোকের সঙ্গে যে আদান-প্রদান ঘটত সে সবকিছুর জন্য সেই দেশের অভিজাতরা তাঁর পরামর্শ নিতেন। এসব দেখে-শুনে নলশেরীর সুপারভাইসারও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তবে তিনি মনেপ্রাণে নাম্প্যারকে চাইতেন কি না অথবা শাসন ব্যাপারে তাঁর উপর কোনো আস্থা রাখতেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল। সুপারভাইসারের দৃঢ় ধারণা ছিল যে নাম্প্যারের শত্রুতায় কোম্পানীর ক্ষতি হতে পারে। সেই জন্যই তিনি তাঁকে সম্মান করতেন। কোম্পানীর দৃষ্টিতে অন্যান্য অভিজাতদের উপর তাঁর যে প্রভাব ছিল, তাঁকে ইংরেজরা সন্দেহের চোখে দেখত বলেই এ সম্মান। আর এই প্রভাব ছিল বলেই উভয়পক্ষে তাঁর খাতির ছিল খুব জমজমাট।

কৈনেরীর আম্পু নায়ারের আকস্মিক আবির্ভাবের পিছনে নিশ্চিত কোনো উদ্দেশ্য যে আছে একথা নাম্প্যার বুঝতে পেরেছিলেন। আর

সে উদ্দেশ্য যে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত তাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তাই সম্মানিত অতিথিদ্বয় গৃহে প্রবেশ করে রাজার কুশল প্রভৃতি সৌজন্যসূচক কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের পরই, নাম্প্যার আলোচনাকে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের দিকে নিয়ে আসবার জন্য বললেন, 'যুদ্ধ তো মনে হচ্ছে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কোম্পানী ঐ ধরনেরই একটা কিছুর প্রস্তুতি চালাচ্ছে বলেই তো বোধ হচ্ছে।'

আম্পু নায়ার বলতে থাকেন, 'তারা শান্তিময় জীবন চায় না। সমস্ত শক্তিকে পদানত করে কোম্পানীর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারই তাদের লক্ষ্য। পারস্পরিক প্রীতির ভাব রক্ষা করে পাশাপাশি চলার ইচ্ছা তারা পোষণ করে না।'

'খুবই স্পষ্ট যে কোম্পানীর অস্তিত্ব যতদিন বজায় আছে ততদিন স্বদেশী কোনো রাজা, জমিদার বা সামন্ত কেউই নির্বিঘ্নে শাসনকার্য চালাতে পারবে না। আর কোম্পানীর আসনও এখন সহজে টলার মতো নয়। তার ভিত্তি এখন বেশ মজবুত।'

'বেশ তো, দেখাই যাক না। তবে এটাও ঠিক যে যতদিন আমাদের রাজার শরীরে এক বিন্দুও রক্ত আছে, ততদিন আমাদের দেশে কোম্পানীর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হতে পারবে না। দেখা যাক, কতদিন মানুষের ইচ্ছাকে পদদলিত করে এরা শাসন করতে পারে।'—আম্পু বলেন।

'আমাদের রাজা অবশ্য অধীনতা স্বীকার করার পাত্র নন। তিনি সত্যিকারের বীর। তা সত্ত্বেও কেরলের জয় সম্পর্কে সন্দেহ না করে পারা যায় না। ইংরেজরা শক্তিহীন নয়। তলশেরীতে হয়তো তাদের সৈন্যশক্তি কম। কিন্তু সারা দুনিয়ায় তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ অঞ্চল তাদের খপ্পরে চলে গেছে।' কথাগুলি বলে নাম্প্যার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন আম্পুর দিকে।

'তাদের শক্তির কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে এটাও নিশ্চয়ই ভেবে

দেখা দরকার যে ঐ ইংরেজ সৈনিকরাই বয়নাড়ুর পাহাড়ে কি অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। টিপুর বিপুল সৈন্য কি ভাবে নষ্ট হয়েছে, সেকথা আশা করি আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে।'—আম্পু নায়ার জবাব দেন।

'উভয় পক্ষেরই অনেক সৈন্য নষ্ট হবে।' —নাম্প্যার বলেন, 'যতদিন রাজা জীবিত আছেন ততদিন অবশ্য লড়াই চলবে। কিন্তু এটা তো আর সুলতানদের আমল নয়। এদের সৈনিক আছে অসংখ্য। তোপ, কামান এবং জাহাজ আছে অগণিত। অর্থ আছে অফুরন্ত। ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্য। প্রচুর মালমসলা ওরা খরচ করবে প্রতি টুকরো জমির জন্য।'

'সেইজন্যই কি আপনি পরামর্শ দিতে চান যে, আমরা মাথা নত করি।' —আম্পু জিজ্ঞাসা করেন।

'আমাকে ভুল বুঝো না ভাই। একথা আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে, আজ রাজা ছাড়া কেরলের গৌরবরক্ষার আর কেউ নেই। তিনি হার মেনে নিলে কেরল-লক্ষ্মীর সর্বনাশ হবে আর আমাদের সবাইকে আজীবন অপমানিত আর পদানত হয়ে থাকতে হবে। শত্রুর সামনে রাজার মাথা নত হলে আমরা আর মাথা উঁচু করে থাকব কিসের জোরে। তিনিই তো আমাদের ভরসা।'

'রাজার প্রতি অনড় বিশ্বস্ততাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি নীলেশ্বর থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত আমি পরিক্রমা করেছি কেউই চান না যে রাজা কোম্পানীর অধীনতা মেনে নেন। আর তাঁর দৃঢ়তার উপর সকলের বিশ্বাসও আছে। কাজেই আমাদের পরাজয় কোনো মতেই অবশ্যম্ভাবী নয়—জয় আমাদের হবেই—এ বিশ্বাস আমার আছে।'

'রাজা পরাজিত হবেন না একথা আমিও জানি।' —নাম্প্যার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর কেরলের স্বাধীনতা আর কে রক্ষা করবে?'

'আপনার কথার অর্থ হলো, রাজার মৃত্যুর পর আমরা সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়ব। আমি কিন্তু মনে করি তাঁর আদর্শ আমাদের শক্তি যোগাবে। শরীরে যতদিন দাঁড়াবার মতো শক্তি আছে, যতদিন শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে, ততদিন মুক্ত দেশের পবিত্র আকাশের নিচেই বেঁচে থাকব এইটাই আমাদের শপথ।'

'আচ্ছা এবার আসল কাজের কথা হোক। এখন বলো তো এখানে এত কষ্ট করে আসার উদ্দেশ্য কী?'—নাম্প্যার কথার মোড় ঘোরান।

'আপনি জানেন কি, কোম্পানীর লোকেরা খুব জোড় লড়াই বাধানোর ব্যবস্থা করছে। এই অবস্থায় আপনার মতো লোকের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।'

নাম্প্যার ধীর কণ্ঠে বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার মত আমি জানিয়েছি। আমি কোন্ পক্ষে আছি তা নিশ্চয়ই নূতন করে বলার দরকার নেই। কিন্তু তলশেরী দুর্গের অধীনে থেকে আমরা কি ধরনের সাহায্য করতে পারি?'

'এ সমস্যাও রাজার অজ্ঞাত নয়। তিনি আপনাদের কাছে প্রত্যক্ষ সাহায্যের কথা বলছেন না। আমাদের লোককে শত্রু অত সহজে ধরতে পারুক এমন মূর্খতা আমরা করবই বা কেন?'—আম্পু নায়ার বেশ জোর দিয়েই কথাগুলি বলেন।

'তাহলে আর কি ভাবে সাহায্য করা যায়?'—নাম্প্যার জিজ্ঞাসা করেন—'ধন-সম্পদ দিয়ে যদি সাহায্য করতে হয় তাহলে রাজাকে বলো যে এখানকার সবকিছু তাঁরই।'

'এখন ও-সবের কিছু প্রয়োজন হবে না। ভবিষ্যতে হয়তো কিছু লাগতে পারে। তখন কোথা থেকে কি ভাবে তা সংগ্রহ করতে হবে তা তিনি অবশ্যই জানেন।' —আম্পু নায়ার বললেন।

'তাহলে আর কিসের প্রয়োজন থাকতে পারে?'—নাম্প্যার প্রশ্ন করেন।

'এক্ষুণি বলছি।'—আম্পু বলেন, 'আমাদের কাছে তীর-ধনুক এবং তলোয়ার আছে। তা দিয়ে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। বিশেষ করে বন-জঙ্গলে তীর-ধনুক খুব কাজে আসবে। কিন্তু কমপক্ষে চার পাঁচশো বন্দুক এবং প্রয়োজনীয় গুলি না থাকলে কোম্পানীর সৈনিকদের মোকাবিলা করা যাবে না। এই সব জিনিস তলশেরী থেকেই পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর সেগুলি সেখান থেকে সরানোর জন্য আপনার সাহায্য একান্তভাবেই প্রয়োজন।'

'আপনার এই দায়িত্ব-গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'—কৃতজ্ঞচিত্তে আম্পু বলেন, 'বলাই বাহুল্য যে কোম্পানীর লোক এ ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হলে আপনার পক্ষে তার পরিণাম কি মারাত্মক হবে।'

'তোমরা নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করতে প্রস্তুত যখন আছ; তখন আমি এতটুকুও করব না ভাবতেও কেমন লজ্জা করে। আর সেইজন্যই এই কাজের দায়িত্ব আমি নিজে নিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই তলশেরীতে পাওয়া যাবে না। অন্য কোনো উপায় কী আছে? শুনেছি, ময়য়ীর উপর আপনার খুব প্রভাব আছে?' —আম্পু প্রশ্ন করে।

'বুঝেছি।'—মাথা নেড়ে নাম্প্যার বলেন, 'আচ্ছা দেখা যাক, কতদূর কি করা যায়।'

'আপনার কাছে আমার আরো একটি কথা বলার আছে।'—আম্পু আবার বলেন।

'আমার দ্বারা যা যা হতে পারে তার প্রত্যেকটাই আমি করার জন্য প্রস্তুত।'—নাম্প্যার তাঁকে আশ্বস্ত করেন।

'বিশেষ করে বলছি এইজন্যে যে আপনি তলশেরীর খুব কাছে আছেন।'—আম্পু বলেন, 'সেখানে যে সমস্ত কথাবার্তা হয় তা জানার জন্য কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। শত্রু-শিবিরের সলাপরামর্শ এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা যুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়

কাজ। সেখান থেকে লোক পাঠিয়ে সোজাসুজি খবরাখবর রাখা সম্ভব নয়। এর জন্যও আপনার সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন।'

'তলশেরীতে তোমার যে লোক আছে সে কি খুব বিশ্বাসী ?'—নাম্প্যার আম্পুর চোখে চোখ নিবদ্ধ করে জিজ্ঞাসা করেন।

'আপনি তাকে খুব ভালোভাবেই চেনেন এবং আমি নিশ্চিত জানি আপনারা উভয়ে উভয়কে খুব বিশ্বাস করেন।' —আম্পু জবাব দেন।

'কে সে ? আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না।' —নাম্প্যার বলেন।

'ঐ ব্যক্তিটি হচ্ছে আলীমূসা মাক্কার।'

'তাহলে সে কাজের দায়িত্বও আমি নিচ্ছি।'

গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁদের কথাবার্তা চলতে থাকে। খাওয়া-দাওয়া সেরে শয্যাগ্রহণের জন্য পরস্পরের কাছে বিদায় নেওয়ার সময় আম্পু নায়ার বলেন, 'তাহলে কাল সকালে আমাকে যেতে হবে। আমি জানি না, আমার যাত্রা করার আগেই আপনি বেরিয়ে পড়বেন কি না, তাই এখনই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি।'

'তুমি কোথায় যাবে তা আমি অবশ্য জিজ্ঞাসা করছি না',—নাম্প্যার বলেন, 'তবে কাল সকালে আমিও সুপারভাইসারের সঙ্গে দেখা করতে তলশেরী যাচ্ছি, ঠিক সূর্যোদয়ের পরই আমি যাত্রা করব।'

'আমিও সেখানেই যাচ্ছি।'—আম্পু বলেন, 'আপনি যখন তলশেরী যাচ্ছেনই আমাকেও একজন অনুচর হিসাবে আপনার সঙ্গে নিয়ে যেতে আপনার কোনো অসুবিধা আছে কি ? তা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু খুব ভালো হয়।'

'আমার সঙ্গে ছ'জন পালকীবাহক আর দশজন অনুচর যাচ্ছে। অনুচরদের সঙ্গে যেতে তোমার যদি কোনো আপত্তি না হয় তো আসতে পারো। এ ব্যাপারে আমার কী অসুবিধা থাকতে পারে ?' —নাম্প্যার আম্পুকে জানান।

'তাহলে ঠিকই আছে। তবে আমার তলশেরী যাওয়ার কথা যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে সে দিকে আমাদের দুজনেরই খেয়াল রাখতে হবে।'—সহযাত্রী হবার শর্ত জানিয়ে দেন আম্পু।

* * *

ন্যস্ত কর্তব্য আংশিকভাবে সম্পন্ন হবার পর শয্যায় গা এলিয়ে দিলেন আম্পু নায়ার। সারা দিনের পরিশ্রমের পর তবু তার চোখে ঘুম এলো না। চক্ষু মুদ্রিত করতেই মানসচক্ষুর পর্দায় ভেসে উঠল ক্লান্ত আর ভীতত্রস্ত উন্নির মোহিনী মূর্তি। কিছুতেই সে মূর্তিকে তিনি সরিয়ে দিতে পারলেন না মন থেকে। তাঁর সাহায্য পাবার পর থেকে বিভিন্ন কথাবার্তার ফাঁকে তরুণী উন্নির মুখে যে সুন্দর পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন, তারই ছবি বারবার তাঁর হৃদয়কে আন্দোলিত করতে থাকে। তাঁর উপস্থিতি মেয়েটির মনে যেন এক অদৃষ্টপূর্ব আশার আরক্তিমতা সঞ্চারিত করেছিল যা সহজে ভোলার নয়। তার মনের কি এক গোপন বার্তা যেন আম্পু নায়ারের পরিণত মনেও তুলেছে গুঞ্জনের রোল। উন্নির মুখে প্রতিফলিত বিশ্বাস আর প্রেমের ভাষা যেন তাঁকে বিচলিত করেছে। নিদ্রা বিদায় নিয়েছে তাঁর চক্ষু থেকে। রাজার কাজে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ যোদ্ধার এ ধরনের মানসিক দুর্বলতা অনভিপ্রেত ভেবে চিন্তার গতিধারাকে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করেন আম্পু। কিন্তু ব্যর্থ সে চেষ্টা। বক্ষোলগ্ন সেই কুমারী-দেহের স্পন্দন যেন আম্পুর অনুভূতিকে নাড়া দিতে থাকে।

রাত্রির শেষ পর্বে চিন্তাক্লিষ্ট আম্পু নায়ার গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু পাহাড় এবং জঙ্গলে অভুক্ত দিন আর বিনিদ্র রাত্রি যে যোদ্ধার অভ্যাসগত হয়ে পড়েছে, প্রত্যুষের পাখির কাকলিই তাঁর নিদ্রাভঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট। গাত্রোত্থানের পর অতি দ্রুততার সঙ্গে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করে ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই আম্পু নায়ার দেখতে পান কাম্মু সেখানে হাজির।

'কি কাম্মু ?'—আম্পু জিজ্ঞাসা করেন, 'কালকের পথ চলার ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে তো ? রাজার কাছে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেছ?'

'তা হয়েছি, কিন্তু আপনাকে চিনতে না পেরে কত কথাই না কালকে আমরা বলেছি।'—নিজেদের নির্বুদ্ধিতাজাত অপরাধ স্খালনের চেষ্টায় কাম্মু বলে, 'আমরা তো এই ধরনের ইঙ্গিতও করেছিলাম যে আপনারাই আমাদের ঘরে আগুন দিয়েছেন। এর জন্যে দিদি অনুতাপের লজ্জায় দুঃখে মরে আছে। ঐ উক্তির জন্যে সে বারবার দুঃখ প্রকাশ করছে।'

'তাতে কি হয়েছে ? তোমরা তো অন্যের সন্দেহকে আমার কাছে প্রকাশ করেছ মাত্র। এতে ক্ষোভের কোনো অবকাশ নেই। রাজার কাছে যাবার ব্যাপারে কি তুমি দিদির অনুমতি পেয়েছ ? তুমি চলে গেলে তার সাহায্যের জন্য এখানে তো আর কেউ থাকছে না।'—আম্পু বলেন।

'দিদি তো বলল—আপনার সঙ্গে আমাকে যে কোনো জায়গায় যেতে দিতে সে গররাজী নয়। কাজেই আজকে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান এইটাই আমার প্রার্থনা।'

'আজই তা হতে পারে না।'—আম্পু ধীরে বলেন, 'কারণ আমাকে আরো কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে। এদিকের কাজগুলো সেরে কবে রাজার কাছে পৌঁছাতে পারব এখনই তা ঠিক বলা যাচ্ছে না। তাই বলছি কিছুদিন তুমি এখানেই থাকো।'

এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কাম্মু কিছু বলল না বটে, তবে আম্পু নায়ার বুঝতে পারেন যে, এই নির্দেশের ফলে কাম্মুর মন বিক্ষুব্ধ এবং খুব নিরাশ হয়েছে। তাই কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বলেন,—'অবশ্য এই নির্দেশ তোমার ভালো না লাগলে অন্য ব্যবস্থা করতে পারি। মাত্র কিছুদিনের জন্য তুমি কৈনেরীতে থাকো। রাজার কাছে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার কাছে লোক পাঠাব।'

শাণিত কৃপাণ-হস্তে অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে নামার ইচ্ছা পোষণকারী

কাম্মুর মন এই নির্দেশেও সায় দিতে না পারলেও তবু কৈনেরীতে থাকাও রাজারই সেবায় আত্মনিয়োগ করার সামিল ভেবে সে মন্দের ভালো হিসাবে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিল।

একটু ভেবে নিয়ে আম্পু নায়ার আবার বলেন, 'এখন কৈনেরীতে শুধু পুরনারীরাই থাকেন, রাজার শত্রুরা সেখানে হঠাৎ কোনো অত্যাচারও করতে যেতে পারে। সে মেয়েদের রক্ষার ব্যবস্থা করাও জরুরী। বিশ্বাসী কোনো লোক সেখানে থাকা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কাজেই সেখানে তোমার উপস্থিতির খবর পেয়ে রাজা বরং আনন্দিতই হবেন। আচ্ছা তোমার অস্ত্রশিক্ষা সত্যই কি সম্পূর্ণ হয়েছে?'

'আজ্ঞে তা হয়েছে।'

'তাহলে আজকেই কৈনেরী চলে যাও।'

আম্পু নায়ার তৎক্ষণাৎ একখণ্ড তালপত্রে কিছু লিখে লেখাটি কাম্মুর হাতে দিলেন। ঐ পত্রে তাঁর নিজ ভগ্নীর উদ্দেশ্যে লেখা ছিল—এই লোকটি কিছুদিন ওখানে থাকবে, খুব তাড়াতাড়ি আমরা ডেকে নেব। তারপর তিনি কাম্মুকে বলেন, 'যখন ইচ্ছা রওনা হয়ে যাও। সেখানে তুমি নিজের সতর্কতা এবং কর্মক্ষমতার পরিচয় দেবার সুযোগ পাবে।'

'রওনা হতে আর দেরি কিসের! শুধু বোনের কাছে বিদায় নিতে যা দেরি।'—কাম্মু জবাব দেয়। তারপর চিঠি নিয়ে সে নিজ মাতুলালয়ের দিকে ফিরে যায়।

আম্পু নায়ার নিজের কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে ঐ বারান্দাতেই বসে পড়েন। চাকরদের কাছে জানতে পারেন যে, নাম্প্যারের নিত্যকর্ম এবং স্নান-পূজা-পাঠ শেষ করতে তখনো বেশ দেরি আছে। আম্পু নায়ার চান নাম্প্যারের সঙ্গে তলশেরী যাওয়ার কথা অন্যের কাছে অজানা থাকুক। নবাগত যে ইংরেজ সেনাপতিটিকে লোকে মহাপরাক্রমশালী বলছে, তার জল্পনা-কল্পনা কি জানতে হবে। বোম্বাই থেকে কত সৈনিক আসবে, দেশের কারা কারা তাদের পক্ষে

জোট বেঁধেছে সেসবও জানা প্রয়োজন। একথা সবাই জানে যে কুরুং প্রদেশের রাজা বিভীষণ হয়ে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছেন। তাঁর দ্বারা অবশ্য বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু কোনো কোনো সামন্তকে ধমক দিয়ে অথবা পুরস্কার ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে তারা দল ভারি করছে কি না তাও জানতে হবে। এসব কথা লোকমুখে খুব চালু আছে। সমস্ত কিছুর সঠিক খবর নেবার জন্যে রাজা আম্পুকে পাঠিয়েছেন। এ খবরও প্রচারিত হয়েছে যে রাজার দলের দুই-তিনজন বিশিষ্ট লোক ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলাতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারেরও সঠিক খবর জানা আবশ্যক।

এই সব সাত পাঁচ ভাবছেন, এমন সময় কাম্মু আবার তাঁর সামনে হাজির হয়। অদূরেই উন্নিও দণ্ডায়মানা।

'পায়ের ব্যথা সেরে গেছে তো ?' —আম্পু তাকে জিজ্ঞাসা করেন।

'কাঁটা বেরিয়ে যাবার পর ব্যথা কমেছে।'—উন্নির কণ্ঠ থেকে যেন মধু ক্ষরিত হয়।

তারপর কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলেন না।

উন্নি বলে, 'এই ভাই-ই আমার একমাত্র ভরসা ; একে আমি আপনার হাত তুলে দিচ্ছি। এরপর ভগবতী শ্রীপোর্কলীর যা ইচ্ছা'—তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে।

'আমি কাম্মুকে নিজে দেখা-শোনা করব।' —আম্পু আশ্বাস দেন, 'তার চিন্তা করো না। যাঁরা রাজার সঙ্গে থাকেন তাঁরা সকলে একই পরিবারের লোকের মতো। আমার কোনো ভাই নেই, কাজেই আজ থেকে কাম্মু আমার সেই অভাব পূরণ করল।'

উন্নির চোখ ছলছল করে ওঠে—'আপনাকে চিনতে না পেরে কালকে কত কথাই না বলে ফেলেছি। নিজগুণে ক্ষমা করবেন। নিজের ঐসব কথা ভেবে মনে খুব দুঃখ পাচ্ছি।'

'তা, দুঃখ পাওয়ার মতো এমন কি বলেছ ? রাজার লোকের উপর তোমাদের খুব বিশ্বাস এবং ভক্তি আছে এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই

আমার নেই। আমি বরং তোমাদের সরলতায় খুব খুশীই হয়েছি।'—আম্পু বলেন।

'আপনি এখানে আবার কবে আসছেন?' —শির আনত করে লীলায়িত বক্র দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে যুবতী প্রশ্ন করে।

রাজার সেবায় নিজের সমস্ত কিছু যে উৎসর্গ করেছে সে এই প্রশ্নের কী উত্তর দিতে পারে? 'ভগবান করুন খুব শীঘ্রই যেন আবার আমাদের সাক্ষাৎ হয়।'—আবেগপূর্ণ স্বরে আম্পু বলেন।

একজন পরিচায়ক এসে সংবাদ দিয়ে যায় যে নাম্প্যারবাবু যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

'এখন তাহলে তুমি এসো; কান্মু তুমিও অবিলম্বে রওনা হয়ে যাও।'—আম্পু নায়ার তাদের দুজনকে বিদায় দিয়ে নাম্প্যারের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন।

নিজের ভাই, রাজা এবং আম্পু নায়ারের মঙ্গলের জন্য শ্রীপোর্কলী দেবীর উদ্দেশে প্রার্থনা জানাতে জানাতে ভারাক্রান্ত মনে উন্নি স্থান ত্যাগ করে।

তিন

পরশুরামের এই ভূমিতে সে সময় দুষ্টগ্রহের আধিপত্য চলছিল। তিরুবিত্তাঙ্কুর ক্রমশ ইংরেজদের অধীনতাকে স্বীকার করে নিচ্ছিল। কোচিনেরও ছিল ঐ একই অবস্থা। কিন্তু কোচিনের উত্তরাঞ্চলে অত্যাচার ও অরাজকতা নগ্নতমরূপে প্রকট হয়ে উঠেছিল। হায়দরের বাহিনী পালঘাটের তীর থেকে কেরলের উপর আক্রমণ শুরু করার পর থেকে শান্তি বিদায় নিয়েছিল। শান্তিময় জীবন হয়েছিল বিপর্যস্ত আর সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য হয়েছিল লুণ্ঠিত। মানুষের মধ্যকার স্বাভাবিক সম্পর্কে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল। হায়দর আলীর অত্যাচারী বাহিনীকে প্রতিরোধে অসমর্থ হয়ে মালাবারের প্রধান শাসক সামূতিরি, যাঁর রাজধানী ছিল কোজিক্কোড, থেকে শুরু করে বহু ছোট বড় সামন্ত বিত্ত আর ভূসম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে তিরুবিত্তাঙ্কুরের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পলায়নে যারা অক্ষম হলো তাদের মধ্যে কেউবা নিল অরণ্যে পর্বতে আশ্রয় আর কেউবা স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের ছত্রছায়ায় নিজের মস্তক রক্ষা করল।

হায়দরী অত্যাচারের ভীতি সর্বব্যাপী হলেও আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কেরলবাসীর প্রতিরোধ কিন্তু কোনো সময়ই নিঃশেষিত হয় নি। কেরলীরা নানা পন্থায় মহীশূরের সৈন্যদলকে বিব্রত করে তুলতে লাগল। ক্রোধে বিরক্তিতে টিপু ঘোষণা করলেন যে কেরলবাসীরা হচ্ছে মূর্তিমান শয়তান। নায়ারশ্রেণীর লোকদের দেখা মাত্র তাদের উদ্দেশ্যে নির্বিচারে গুলি বর্ষণের নির্দেশ ছিল টিপুর লোকজনের উপর।

নিজ বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিশোধস্পৃহা টিপুর অনুচরদের করে তুলেছিল চরম অত্যাচারী। আক্রমণকারীদের পৈশাচিক বর্বরতায় কেরলের জনজীবন হয়ে উঠেছিল বিপর্যস্ত, দুর্বিষহ। কেরলের সমসাময়িক ইতিহাস অরাজকতা, বর্বরতা, বীভৎসতা, ভীতি আর সার্বজনীন প্রতিরোধের জটিলতম ব্যাখ্যান।

রাজ্যে সুশাসন না থাকলে শক্তিমান শক্তিহীনের যথাসর্বস্ব হরণ করে। সুসংবদ্ধ শক্তিশালী অত্যাচারীর দল সাধারণ মানুষের জীবন থেকে নিশ্চিন্ততার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দেয়। সবলের অত্যাচারে দুর্বলের ধনসম্পদ, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কিছুই নিরাপদ থাকা অরাজক রাজত্বে সম্ভব নয়। মৎস্যন্যায়ের এই রাজত্বে ব্যবসা-বাণিজ্য রসাতলে যাবে, ধর্ম আর পবিত্রতা হবে নির্বাসিত। লুণ্ঠন আর ব্যভিচার তাই স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের কাছে যা কিছু মূল্যবান সে সবেরই নিরাপত্তাকে কেরলীয় জনসাধারণের জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। অরাজকতার এর চেয়ে চূড়ান্ত প্রকাশ বুঝিবা ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি।

টিপু আর তাঁর পূর্বসূরীদের শ্যেনদৃষ্টির ফলে স্বর্ণপ্রসূ কেরলের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। ঘোর নৈরাশ্যজনক এই পরিস্থিতির মধ্যে একমাত্র নায়াররাই ছিলেন এ দেশের আশা-ভরসা-ভবিষ্যৎ। স্বাধীনতাকামী এই গোষ্ঠীটি সে সময় সীমাহীন দুঃখ বরণ করেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য। ভীরু পলায়নপর সামন্তদের কৃতকর্মের ফলে এঁদের সংগ্রাম বারবার দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু অসম সাহসিকতা, ধৈর্য ও বীরত্বের সঙ্গে তাঁরা সেই বিপদের সম্মুখীন হয়ে দেশপ্রেমের আলোকবর্তিকাকে প্রোজ্জ্বল রেখেছেন। স্বাধীনতা-রক্ষায় নায়ারদের দৃঢ় পণ কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সংগঠনের অভাবে প্রায় প্রতি স্থলেই শুধুমাত্র নিষ্ফল বিক্ষোভে পর্যবসিত হয়েছে। একমাত্র কোট্টায়াম দেশের জনসাধারণই যোগ্য নেতৃত্বাধীনে টিপুর পথ রোধ করে দাঁড়াতে পেরেছিল। প্রথম দিকে অবশ্য অন্যান্য

সামন্তদের অনুসরণ করে কোট্টায়ামের রাজাও তিরুবিতাঙ্কুরের দিকে পালিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যের চতুর্থ রাজকুমার কেরলবর্মা এই ভীরুতার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর বংশের অন্যান্যদের সহগামী তো হলেনই না, উপরন্তু কেরলের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এই বিপুলবীর্য মানুষটির বয়স সে সময় মাত্র একবিংশ বৎসর। এই দৃঢ়চেতা বীরের সুনেতৃত্বে কোট্টায়াম, বয়নাড়ু প্রভৃতি অঞ্চলের নায়াররা মহীশূরের সর্বনাশা আক্রমণকে পরাভূত করার সংকল্পে নিজেদের সুসংগঠিত করে তোলেন। সে সময়ে কেরলবর্মার নিবাসস্থল পয়শীমহল ছিল স্বাধীন কেরলের রাজধানী।

টিপুর কোনো কৌশলই এই বীরশ্রেষ্ঠকে পরাস্ত করতে পারে নি। সুযোগ্য সেনাপতির নেতৃত্বাধীন অসংখ্য সুশিক্ষিত মুসলিম সেনার উত্তাল তরঙ্গের সামনে কেরলবর্মার পরিমিত সামর্থ্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। তাই বিপুল শক্তির অধিকারী প্রতিপক্ষের সম্মুখীন না হয়ে তিনি ও তাঁর অনুচরবর্গ আশ্রয় নিয়েছিলেন পুরলীশ্বর পুরলী পাহাড়ে এবং বয়নাড়ুর গভীর অরণ্যে। এই অরণ্যের অন্ধকার এবং পর্বতের অন্তরাল থেকে মাঝে মাঝে তাঁদের এক একটি দল নেমে আসত টিপুর সেনা-শিবিরকে লক্ষ্য করে। তাদের অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত হতো শত্রুপক্ষ। তাদের সমরসম্ভার লুণ্ঠিত হতো আর শিবিরগুলি হতো ভস্মীভূত। সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল ধরে কেরলবর্মা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শত্রুপক্ষকে এইভাবে বিরক্ত এবং বিধ্বস্ত করতে থাকেন।

ঠিক এই সময় টিপুকে অন্য এক প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়। এই শত্রু হচ্ছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ভারতের অন্যান্য অংশের মতো কেরলেও এই ইংরেজ বণিকদের ঘাঁটি ছিল। বড়লাট কর্নওয়ালিসের নেতৃত্বাধীন সৈন্যের কয়েকটি দল টিপুর সঙ্গে

মোকাবিলার জন্য কেরলের বিভিন্ন অংশে তখন ছড়িয়ে ছিল। তখনো এরা ছিল প্রস্তুতির স্তরে। তলশেরী শহরে কোম্পানীর একটা ছোট ঘাঁটি ছিল। ব্যবসা রক্ষার নামে সেখানে একটি ছোট সৈন্যদল সুসজ্জিত ছিল। তাদের বিচিত্র পদ্ধতিতে সৈন্য সমাবেশের উদ্দেশ্য শুধু পূর্ব দিক থেকে টিপুর উপর আক্রমণ চালানোই নয়, ফরাসীদের সঙ্গে টিপুর যোগাযোগকে বিচ্ছিন্ন করাও তাদের সমর-কৌশলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। আর এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে পশ্চিম দিকের শক্তি সমাবেশও সুদৃঢ়ভাবে হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। সেইজন্য এই চতুর বণিক সম্প্রদায় টিপুর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা পোষণকারী কেরলীয় সামন্তদের কাজে লাগাতে চাইল। তারা সামন্তবর্গকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে রাজত্বের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র মোহ নেই। তারা চায় কেবলমাত্র শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। যে সকল রাজ্যহারা রাজার ভবিষ্যৎ ছিল অনির্দিষ্ট, তাদের প্রলুব্ধ করা হলো এই বলে যে উভয়পক্ষের সাধারণ শত্রু টিপুর পরাজয় ঘটলে ইংরেজ অধিকৃত স্থানগুলির প্রকৃত মালিক হবেন কোম্পানীর উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্যকারী এই সমস্ত সামন্তবর্গই। সামুচিতা প্রভৃতি পলাতক সামন্তের দল কোম্পানীর আশ্বাসে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে নিজ নিজ এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

জনসংযোগবিচ্ছিন্ন এই সমস্ত পলাতক রাজাদের শক্তি-সামর্থ্যের উপর চতুর ইংরেজের বিশেষ কোনো ভরসা ছিল না। তাদের দৃষ্টি ছিল কেরলবর্মার উপর। এই লোকটির প্রতাপ, প্রভাব, বীরত্ব এবং সততাকে কাজে লাগাতে পারলে যে তাদের জয়ের পথ সুগম হবে, একথা বুঝতে কোম্পানীর কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নি। কাজেই তারা কেরলবর্মাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে পেতে চাইল। কেরলবর্মা কিন্তু শুধুমাত্র টিপুর শত্রুতাচরণের জন্য ইংরেজের সাহায্যে অগ্রসর হতে রাজী হলেন না। তিনি শর্ত দিলেন যে যুদ্ধজয়ের পর সমগ্র কেরলের শাসনভার কোট্টায়াম বংশের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ইংরেজ পক্ষ এই শর্তেই রাজী হলো। লিখিত চুক্তিও সম্পন্ন হলো। এখন আর কেরলবর্মার পক্ষে ইংরেজকে সাহায্য না করার কোনো কারণ রইল না। এইভাবে মহীশূরের বাঘকে কেরল থেকে বিতাড়িত করার বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন হলো। যুদ্ধশেষে কিন্তু কোম্পানীর আসল রূপ কেরলবাসীর কাছে ধরা পড়ল। যুদ্ধ সমাপ্তির শর্ত অনুসারে টিপু কেরলের শাসনাধিকার কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দিলেন। ইংরেজ ও কেরল-রাজাদের মধ্যে এই চুক্তি ছিল যে, শেষ পর্যন্ত আবার দেশী সামন্তরা তাদের ক্ষমতা ইংরেজের হাত থেকে ফিরে পাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কুচক্রী ইংরেজ তার শপথের কথা অস্বীকার করল। ব্যবসায়িক পণ্যের সমৃদ্ধতম উৎস কেরল রাজ্যের শাসনভার কেরলবাসীর হাতে তুলে দিতে ইংরেজ রাজী হলো না। ইতিপূর্বে এই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজ অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোম্পানীকে পর্তুগীজ আর ডাচদের সঙ্গে বহু বাদ-বিসংবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে। আজ সেই রাজ্যই যখন হাতের মুঠোয় এসে গেল তখন আবার তাকে হাতছাড়া হতে দেওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতা ইংরেজের অন্তত ছিল না। আর পূর্ব-স্বাক্ষরিত চুক্তি তো ক্ষমতাবান প্রতিপক্ষের কাছে কাগজের অপ্রয়োজনীয় খণ্ড মাত্র। ধূর্ত বণিকের যুক্তির অভাব হয় না। দেশের শাসনভার তারা কাদের হাতে ছেড়ে দেবে? দুর্বল সামন্তবর্গের হাতে? তাদের তো আত্মরক্ষারই ক্ষমতা নেই। সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্য পরিচালনার অযোগ্য তারা। টিপুকে প্রতিরোধের শক্তি তাদের কারুরই নেই। সুতরাং দেশে ইংরেজ শাসন ছাড়া নান্যগতিরন্যথা।

কেরল রাজ্য এখন কোম্পানীর হাতে এলো বটে কিন্তু রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় কোম্পানীর ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার মতো সংগঠন এবং সামর্থ্য তখনো ঐ রাজ্যের ইংরেজদের হয় নি। কর আদায় ও শান্তিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করার শক্তিও ইংরেজদের সে সময় ছিল না। ফলে অরাজকতা হ্রাস পাওয়া দূরে থাকুক আবার

পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করল। টিপুর ভয়ে ভীত ও পলাতক বহু সামন্ত দেখলেন এই-ই সুবর্ণসুযোগ। সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংরেজের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে যতদূর সম্ভব ধনসম্পদ ও ভূ-সম্পত্তি অধিকার করে বসাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং সংখ্যাহীন সুযোগ-সন্ধানীর সীমাহীন অত্যাচারের বন্যাস্রোত বইতে শুরু করল। বহু সামন্ত নিজের দলবলসহ রাজকর্মচারীর ছদ্মবেশে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কর আদায়ের অজুহাতে জনসাধারণের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আবার ইংরেজও স্বহস্তে কর আদায় অসম্ভব দেখে দেশীয় সামন্তদের পাঁচ বছরের মেয়াদে ঐ অধিকার দেয়। ইংরেজদের পক্ষে এ ব্যবস্থার অনেকগুলি সুফল দেখা গিয়েছিল। ক্ষমতাহীন সামন্তবর্গ পাঁচ বছরের জন্য কর আদায়ের অধিকার লাভ করে নিজেদের পূর্বমর্যাদার পুনরুদ্ধার হয়েছে বলে কিছুটা আত্মসন্তুষ্টি লাভ করল। ইংরেজও নিজের শক্তিকে সংহত করে নেবার সময় পেল। এই ব্যবস্থার ফলে কিন্তু চরম দুর্দশা ঘনিয়ে এলো সাধারণ মানুষের জীবনে।

* * *

টিপুর কেরল ত্যাগের পর থেকে ইংরেজদের কাছে কেরলবর্মাই একমাত্র প্রকাশ্য শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হলেন। চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী বণিকদের সঙ্গে আমরণ সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন তিনি। কোট্টায়াম, বয়নাড়ু প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে ইংরেজ আর তার উচ্ছিষ্টভোজীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ঐ অঞ্চলগুলির গণমানসের গভীরে এই আজন্ম-সংগ্রামী মানুষটি স্থান করে নিয়েছিলেন। নানা কৌশলে কোম্পানী রাজাকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাঁর দৃঢ়তার কাছে সব কৌশলই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অধিকারভুক্ত এলাকায় বিভীষণ-সৃষ্টিতে ইংরেজরা ব্যর্থ হয়।

কেরলবর্মার সঙ্গে সংগ্রামে নিঃসংশয়ে জয়ী হবার মতো সৈন্যবলও তখন ঐ অঞ্চলে কোম্পানীর ছিল না। ঠিক ঐ সময় পুনরায় টিপুর সঙ্গে কোম্পানীর সংঘর্ষ বাধার উপক্রম হয়। কুটকু ও বাঙ্গালোর থেকে টিপুর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য কেরলবর্মার সাহায্য না হোক অন্তত নিষ্ক্রিয়তা ইংরেজদের কাছে অতি প্রয়োজনীয় ছিল। তাই তলশেরীর সুপারভাইসারের মধ্যস্থতায় কেরলবর্মার সঙ্গে আঁতাতের চেষ্টা চলে।

শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে টিপুর মৃত্যু হওয়ায় কেরলবর্মার বন্ধুত্ব ইংরেজদের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ফলে সংঘর্ষ আবার তীব্রতররূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিতেই বর্তমান কাহিনীর সূচনা।

তখন কেরলবর্মার বয়স সাতচল্লিশ। দেখে মনে হয় তিনি খুব নির্বিরোধ শান্তিপ্রিয় মানুষ। দেহের গঠন-সৌষ্ঠবে কেরলের পৌরুষ মূর্ত। ঝঞ্ঝা-ঝড় আর মৃত্যুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানানোর উপযুক্ত সুদীর্ঘ সুদৃঢ় চেহারা। প্রশস্ত ললাটের নীচে চোখ দুটি প্রতিভার আলোকদীপ্ত মুখমণ্ডলের সামগ্রিক ভাব দৃঢ়সংকল্পের দ্যোতনায় গম্ভীর। অনন্যসাধারণ এক ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁর দেহের প্রতিটি ভঙ্গিমায়। সেই ব্যক্তিত্বের সামনে ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় শির আপনিই নত হয়ে আসে।

কেরলবর্মার যুদ্ধ-নৈপুণ্য, নির্দেশ দানের শক্তি, ধৈর্য, প্রতাপ এবং আদর্শ নিষ্ঠার কথা শুধু কেরলেই নয় বাইরের বহু দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল অসংখ্য বিপদ-আপদের মুখে কেরলের স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর রক্ষা ও পালনকারী রাজাকে কেরলবাসীরা যে দেবতার মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি করবে-তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেরলবর্মার প্রতি মানুষের এই যে ভক্তিশ্রদ্ধা, এর কারণ শুধুমাত্র তাঁর সংগ্রাম-ক্ষমতাই নয়, দরিদ্রের প্রতি তাঁর দয়া ছিল সীমাহীন। একথা সকলেরই জানা ছিল যে

যারা তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার শরিক, তাদের রক্ষার জন্য তিনি নিজের জীবন পর্যন্ত পণ করতে পিছু-পা হতেন না, তাঁর আশ্রয়ে যেই আসুক না কেন তাকে আশ্রয় দিতে কোনোদিন তিনি ইতস্তত করতেন না। সুখে-দুঃখে তিনি তাঁর দলের প্রতিটি সৈনিকের সঙ্গে সম-অংশীদারিত্বের বন্ধনে ছিলেন আবদ্ধ। কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতিযোগিতায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এমন নায়ক যে আপামর জনসাধারণ ও তাঁর অধীনস্থ সকলের প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

তিনি ছিলেন কোট্টায়াম রাজবংশের ঐতিহ্যগত পাণ্ডিত্যের প্রতিমূর্তি। সেই সময় সঙ্গীতশাস্ত্র এবং নৃত্যকলার 'কলশেখর পেরুখাল' পদাধিকারী ধর্মরাজা রাম রাজ বাহাদুর ছাড়া কেরলে তাঁর সমকক্ষ অন্য কেউ ছিলেন না। কেরলের জাতীয় মানস-সম্পদ নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়-সমৃদ্ধ কথাকলির জন্যে তিনি যুদ্ধের এই উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলিতেও 'বক-বধ' 'কালিকেয়-বধ' 'কল্যাণসৌ-গন্ধিক' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেন। এগুলি তাঁর সাহিত্যিক গুণাবলীর জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে কেরলীয় নৃত্যকলাক্ষেত্রে। বহুমূল্য রত্নভাণ্ডার হিসাবে এগুলি আজও সমাদৃত।

যুদ্ধ আবার শুরু হলো। গভর্নর-জেনারল মহোদয় মহা-প্রতাপান্বিত ও সমরনিপুণ আর্থার ওয়েলেসলি ইংরেজ পক্ষের সেনাপতি নিযুক্ত হলেন। এঁর তলশেরী আগমনের পর থেকেই ইংরেজ পক্ষের যুদ্ধ-রীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। দুই ভাগিনেয় ও নির্বাচিত অনুচরবৃন্দসহ রাজাকে পুরলী পাহাড়ে আত্মগোপন করতে হলো। রাজধানী ত্যাগের পূর্বে শাসন পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গেলেন পয়য়ম পরিবারের চন্তুকে। কর আদায় ও প্রজাদের দেখা-শোনার ভার পড়ে কৈনেরীর আম্পুর উপর। অবিজাক্কাড়ের বড় রানীও রাজার অনুগামিনী হন।

পয়শীর রাজমহল ত্যাগ করে রাজার বনগমনের সংবাদে প্রজা-

সাধারণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। সকলের মুখেই আশঙ্কিত প্রশ্ন—'এর পর কি হবে!'

রাজার আত্মগোপনের সংবাদ অনতিবিলম্বে কোম্পানীর কর্মকর্তারাও অবগত হলেন। রাজা ভীত হয়েছেন দেখে তাঁদের উল্লাসের আর অবধি ছিল না। চূড়ান্ত আঘাতে কোট্টায়াম বংশের শেষ প্রতিরোধকেও ধূলিসাৎ করে দেবার জন্য তাঁদের মধ্যে নিপুণ প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

চার

আম্পু নায়ারের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে কাম্মারন নায়ার (কাম্মু) সন্ধ্যার প্রায় চার প্রহর আগে কৈনেরীর নির্দিষ্ট গৃহের সামনে পৌঁছে যায়। বাড়িটা পথের সামনে ছিল না।

ছোট ছোট পাহাড়ের সারি, তারা যেন সহ্যাদ্রি পর্বতের আদুরে সন্তান। সেই পাহাড়পুঞ্জের কোল ঘেঁষে নারকেল, সুপারি, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছে-ভরা বাগান আর উর্বর ক্ষেত। সাধারণত এই ধরনের শ্যামল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, ক্ষেতের সীমানায় নায়ারদের বাড়িগুলো থাকত। কৈনেরীর বাড়ির অবস্থানও ঐ ধরনেরই ছিল। পথ থেকে ক্ষেতে ঢুকে কিছু দূর যাওয়ার পর দেবীর এক মন্দির। তারই উত্তরে এক বড় প্রাসাদ। আরো কিছুদূর গিয়ে, পুব দিকে ক্ষেতের কাছে যে বাড়িটা চোখে পড়ত সেটা অস্ত্র-চালনার শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। ধনীদের প্রাসাদের সংলগ্ন আখড়ার প্রয়োজনটা সেখানে ছিল খুব বেশী। ঐ ঘরের ঠিক পেছনে উত্তর দিকে কয়েকটা পাহাড় বাড়িগুলোর নির্বাক প্রহরীর মতো দণ্ডায়মান। পূর্বমুখী প্রাসাদটার দক্ষিণে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র।

চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত কৈনেরী-বাড়ি। পথ-চলা মানুষ যে কোনো দিক দিয়েই দৃষ্টি চালনা করুক না কেন সুউচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে তা বাধা প্রাপ্ত হবেই। পথিপার্শ্বের কয়েকজন তাঁতির কাছ থেকে পথের নিশানা পেয়ে ক্ষেত পার হয়ে কাম্মু যখন কৈনেরী-বাড়ির প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়াল তখন বাড়ির ভেতর

থেকে ভেসে আসছিল সুমধুর কণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত। মনে হলো সে সুর যেন স্বাগত জানাচ্ছে।

কাম্মু বুঝতে পারে যে, গায়িকা মাক্কমরানী। তিনি ছাড়া অন্য কেইবা এত সুন্দর গাইবে? সুর ও স্বরের ঝরনাধারার মায়ায় মুগ্ধ বিস্ময়ে নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কাম্মু। তারপর ছোটরানী কোনো কাজে ব্যস্ত নন আঁচ করে সে ফটকের ভেতরে ঢুকে আঙ্গিনায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, রাজা সাহেব পয়শীর রাজমহল ছেড়ে পুরলী পর্বতে আশ্রয় গ্রহণের সময় আবিতীর জক্কারের বড়রানীকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। মাক্কমও তাঁদের সাথী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ছোটরানী মাক্কমের বয়স অল্প। আরণ্য জীবনের দুঃখ-কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারবেন না ভেবে তাঁকে বাড়িতেই রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

বড়রানীর পালা আসার পরও রাজা সাহেব অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড়রানী তাঁর সঙ্গিনী হলেন। টিপুর সঙ্গে যুদ্ধের দিনগুলিতে এই সহধর্মিণীই তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং সংকটময় মুহূর্তে উদ্বেগের সমভাগিনী হতেন। তাই পতিপ্রাণা কষ্টসহিষ্ণু স্ত্রীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করার মতো মানসিক বলিষ্ঠতা তাঁর ছিল না। কিন্তু মাক্কমের কথা স্বতন্ত্র। তিনি যুবতী, সঙ্গীত ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রবলতা দেখে, রাজা সাহেবের এই ধারণাই হয়েছিল যে, তিনি সুকুমার প্রকৃতির দুর্বলা নারী। তাছাড়া আর একটি কথাও তাঁকে ভাবতে হয়। তা হলো, বনবাসে দুজন স্ত্রীর উপস্থিতি বিপজ্জনক হতে পারে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মাক্কমরানীকে কৈনেরীতে ফিরতে হয়।

বাইরে পদশব্দ শুনে মাক্কমের দিদি উন্নিআম্মা চাকরদের আদেশ করেন বাইরে দেখে আসতে।

উন্নিআম্মা গৃহকর্ত্রী। তাঁর স্বামী, পয়য়মবাড়ির চন্তু, রাজা সাহেবের প্রধান কর্মচারীদের মধ্যে একজন। চন্তু অসহায় অনাথ ছেলে হিসাবে রাজা সাহেবের কাছে এসেছিলেন। নিজের যত্ন এবং রাজা সাহেবের স্নেহের ফলে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্মচারীদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন। টিপুর সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন চন্তু ছিলেন মহারাজের ডান হাত। রাজা সাহেবের সম্মতি এবং ইচ্ছার ফলেই অজ্ঞাতকুলশীল এই কর্মচারীটির সঙ্গে উন্নিআম্মার বিবাহ হয়। অনুমতি অবশ্য আম্পু এবং কৈনেরী-পরিবারের অন্যান্যরাও দিয়েছিলেন।

চন্তুকে রাজা সাহেব খুব সুনজরে দেখতেন। দেশেও তাঁর খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। সেজন্য উন্নিআম্মার মনে মনে একটা গর্বও ছিল। ভাবে ভঙ্গিতে তিনি এ-ও বোঝাতে চাইতেন যে দেশের প্রত্যেকটি ঘটনা এবং রাজা সাহেবের অতি গোপন আলোচনায় তাঁর স্বামীর হাত আছে। বাড়ির সকলকে তিনি এই ধারণায় প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন। দু-এক বছর পরে মাক্কম ছোটরানী হওয়াতে, নিজের পদমর্যাদা কিছু খাটো হয়ে গেছে বলে তিনি মনে করলেন। মাক্কমের প্রতি তাঁর ঈর্ষা দারুণভাবে বেড়ে গেল এর ফলে। আর সে ঈর্ষা প্রকাশ পেতো বিভিন্ন অবস্থায় মাক্কমের উদ্দেশ্যে বর্ষিত তাঁর তীব্র, তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের মধ্য দিয়ে। বড় বোনের এই ধরনের ব্যবহারের কারণ মাক্কম কিছুতেই ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। রাজা সাহেব দেশে থাকাকালীন বেশির ভাগ সময় কাটাতেন ছোটরানী মাক্কমের কাছেই। এইজন্যে উন্নিআম্মার তাঁর প্রতি যে ঈর্ষা ছিল তা প্রকাশে সুযোগ পেতো না। রাজা সাহেবের দেশ ছাড়ার পর মাক্কম বাড়ি ফিরে আসেন। এখন উন্নিআম্মা যেন নিজের অধিকার এবং ঈর্ষা প্রকাশ করার অবাধ একটা সুযোগ পেলেন।

কৈনেরী-গৃহে উন্নিআম্মা, তাঁর দুটি বাচ্চা, মাক্কম এবং তাঁর স্বর্গতা দিদির মেয়ে নীলুকুট্টি ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। শৈশবেই নীলুকুট্টির

মা মারা যাওয়ায় মাক্কমের অভিভাবকত্বেই মেয়েটি বড় হয়। পয়শীতে অবস্থান কালেও সে মাক্কমের কাছেই থাকত।

কৈনেরী-পরিবারের আরো জ্ঞাতিগোষ্ঠী অবশ্যই ছিল, কিন্তু তারা অন্য ঘরে থাকত। কৈনেরী-বাড়ির উত্তরের অংশে থাকত চার-পাঁচজন পুরুষ, সাত-আটটি মহিলা এবং তাদের সন্তানসন্ততিরা। উন্নিআম্মার মামা ইক্কাট্টান নায়ার সে-বাড়ির সবকিছু দেখাশোনা করতেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও বুদ্ধি এখনো তাঁর বেশ প্রখরই আছে। দুর্যোগের এই দিনগুলিতেও তাঁর ধন-সম্পদের অভাব ছিল না। ষাট বছর পূর্ণ হবার পর তিনি এক অল্প বয়সী মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে তাকে ঘরে আনেন। লোকমুখে শোনা যেত যে, ইক্কাট্টান নায়ার মন্ত্র-তন্ত্রেও সিদ্ধ ছিলেন। মাঝ রাতে তিনি নাকি শ্মশানে গিয়ে দেবীপূজা করতেন। এ কথাটা অবশ্য সত্যি। বিলিতি ভাবাপন্ন ইক্কাট্টান নায়ার যখন হুইসকি এবং ব্রাণ্ডির পূর্ণপাত্রের বর্ণনা দিতেন তখন মনে হতো যেন, দুগ্ধসাগর মন্থনজাত ঐ অমৃত সেবনের অপার্থিব অনুভূতি বর্ণিত হচ্ছে।

গৃহকর্ত্রীর আজ্ঞানুসারে দাসী বাইরে গিয়ে কাম্মুকে দেখে বিরস ভাবে প্রশ্ন করে, 'কে ? কোত্থেকে এসেছেন ?'

'আপ্পু নায়ারের কাছ থেকে আসছি, ছোটরানীর পত্র নিয়ে।'

'এখানে বসুন, ভেতরে গিয়ে জানাচ্ছি।'

উন্নিআম্মা, মাক্কম এবং নীলুকুট্টি বাইরে আসে। তাদের মধ্যে বয়সের খুব বেশী তারতম্য ছিল না। তা সত্ত্বেও মাক্কমকে চিনতে কাম্মুর অসুবিধা হয় না। দুই বোনই রূপসী বটে, কিন্তু গুরুভার অলঙ্কার-ভূষিতা মহিলাটিকে মাক্কম বলে সে কিছুতেই মানতে রাজী নয়। তাঁর ঠোঁট দুটো পান খাওয়ার ফলে হয়েছিল লাল টুকটুকে। তাঁর বক্ষবাস ছিল মহার্ঘ সোনালী জরিতে বোনা। এসব ছাড়াও মহিলাটির সন্দিহান অশান্ত চক্ষুদ্বয় এবং মুখের প্রতিটি রেখায় প্রতিফলিত অপ্রসন্নতা যেন সোচ্চারে ঘোষণা করছিল যে, তিনি মাক্কম

নন। সে নিজের মনে মনে মাক্কমের একটি মূর্তি এঁকে নিয়েছে আগেই। অবিকল সেই মূর্তিই যেন সে মাক্কমের মধ্যে দেখতে পায়—শান্ত ভাবমণ্ডিত সদাপ্রসন্ন মুখমণ্ডল, ভাবালু দৃষ্টিভরা কাজলকালো চোখ, দু-একটি সাধারণ অলঙ্কার আর অনাড়ম্বর শুভ্র রুচিসম্মত পোশাক। দেখেই কাম্মু চিনে ফেলে মাক্কমরানীকে এবং অভিবাদন জানায়। উন্নিআম্মা চিঠি নেওয়ার জন্য আগে থাকতে হাত বাড়ানো সত্ত্বেও তাঁকে না দেখার ভান করে সে ছোটরানীর হাতেই চিঠিটা দেয়।

কাম্মু বুঝতে পারে নি যে তার এই ভুলের ফলে এক অবাঞ্ছিত শত্রুর আবির্ভাব হতে পারে। আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় উন্নি-আম্মার মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে, চোখের হাবভাব বদলে যায়। মাক্কম তা লক্ষ্য করেন। তালপত্রের সেই লিপিটি তিনি উন্নিআম্মার দিকে এগিয়ে দেন।

'না, থাক',—উন্নিআম্মা মুখ ঘুরিয়ে ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলেন, 'তুই পড়। রাজা সাহেবের গোপন কোনো কথা হয়তো লেখা আছে।'

'লেখা থাকলই বা। তাতে আর লুকোনোর কি আছে।'

'কি যে বলিস, বুঝি না।'—উন্নিআম্মা বলেন, 'সে বিশ্বাস কি তোদের আছে? আমি তোদের কে? কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। তোর চিঠি তুই পড়।' কথাগুলো শেষ করেই ত্বরিৎপদে উন্নিআম্মা ভেতরে চলে যান।

মাক্কম চিঠিটা পড়তে পড়তে জিজ্ঞাসা করেন, 'দাদা ভালো আছেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালো আছেন।'—কাম্মু জবাব দেয়।

'তোমাকে তো এখানে রাখতে লিখেছেন। রাখতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে এখানে থাকবে সেইটাই তো ভাববার কথা।'

'হয়তো পাহারা দেবার জন্যই পাঠিয়েছেন। এখানে নাকি খালি মহিলারাই আছেন।'

কথাটা শুনে মাক্কম মুচকি হেসে বলেন, 'ও, কৈনেরীতেও পাহারা রাখা দরকার বলে দাদার মনে হয়েছে। ঈশান কোণে হয়তো মেঘের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, কিন্তু যাই হোক, যত দিন ভগবতী শ্রীপোর্কলীর কৃপাদৃষ্টি আমাদের উপর আছে, ততদিন আমাদের ঐ ধরনের কোনো সংকটে পড়তে হবে না বলে মনে হয়।'

'আমার মধ্যে ভুল থাকলে মাপ করবেন।'—বিনীতভাবে কাম্মু বলে, 'যত দিন প্রভু না ডাকছেন ততদিন আপনার আজ্ঞামত এখানেই দিন কাটাব। এছাড়া আমার করবার আর কি আছে।'

'চিঠির মাধ্যমে জানতে পারছি, তোমার অস্ত্র-শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে যাদের সমাপ্ত হয় নি তাদের শিক্ষা দেবার জন্য আখড়ায় যেতে পারবে?'

'পারব।'

'তীর-ধনুক এবং তলোয়ার ছাড়া তুমি বন্দুকও চালাতে পার?'—মাক্কম জিজ্ঞাসা করেন।

'খুব ভালো না পারলেও, পারি।'

'আমিও তা শিখতে চাই। পুরলী পাহাড়ে যাবার আগে আমাকে একটা ছোট রিভলবার উপহার দিয়ে রাজা বলেছিলেন, "এখন এ দিয়ে অনেক কাজ হতে পারে। এটাকে নিজের কাছে রাখো।" কিন্তু কি ভাবে তা ব্যবহার করতে হয় তা শেখানোর ফুরসত পান নি। ভগবান জানেন সে সুযোগ ভবিষ্যতে হবে কি না।' শেষের কথায় ব্যক্ত অধীরতাকে চাপা দেবার জন্যই যেন তিনি বলেন, 'আমি সেটা নিয়ে আসি।' ছোটরানী ভেতরে চলে যান।

মুহূর্তের মধ্যে কাম্মুর মনে চিন্তার এক বন্যা আসে—কি শালীনতা, বিনয় আর স্নেহপূর্ণ কথাবার্তা, অথচ কি গাম্ভীর্য। যুবকের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা ছিল না। আম্পু নায়ার যখন বলেছিলেন, তুমি

গিয়ে থাকো, তখন কাম্মু মনে-প্রাণে সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু ছোটরানীর সঙ্গে প্রথম দর্শন ও কথাবার্তার পর তার মনে হলো যেন সেবক হিসাবে কৈনেরীতে থাকাটাও সৌভাগ্যের বিষয়।

রিভলবার নিয়ে মাক্কম তাড়াতাড়ি বাইরে আসেন। 'আমি জানি না, এ দিয়ে কি করতে হয়। ময়য়ীর এক বড় সাহেব তাঁকে উপহার দিয়েছিল।'—বলে মাক্কম ছোট্ট যন্ত্রটি কাম্মুর হাতে দেন। এর আগে সে ঐ ধরনের রিভলবার দেখে নি। সেটা ছিল খুব ছোট এবং খুব হালকা। বাচ্চারাও তা ব্যবহার করতে পারে। রাজা সাহেব প্রথম দিন ঐ আগ্নেয় যন্ত্রটি মুঠোর মধ্যে ধরে ভেবেছিলেন, ওটা বুঝি বাচ্চাদের খেলনা। কিন্তু ওটার উপহারদাতা ছিল ফরাসী সৈন্য-বাহিনীর একজন উচ্চ পদাধিকারী। সে ঐ অস্ত্রটি সম্পর্কে খুব প্রশংসা করেছিল। তাই তিনি অপর এক সাহেবকে ওটি দেখিয়ে-ছিলেন। সে পরীক্ষা করে বলেছিল যে অমন মূল্যবান ও কার্যকরী রিভলবার দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু তবুও রাজা সাহেবের কাছে ওটার গুরুত্ব খুব কমই মনে হলো।

পয়শীর মহল ছেড়ে যাওয়ার সময় রাজা সাহেব ঐ অস্ত্রটি মাক্কমকে দিয়ে যান। কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি প্রিয়াকে এমন এক উদ্ভট উপহার দিয়েছিলেন! যদি তাঁকে পরাজয় বা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে হয়তো তাঁর প্রাণের ছোটরানী শত্রুর হাতে বন্দিনী অথবা দাসী কিংবা ব্যবসায়ের পণ্য হওয়ার লজ্জা ও গ্লানি থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য ওটি কাজে লাগাতে পারবেন। এমনও হতে পারে, সময়বিশেষে মহিলাদের হাতে আত্মরক্ষার উপায়ের আবশ্যকতার কথা মনে করেই তিনি ওটা দিয়েছেন। ছোটরানীকে রাজা সাহেবের উপস্থিতিতে অসি-চালনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। হয়তো বাকি শিক্ষাটা পূরণের জন্যেই এই উপহার তিনি দিয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত মাক্কমের মনে হয় যে, দূরদৃষ্টির ফলেই রাজা এই ধরনের উপহার তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন।

কিন্তু কি দরকার ? ধনুক এবং তলোয়ার চালানো তো তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন। শুধু জানতেন না, কি করে আগ্নেয়াস্ত্র চালানো যায়। রিভলবারটি রাজার কাছ থেকে পেয়ে বারকয়েক উলটে-পালটে দেখেছেন তিনি। তবুও তাঁর কাছে যেন আজো তা একটা খেলনার পর্যায়েই রয়ে গেছে। এইটাই তাঁর বড় দুঃখ। কাম্মু যখন বলে যে সে বন্দুকেরও ব্যবহার জানে, তখন ছোটরানীর ঔৎসুক্য বেড়ে যায়। আর সেইজন্যই আত্মবিস্মৃত হয়ে এই বীরাঙ্গনা তৎক্ষণাৎ অস্ত্র-শিক্ষায় উন্মুখ হয়ে ওঠেন।

কাম্মু বিনীতভাবে রিভলবার হাতে তুলে নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে উলটে-পালটে দেখে বুঝতে পারল যে তাতে টোটা ভরা নেই। তারপর সে ডান হাতে সেটিকে ধরে আঙুল দিয়ে ব্যবহার করার কায়দাটা বাতলে দেয়,—'এখানে কার্তুজ রাখতে হয়। তারপর এইভাবে বন্ধ করতে হয়। গুলি চালানোর সময় এই আঙুলের মতো বেরিয়ে থাকা জিনিসটাকে চট করে টেনে ছেড়ে দিলেই গুলি ছুটে বেরিয়ে যায়।'

'গুলি আমার কাছে আছে।'—মাক্কম বলেন, 'তুমি দুই-একবার গুলি চালিয়ে দেখাও তো।' ছোটরানীর ঔৎসুক্য আরো বাড়ে। অনেক দামী অলঙ্কার পাওয়ার পর যেমন আনন্দে মহিলাদের মুখ লাল হয়ে ওঠে, অথবা অনেকগুলো খেলনা পাওয়ার পর শিশুর যেমন অবস্থা হয় ঠিক তেমনি হয়েছিল মাক্কমের সেই মুহূর্তে।

তিনি ছুটে গিয়ে বাক্স খুলে গুলি নিয়ে আসেন।

কাম্মু কোনো রকম সংকোচ না করে রিভলবারে কার্তুজ পুরে বলে, 'এই গুলি খুব বেশী দূরে যায় না। কিন্তু কাছের লোককে এ দিয়ে মেরে ফেলা যায়। এক সঙ্গে ছ'টা গুলি এতে পোরা যায়।' এই কথা বলে সে আঙ্গিনায় নেবে যায়।

মাক্কমও তার পিছু নেন।

পুকুরের ধারে কাঁঠালের একটা গাছ ছিল। কাম্মু তার একটা পাতা তুলে নিয়ে কাঠের উপর কাঁটা দিয়ে এঁটে দেয়।

'দেখুন !'—বলে সে হাত বাড়িয়ে এমনভাবে গুলি ছোড়ে যে সেটা ঐ পাতার ঠিক মাঝখানে গিয়ে বিদ্ধ হয়।

'বাঃ। ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছ তো। দেখি এবার আমি একবার চেষ্টা করি !'—অস্ত্রটি তিনি হাতে তুলে নেন।

রিভলবারের আওয়াজ শুনে উন্নিআম্মা ঘাবড়ে যান। তিনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন মাক্কম হাতে রিভলবার নিয়ে খিল খিল করে হাসছে। ঈর্ষা এবং বিদ্বেষপূর্ণ চাপা গলায় বিড়বিড় করে তিনি যা বলেন তার মোদ্দা কথা হলো, এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে অত মাখামাখির ভাব নিয়ে আঙিনায় দাঁড়ানো কুল, মান এবং সামাজিক সম্মানের বিরোধী।

মাক্কমের ঔৎসুক্য ছিল অস্ত্র-শিক্ষার দিকেই। তিনি বলেন, 'দেখি আমিও পারি কি না।' কাম্মুর নির্দেশ অনুসারে তিনি গুলি ছোড়েন। লক্ষ্যের আঙুল ছয়েক দূরে সেটি বিদ্ধ হয়।

'যিনি ধনুকে অভ্যাস করেছেন তাঁর লক্ষ্য সঠিক হবেই। হাত হয়তো কিছুটা নড়ে গিয়েছিল। বার কয়েক অভ্যাস করলেই হাত ঠিক হয়ে আসবে।'—কাম্মু উপদেশ দেয়।

'আর একবার দেখি।'—মাক্কম আবার গুলি ছোড়েন। এবার লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি গুলি বিদ্ধ হয়। মন তাঁর আনন্দে ভরে যায় এই সফলতায়। চতুর্থবারের নিশানা লক্ষ্য ভেদ করে। মাক্কমের মুখ কৃতকার্যতার আনন্দে আরক্তিম হয়ে ওঠে।

'এবার শত্রুরা এলে দেখিয়ে দেবো এই রিভলবার দিয়ে আমি কি করতে পারি। আমি কোনোদিন তোমাকে অর্থাৎ আমার এই অস্ত্র-শিক্ষার গুরুকে ভুলব না।'

'আমি তো কিছুই শেখাই নি। শুধু ওটা খুলে কোথায় কি আছে দেখিয়েছি মাত্র।'

'এই ভাবেই শেখানো হয়। আমায় শেখানোর মাধ্যমেই তোমার দক্ষতার পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন আর কোনো সন্দেহের

অবকাশ নেই। পুরানো শিক্ষকদের চলে যাওয়ার পর আখড়া যেন একেবারে অনাথ হয়ে গিয়েছিল। আজ থেকে তা আবার সনাথ হতে পারল। আচ্ছা এবার গিয়ে কিছু খাওয়া-দাওয়া সেরে এসো।'

কাম্মুকে খাবার ঘরটা দেখিয়ে বারান্দায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনতে পান উন্নিআম্মার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে কাকে যেন তিনি বলছেন, 'মান, প্রতিষ্ঠা, শালীনতা সব ছেড়ে স্বেচ্ছায় যার-তার সঙ্গে মাখামাখি করে পারিবারিক গৌরবের মুখে চুনকালি মাখানো বেশীদিন আর ধর্মে সইবে না। রানীই হোক আর যেই হোক একদিন না একদিন হাটে হাঁড়ি ভাঙবেই। তখন কৈফিয়ত দিতে হবে!'

অনেকক্ষণ ধরে মাক্কম এমন ভাব দেখান যেন তিনি এই কদর্য কথার কিছুই শুনতে পান নি। কিন্তু যখন দেখেন যে উন্নিআম্মা থামা তো দূরের কথা, কুৎসিত কথার বাণে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন তখন বাধ্য হয়েই মাক্কম বিনীত স্বরে বলেন, 'দিদি, এই ধরনের কথা বলছ কেন? আমি তো কোনো অপরাধ করি নি?'

এই সাধারণ কথাগুলোও যেন আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। তিনি ঝাঁঝাল কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন,—'মুখের উপর কথা বলতে আবার লজ্জাও করে না। অপরিচিত ঐ লোকটার সঙ্গে অত মাখামাখি কিসের! পাঁচজন দেখলে কি মনে করবে, তার খেয়াল আছে? চোখ কি সকলের কানা হয়ে গেছে, কুলের বদনাম না কিনে দেখছি স্বস্তি পাচ্ছো না। কুলটা কোথাকার!'

মাক্কম এরপর আর কোনো কথা শুনতে পারেন নি। তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। কোনো কিছু না বলে তিনি নীরবে ধীর পদক্ষেপে নিজের ঘরে প্রবেশ করেন।

পাঁচ

পুরলী পাহাড় কোট্টায়াম দেশের মেরুদণ্ডের মতো এক পর্বত-শ্রেণী। হাতি, চিতা বাঘ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জন্তু-জানোয়ারে ভরা ঐ পাহাড়ে কোল-ভিলের মতো পাহাড়ীরাই শুধু বাস করে। উঁচু উঁচু গাছগুলো শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ঐ পাহাড়ের উপরকার জঙ্গলে সূর্যের আলোর প্রবেশাধিকার পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। লতা-গুল্মের নিবিড়তার জন্য বনচরদের অবাধ ভ্রমণও ব্যাহত হবার মতো অগম্য ছিল ঐ বন। বর্ষা এসেছে। বৃক্ষের সবুজ পত্রদলের বর্ণে নয়নাভিরাম সজীবতা ও গাঢ়তা আসে।

কোট্টায়ামের দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে পুরলী পাহাড়ের অস্তিত্ব-কাল পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেছে। হায়দরের আক্রমণের সময় কেরল-বর্মা পুরলী রক্ষা করতে এসেছিলেন। নিজ রাজধানীকে রক্ষা করার মতো শক্তি এবং সেই শক্তি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও বিশেষ অবস্থার জন্য বিকল্প একটি আশ্রয়স্থলরূপে তিনি এই দুর্গম পার্বত্য বনভূমির কিছু অংশকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলেছিলেন। আর তাই স্বাভাবিক প্রয়োজনেই সেখানে গড়ে উঠেছিল একটি কুটির, দেবমন্দির, সাথীদের কয়েকটি বাসগৃহ আর অস্ত্রশস্ত্রের জন্য গুপ্তকক্ষ। অস্ত্রাগারের পথ-জানা কয়েকজন নেতৃ-স্থানীয় লোক এবং ভিলরাই কেবল জানত ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের কথা। খননকার্য-বিশারদ কয়েকজন বিদেশীর সহায়তায় কয়েকটি সুড়ঙ্গপথও তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাছাড়া এই

সুড়ঙ্গগুলির অদূরেই নাকি তিনি একাধিক গুহাবাসও নির্মাণ করান। এ সংবাদ অবশ্য জনশ্রুতি হিসাবেই এখনো সাধারণ্যে প্রচলিত। এর সত্যাসত্য সম্বন্ধীয় সঠিক সংবাদ কেবলমাত্র তাঁর ভাগিনেয়, দু-তিনজন কর্মচারী এবং ভিল সর্দারদেরই জানা ছিল।

রাজা সাহেবের জ্যোতিষী বলেছিলেন যে, কোষ্ঠী অনুসারে শনির প্রকোপের দরুন তাঁর ভাগ্যে বনবাস অবশ্যম্ভাবী। কাজেই তিনি পুরলী পাহাড়ে অবস্থান ধর্মসিদ্ধ ও মঙ্গলজনক বলে স্থির করলেন। তাঁর মুখ্য কর্মচারীরা জানত যে বয়নাড়ুর দুর্গম জঙ্গলে এই ধরনের অনেক গুপ্তঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। ঐ সকল স্থানে পাহারার জন্য লোক মোতায়েন ছিল, রাজা সাহেবের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে ঐ ধরনের গোপন কেন্দ্রগুলিতে শত্রুর আক্রমণ অসম্ভব।

ইংরেজরা ভেবেছিল যে তাদের ভয়ে রাজা সাহেব পয়শীর রাজমহল ছেড়ে পাহাড়ে পালিয়েছেন। কিন্তু আসল ঘটনা আদৌ তা ছিল না। পার্বত্য যুদ্ধ-কৌশল তাঁর ভালোই জানা ছিল। কাজেই তাঁর বিশ্বাস ছিল যে দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে শত্রুর সম্মুখীন হওয়াই শ্রেয়।

অপরপক্ষে কর্নেল ওয়েলেসলি এবং তাঁর সেনাপতি রাজা সাহেবের এই কৌশলকে তাঁর ইংরেজ-ভীতি ও দুর্বলতা কল্পনা করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন এবং আনন্দিত হলেন। তাঁরা ভাবলেন, কোট্টায়ামকে মুঠোর মধ্যে আনার এই হচ্ছে সুবর্ণসুযোগ। শত্রুশক্তি পরিমাপের এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই তাঁরা স্থির করলেন যে সাধারণ্যে ঘোষণা করা হবে যে রাজা সাহেবকে পদচ্যুত করে কোম্পানী তাঁর সমস্ত অধিকার ও দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।

এর বিরুদ্ধাচরণ কোম্পানীর দৃষ্টিতে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। মজুদ অস্ত্রশস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য কোম্পানী-ঘোষিত নির্দেশ যে সমস্ত বিদ্রোহী মেনে নেবে তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শিত হবে।

ইংরেজদের পক্ষভুক্ত কয়েকজন দেশীয় লোক শ্বেতাঙ্গ বন্ধুদের পরামর্শ দেয় এই বলে যে, রাজা সাহেব ভীত হয়ে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। রাজ-সমর্থকদের মনোবল এখন দুর্বল। সামরিক কিছু বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়ে এমনভাবে ঘোষণা প্রচার করা দরকার যাতে রাজার অনুগত লোকেরাও বাধ্য হয়েই কোম্পানীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এইভাবে কোট্টায়ামে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে পুরলী পাহাড় ঘিরে ফেলে রাজা সাহেবকে বন্দী করতে বেগ পেতে হবে না। দেশবাসীকে এইভাবে বিভ্রান্ত, নিষ্ক্রিয় ও পরাজিত করতে পারলে রাজা সাহেবের রসদ সরবরাহ বন্ধ করা যাবে, আর এই অবরুদ্ধ অবস্থায় কোম্পানী তার সেরা সৈন্যদল নিয়ে পুরলী পাহাড়ের রাজ-ঘাঁটিকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করতে পারবে।

এই সমস্ত সলা-পরামর্শের সংবাদ রাজা সাহেবের কানে গুপ্তচরের মাধ্যমে যথা সময়েই পৌঁছে গেল। কাজে কাজেই কোম্পানীর সৈন্য-সংখ্যা কত, কতগুলি দলে বিভক্ত হয়ে তারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, প্রভৃতি খবরাখবর নিশ্চিতভাবে জানার জন্য তিনি বিশ্বস্ত আম্পু নায়ারকে তলশেরী পাঠিয়ে দিলেন। আম্পু কিন্তু অনুসন্ধান-লব্ধ সংবাদ রাজার কাজে সময়মত পাঠাতে পারেন নি।

যেদিন মাননঞ্চেরির ঘোষণা জারি হওয়ার কথা, সেদিন সন্ধ্যার প্রায় প্রহর চারেক পূর্বে রাজা সাহেব নিজের আবাসস্থানের কাছে একটি গাছের তলায় কম্বল পেতে বসেছিলেন। তাঁর কাছে ঘাসের উপর এক চিলতে কাপড় বিছিয়ে অর্লাত নাম্পিও উপবিষ্ট। নিকটেই চার-পাঁচজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঘোষণার সময় নির্দিষ্ট ছিল আজ দুপুরে। রাজা সাহেব বললেন, 'সে সম্পর্কে এখনো তো কোনো খবর পাচ্ছি না।'

'তারা হয়তো ঘোষণা করে নির্বিঘ্নে ফিরে গেছে।'—নাম্পি বলেন, 'তাতে আমাদের ক্ষতি কি? আমি নিশ্চিত যে, লোকে তাদের কথা বিশ্বাস করবে না।'

'কোম্পানীর নির্দেশ কোট্টায়ামের একজনও মানবে না।'—কন্নবত নাম্প্যার বলেন, 'আর ঘোষণাকারীকেও তারা এমনি ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।'

'আমিও তাই সন্দেহ করছি,'—চিন্তিতভাবে রাজা সাহেব বলেন, 'এবং তা যদি হয়েই থাকে তাহলে যথেষ্ট আশঙ্কার কথা। কারণ, বন্দুকধারী গোরা-সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রায়-নিরস্ত্র মানুষের লড়াইয়ের পরিণাম বড়ই ভয়াবহ। আমি এই জন্যই বলে পাঠিয়েছিলাম, যাতে সবাই শান্ত থাকে।'

'কোম্পানীর লোক হয়তো যে কোনো প্রকারেই হোক বিজয়-উৎসব পালন করতে চেয়েছে।'—তলক্কল চন্তু বলেন, 'সেইজন্যই আমার মনে হয়, তারা সামান্য অজুহাতেই হয়তো কোট্টায়ামের বাসিন্দাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই অবস্থায়, আমাদের দিক থেকেও প্রতি-আক্রমণে বিলম্ব করা উচিত হবে না।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে রাজা সাহেব বললেন, 'চন্তুর কথা ঠিক। কোম্পানীর জয়-ভেরীর তুমুল নিনাদের মধ্যে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। নতুবা আমার প্রজাদের মনোবল ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্য তারা মাননঞ্চেরিকে রক্তরঞ্জিত করে তুলবে। আমাদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে তারা প্রচার করবে যে, মাননঞ্চেরি রক্ষা করার ক্ষমতা ও শক্তি কেরলবর্মার নেই। যাই হোক. ভিলেরা নিশ্চয়ই অন্ধকার হবার আগেই খবর নিয়ে আসবে।'

মাননঞ্চেরিতে কি হয়েছে তা জানবার জন্য তাঁরা সকলেই ব্যগ্র প্রতীক্ষায় রইলেন। সব রকমের অবস্থায় দৃঢ় এবং অচঞ্চল রাজাও ওখানে সংঘঠিত নাটকের খবর শুনতে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা সকলে মাননঞ্চেরির সংবাদ-সংগ্রাহক ভিলদের প্রতীক্ষায় উদগ্র আগ্রহে পথ চেয়ে রইলেন। অল্পক্ষণ পরেই এক ব্যক্তিকে সর্পিল বন-পথে দ্রুত গতিতে আসতে দেখা গেল। তার হাতের তলোয়ার এবং কোমরের দোদুল্যমান খঞ্জর দেখে বোঝা গেল যে অগ্রসরমান

ব্যক্তিটি ভিল নয়, নিশ্চয়ই কোনো নায়ার। রাজা সাহেবের ইঙ্গিতে কন্নবত নাম্প্যার আগন্তুকের কাছে গিয়ে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোত্থেকে আসছেন ? কি প্রয়োজন ?'

'আম্পু নায়ারের কাছ থেকে আসছি খবর নিয়ে।'—আগন্তুক বলেন,—'কোম্পানীর একটি সৈন্যদল আজ সকালে মাননঞ্চেরিতে এসেছিল। উৎসুক জনতার সামনে হুকুমনামা পড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পংক্তির পাঠ সমাপ্ত হবার আগেই আম্পু বাবু রিভলবারের গুলিতে ঘোষণাকারী লোকটার জীবনান্ত ঘটান। তারপর যে ঘটনা ঘটে তাতে কোম্পানীর সমস্ত সৈন্যই নিহত হয়।' সম্পূর্ণ কথা কান পেতে শোনার মতো সহিষ্ণুতা কন্নবত নাম্প্যারের মধ্যে ছিল না। কাজেই, তাড়াতাড়ি গিয়ে যা শুনেছেন তাই রাজা সাহেবকে জানিয়ে দেন।

'আম্পু সাধারণ লোক নয়।'—রাজা সাহেবের কণ্ঠস্বর আনন্দ-মিশ্রিত,—'আশ্চর্য ব্যাপার, কি ভাবে সে এ কাজ সম্ভব করল! আগন্তুককে এখানে নিয়ে এসো।'

রাজা সাহেব এবং উপস্থিত প্রধানেরা মাননঞ্চেরির ঘটনার বিবরণ জানার জন্য আগন্তুককে এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন। জবাবে যা জানা গেল, তা নিম্নরূপ :

ইংরেজদের সৈন্য মাননঞ্চেরিতে আসার পর সেখানকার অধিবাসীরা খুব ভয় পায়। কিন্তু আম্পু নায়ার লোক পাঠিয়ে বাড়ি বাড়ি খবর দেন যে, বয়স্ক প্রত্যেকটি লোককে ঘোষণা শুনতে অবশ্যই সমবেত হতে হবে। ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন লরেন্স্ ঢেঁড়া পিটানোর সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের সামনের ময়দান থেকে জোট বেঁধে লোক বেরুতে থাকে। তাদের মধ্যে আম্পু নায়ারের নিজস্ব বহু লোকও ছিল। সংবাদ সংগ্রহের জন্য রাজা সাহেব যে ভিলদের মাননঞ্চেরি পাঠিয়েছিলেন, আম্পু নায়ার তাদের যে পথে ইংরেজ সৈন্যের ফেরার কথা ছিল সেই পথে লুকিয়ে রাখেন। সৈনিকরা

সশস্ত্র হয়ে সারি বেঁধে দাঁড়ানোর পর ক্যাপ্টেন সাহেব চেয়ারে বসে ঘোষণা পাঠের নির্দেশ দেয়। পাঠ শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অদূরে দণ্ডায়মান আম্পু রিভলবারের গুলিতে ঘোষণা-পাঠকারীর কণ্ঠরুদ্ধ করে দেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়াতেই আম্পু নায়ারের আর একটি গুলি তাকেও ধরাশায়ী করে। বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। কিন্তু পরিচালকের অভাবে এবং চারদিক থেকে বেষ্টিত হয়ে যাওয়ার ফলে সন্ত্রস্ত ইংরেজ সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই নায়ারদের হাতে জীবন হারায়। অল্প কয়েকজন অবশ্য পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু পালিয়েও বাঁচা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, ভিলদের তীরের মুখেই তাদের মৃত্যু হয়।

'ভগবতী শ্রীপোর্কলীর কৃপা।'—রাজা সাহেব বলেন, 'ঘটনাটা ছোট হলেও এর পরিণাম সুদূরপ্রসারী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারা কেরল এই ঘটনাকে একটি শুভ সূচনা হিসাবে মনে করবে।'

'হুজুরের কথাই ঠিক।'—বেল্লুর এমন নায়ার বলেন, 'আমাদের দেশবাসীর কাছে এটা একটা বিজয়ের নতুন বনিয়াদ সৃষ্টি করবে। যাদের মনে সংশয় ছিল তাদের তা দূর হবে। এদিক থেকে আম্পুর কাজ ঠিক সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।'

কন্নবত নাম্প্যার একটু চিন্তিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'কিন্তু আগামী দিনের কাজকর্ম খুব বিচার-বিশ্লেষণ করে করতে হবে। কোম্পানী ভেঙ্কাড় ও দিণ্ডী পাহাড়ে লোকজন একত্রিত করছে। বয়নাড়ুতেও কয়েকটি জায়গায় তারা আস্তানা গেড়েছে। এখন তাদের সব ক'টি ঘাঁটির উপর একসঙ্গে আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারলে তবেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি।'

রাজা সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমি তার ব্যবস্থাও করেছি এডচ্চেন কুঙ্কন বয়নাড়ুর প্রজাদের রক্ষা করবে। ভেঙ্কাড়ে অবস্থিত শত্রুপক্ষের উপর হামলা করতে আমাদের বাহিনী ইতিমধ্যে চলে গেছে। কিন্তু দিণ্ডী পাহাড়ের শত্রু-সৈন্যের মোকাবিলা করা একটু

কঠিন, কারণ তাদের ঘাঁটিটা বেশ মজবুত।'—তারপর এমন নায়ারের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন তুমি কি বল?'

'হুজুর, অধীনের প্রস্তাব হচ্ছে শত্রুর উপর এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া হোক।'

'পয়শীর শত্রু-সৈন্যকে বিনাশ করাই হচ্ছে প্রথম এবং প্রধান কাজ।' —কন্নবত নাম্প্যার পরামর্শ দেন, 'মহলে ম্লেচ্ছ-সেনা থাকাটা আমাদের পক্ষে খুবই অগৌরবের ব্যাপার। যতদিন কোম্পানার লোক পয়শী এবং কোট্টায়ামে থাকবে ততদিন আমার মনে শান্তি থাকবে না।'

কথাটা শুনে রাজা সাহেব মৃদু হাসলেন। —'তুমি এবং আম্পু দেখছি সমান। আমরা পয়শীকে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে পারলে কি আর সব ছেড়েছুড়ে এখানে চলে আসতাম। ইংরেজদের কামানের শিকার হয়ে লাভ কি? তাছাড়া আজ যদি আমরা পয়শী থেকে তাদের লোককে তাড়িয়ে দিইও তাহলে আগামী কাল তারা তলশেরী থেকে তার চেয়েও বেশী সৈন্য পাঠিয়ে দেবে না কি? কাজেই, এটা ঠিক হবে না। আমার মত হলো, মাননঞ্চেরিতেও যুদ্ধ করা উচিত হয় নি। এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য, পাহাড় থেকে ইংরেজদের সরানো। আমাদের এমন যুদ্ধনীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে তাদের সৈন্যদল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তারা যদি আবার পাহাড়-জঙ্গলে লোক নিয়ে আসেও, তাদের বিনাশ করতে আমাদের খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। এ না করে সমতলে গিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করে লাভ নেই।'

ধীর চিন্তাপ্রসূত এই যুক্তিকে সবাই সঠিক বলে মনে করলেন। কিন্তু কন্নবত নাম্প্যার এই পন্থায় খুশী হতে পারলেন না।

মাননঞ্চেরি থেকে আগত নায়ারকে রাজা সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা, আম্পু নায়ার কোথায় গেছে? আমাদের ভিলরা সব কোথায়?'

'যাওয়ার সময় বলেছিলেন, সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসবেন। খবরটা আপনাকে জানিয়ে দিতে বলেছিলেন। ভিলদেরও সঙ্গে নিয়েছেন।'

'জানি না এখন সে কি করতে চাইছে। কোনো-না-কোনো বিপদ ঘাড়ে এসে পড়বেই। এখানে আসলে কিছু শান্তি পেতাম।'

নিজের উপর অর্পিত কর্তব্য পালন করার পর, নিজের শক্তির চেয়েও বেশী কাজ করতে অগ্রসর হওয়া ছিল আম্পুর স্বভাব। তাঁর প্রভুভক্তি এবং বাহাদুরি পাওয়ার ইচ্ছা রাজা সাহেবের কাছে গোপন নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও জানেন যে, আম্পু নায়ার কোনো বিপদকে পরোয়া করেন না। এবং কোনো কথাকে সম্পূর্ণরূপে বিচার-বিশ্লেষণ না করেই মাঝে মাঝে তিনি সাময়িক লাভের জন্য বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই আশঙ্কার জন্যই তিনি এখন ঐ কথাটা বললেন।

তিনি আবার বলেন, 'এরা সব এটাকে আগের যুদ্ধের মতই ভাবছে। অতীতের যুদ্ধে কোম্পানীর লোকদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তাদের লোকবল ছিল কম, তাছাড়া অন্যান্য প্রবল বিরোধীদের সঙ্গেও লড়াই করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। বিচ্ছিন্নভাবে তাদের সৈন্যদের উপর দু-একটা আক্রমণ করে কোনো লাভ নেই। ইংরেজদের সেনাপতি ওয়েলেসলি টিপুকে হারিয়ে দিয়ে মহাপরাক্রমশালী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করেছেন। ওরা তাঁকেই পাঠিয়েছে সেনাপতি হিসাবে। এই অবস্থায় আমাদের বোঝা দরকার যে তাদের প্রস্তুতি অতীতের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়, বরং অনেক বেশী।'

রাজা সাহেবের বক্তব্য ছিল সঠিক। উপস্থিতদের সবাই জানত যে আগামী দিনের যুদ্ধ অতীতের যুদ্ধের মতো হবে না। তলশেরীতে কি ব্যবস্থা শত্রুপক্ষ অবলম্বন করেছে তার কিছু কিছু খবর রাজা সাহেব জানতেন। কাজেই তিনিও কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি চঞ্চলতা প্রকাশ করেন নি। বৃটিশ রাজ্যের সমস্ত শক্তি

একাত্রিত হয়ে এসে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও তিনি মাথা নত করবেন না। আগামী দিনের কাজ খুব ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেই করতে হবে, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অনেকক্ষণ ধরে তিনি নির্বাক, আত্মমগ্ন হয়ে বসে রইলেন। তারপর কন্নবত নাম্প্যারকে কাছে ডেকে কানে কানে কি যেন বললেন।

কন্নবত নাম্প্যার রাজা সাহেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কন্নবত ছিল সমসাময়িক কালে উত্তর কেরলের প্রসিদ্ধ ধনী পরিবারগুলির একটি। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনৈশ্বর্য ও প্রভাবপ্রতিপত্তির বলে ঐ পরিবারের লোকেরা কন্নবত দেশে একছত্র শাসন চালাত। অন্য রাজার অধীনতা তাঁরা কোনো দিন মানেন নি এবং শক্তিমান রাজারাও তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করতেন না। শুধু নিজের শক্তিতেই নয় আত্মীয়দের বাহিনীর শক্তিতেও কন্নবত নাম্প্যার ছিলেন শক্তিমান। তাই তৎকালীন ঘটনাবলীতে তিনি এক স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইরুবনাট নাম্প্যারদের মধ্যে কয়েকজন কন্নবতের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। কল্যাড, বেড্ডাণ্ডা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী পরিবারের বহু ব্যক্তিও দীর্ঘ কাল ধরে কন্নবত নাম্প্যারের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মহাপ্রভাবশালী এই কন্নবত শঙ্কর নাম্প্যারকে রাজা সাহেব নিজের প্রধান মন্ত্রীর পদ দিয়েছিলেন। এই ঘটনা রাজার দূরদর্শিতার পরিচায়ক, এই ছিল লোকের ধারণা।

এছাড়াও শঙ্কর নাম্প্যার ছিলেন রাজা সাহেবের আবাল্য সহচর। রাজা সাহেবের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা এবং অগাধ বিশ্বাস। তাঁদের মধ্যকার এই সম্পর্কের কথা সমগ্র কেরল ভালোভাবেই জানত। রাজা সাহেব বলতেন বটে,—'সে অবিবেচক, মাঝে মাঝে ভুল করে বসে', কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্য কথা বলতে কি, নাম্প্যার ছিলেন সচিবোত্তম।

শুধু একটি ব্যাপারেই রাজা সাহেব কিছুটা বিচলিত ছিলেন। কয়েকটি ঘটনা এবং কথার মধ্য দিয়ে তিনি জানতে পেরেছেন যে,

আম্পু নায়ার এবং কন্নবত নাম্প্যারের মধ্যে মনের দিক দিয়ে ততখানি মিল নেই। তার প্রধান কারণ একরোখা আম্পু নাম্প্যারের নির্দেশ লঙ্ঘন করে মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছায় কিছু কিছু কাজ করে ফেলেন। আম্পুর বোন রাজা সাহেবের আদরের ছোটরানী। কাজেই নাম্প্যারের একটা সন্দেহ ছিল যে, এই গর্বেই আম্পু তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করে থাকেন। অপর পক্ষে, আম্পুর ধারণা ছিল যে, নাম্প্যার বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর মধ্যে শুধু আছে পেছনে বসে বিচার-বিশ্লেষণ করার দক্ষতা। কাজেই এটা পরিষ্কার যে, তাদের দুজনের মধ্যে মনের দিক থেকে মিল ছিল না।

রাজা সাহেব এবং কন্নবত নাম্প্যার, দুজনে কিছুক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করলেন। মাননঞ্চেরি ও উত্তন কুরুক্কলের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার কথাবার্তা চলছিল। এঁদের হিসাব মতো, এই বোঝাপড়ার উপরই ইংরেজদের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। নাম্প্যার পরামর্শ দিলেন যে, যদি উত্তর কেরলের ধনী নায়ারবর্গকে কোনোক্রমে ইংরেজদের উপর রুষ্ট করিয়ে দেওয়া যায়, এবং তার ফলে যদি তারা কোম্পানীর মিত্রতাকে অস্বীকার করে, তবেই কেরলীদের পক্ষে ইংরেজ শক্তিকে তীব্র আক্রমণে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া সহজ হবে। সুতরাং কল্যাড, বেড্ডাণ্ডা প্রভৃতি ধনীদের উত্তেজিত করে তাদের সঙ্গে আঁতাত করা উচিত। এছাড়া চারদিকে [illegible]ঘুরে কোম্পানীর উপর অসন্তুষ্ট লোকদের সংগঠিত করতে হবে যাতে তারা শত্রু-সৈন্যের যাতায়াত, রসদ সংগ্রহ প্রভৃতি অপরিহার্য কাজগুলিতে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে।

তাঁর এই মূল্যবান পরামর্শই সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হলো এবং রাজা সাহেব তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্তগুলিকে যথাসাধ্য কার্যে রূপায়িত করার জন্য কন্নবত নাম্প্যারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন।

ছয়

বিগত দ্বাদশ বর্ষব্যাপী বিভিন্ন যুদ্ধের খতিয়ানে ইংরেজ পক্ষের পরাজয়ের তালিকা ছিল বেশ দীর্ঘ। বহু পরাজয়ের গ্লানিকে তারা তাদের মন থেকে মুছে দিতে চাইছিল অন্তত একটি বড় রকমের জয়ের মহিমায়। তাদের দৃষ্টিতে, তৎকালীন কেরলের এই অঞ্চলসমূহের অবস্থা ছিল মোটামুটি তাদের অনুকূলে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অভিযানে বিরত হতে তারা ছিল গররাজী।

দু বছর আগে দক্ষিণাপথের প্রভাবশালী রাজা টিপু শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে মারা যান। ফলে মহীশূর কোম্পানীর কুক্ষিগত হয়। মারাঠা সাম্রাজ্যের নেতারাও আত্মদ্বন্দ্বে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। সাম্রাজ্যাধিপতি পেশোয়া ইংরেজ পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণে উদ্যত হলেন। গভর্নর-জেনারল দেখলেন—সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি নেতাদের দমন করার পর সেই দমনযন্ত্রকে পুনরায় সম্পূর্ণ কর্মক্ষম করতে কমপক্ষে এক বছর লাগবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ পক্ষ নিজেদের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে পয়শীর রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করাকেই প্রথম এবং প্রধানতম কর্তব্য বলে স্থির করলেন।

গভর্নর-জেনারল পূর্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝেছিলেন যে, পয়শীকে পদানত করার মতো গুরুদায়িত্ব কোনো সাধারণ সেনা-নায়কের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে পালিত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তিনি তাঁর সমর-নিপুণ ভ্রাতা কর্নেল আর্থার ওয়েলেসলিকে এই কাজে নিযুক্ত করলেন। এই তরুণ সেনাপতিটিই টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অপরিমিত দূরদর্শিতা ও

বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। কর্নেল ওয়েলেসলির বয়স ছিল তখন মাত্র বত্রিশ, ইনিই পরবর্তী কালের সেই কৃতকর্মা পুরুষ যিনি মহাবীর নেপোলিয়নকে পরাজিত করে ওয়েলিংটন নামে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। সারা ভারতবর্ষে ইনি একজন মহাপুরুষ হিসাবে পরিচিত।

কর্নেল ওয়েলেসলি ইউরোপীয় অভিজাতসুলভ দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী ছিলেন। চিন্তাশীলতার ছাপ ছিল তাঁর মুখমণ্ডলে। মিতভাষী ও মিতাহারী ওয়েলেসলি ছিলেন অসীম কষ্টসহিষ্ণুতা গুণের অধিকারী। জনপ্রবাদ অনুসারে, তিনি নাকি সারা জীবনে একটি ভুলও করেন নি এবং একটিও অনাবশ্যক কথা উচ্চারণ করেন নি। এই প্রতিভাবান ব্যক্তিই ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নায়ক। তিনি বহু বছর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। এমন যে অনন্যসাধারণ ক্ষমতাবান যোদ্ধৃপুরুষ, তাঁকেই কেরলে ইংরেজ পক্ষের সৈনাপত্যে নিযুক্ত করা হলো। এর থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে কোম্পানী পয়শীর রাজাকে কতখানি ভয়ের দৃষ্টিতে দেখত এবং তাঁর পরিচালনাধীন কেরলের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কতখানি গুরুত্ব দিত।

বর্ষার আগমনে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বাধা পড়ায় প্রায় চার মাস অপেক্ষা করতে হলো। এই সময়টা ওয়েলেসলি কেরলের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করার কাজে এবং আগামী যুদ্ধের পরিকল্পনার প্রস্তুতিতে কাটিয়ে দিলেন। দেশের ভৌগোলিক অবস্থা এবং অধিবাসীদের মনোভাব ও মনোবল অনুধাবনের প্রয়াসে কতবার যে তিনি নীলেশ্বর থেকে কোজিক্কোড পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন তার ইয়ত্তা নেই।

ইতিমধ্যে মাস কয়েক কেটে গেল। তবু তলশেরীতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বোম্বাই থেকে শ্বেতাঙ্গ ও দেশী, পদাতিক সৈন্য, অশ্বারোহী এবং বন্দুক, কামান প্রভৃতি অধিক সংখ্যায় তলশেরীর দিকে আসতে লাগল। তোড়জোড়

চলছিল পূর্ণমাত্রায়, কিন্তু ওয়েলেসলি যুদ্ধ শুরু করার কোনো লক্ষণ দেখালেন না।

তলশেরীর ইংরেজ পক্ষীয় ছোট ছোট রাজারা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন যথাসম্ভব শীঘ্র যুদ্ধ শুরু করার ছিল পক্ষপাতী। তাদের বক্তব্যের জবাবে তিনি শুধু বলেছিলেন, 'সময় হয় নি, ঠিক সময় দেখা যাবে।'

কেউ জানত না, ওয়েলেসলি কি চান। যদিও কোট্টায়াম এবং কুত্তুপরম্পতে তিনি সৈন্যদলকে মজুত রেখেছিলেন, তথাপি সেনাপতিদের উপর নির্দেশ ছিল যে, কারো উপরে যেন হামলা না হয়। এ ছাড়া মনত্তনাতেও ঐ একই নির্দেশে ইংরেজ-সৈন্য প্রস্তুত ছিল। শীঘ্রই তারা নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে বলাবলি করতে শুরু করল যে, সেখান থেকে তাদের সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে! এর ফলে তলশেরীর সুপারভাইসার বেবর অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠলেন। কোম্পানীর ব্যবসার জন্যে প্রয়োজনীয় গোলমরিচ যে সমস্ত অঞ্চলে জন্মাত, পূর্বে সেই সমস্ত অঞ্চলে সৈন্যদের রাখা হতো। কর্নেল সে সব জায়গা থেকে সৈন্যদের সরাতে শুরু করার পর গোলমরিচ সংগ্রহে অসুবিধা হতে লাগল। অবশেষে মনত্তনা থেকেও সৈন্য সরিয়ে নেবার কথা ওঠায়, তলশেরীর গোলমরিচের ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাবে বলেই সকলের আশঙ্কা হলো।

এ সম্পর্কে বোম্বাইএর গভর্নর কর্তৃক প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় প্রচারিত হলো যে, সেনাপতিদের মুখে ব্যবসা সম্পর্কীয় সমস্যার কথা উচ্চারিত হলে তাদের চাকরি নাও থাকতে পারে, এবং এমন সম্ভাবনাও আছে যে, এর ফলে কোম্পানীর কাজের পদ্ধতিতে কিছু অদল-বদল হতে পারে। কারণ একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক কাজ চালানো প্রয়োজন।

কর্তৃপক্ষের মতে, এ ব্যাপারে বেবরের রুষ্ট হওয়ার বিশেষ কোনো কারণ ছিল না। আসলে কিন্তু বোম্বাই সরকারকে না জানিয়ে তিনি

এতদিন ময়য়ীর ফরাসীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন। এ বছর অবশ্য তা পণ্ড হতে চলল। কোম্পানীর লোক ইংরেজ বাদে অন্য কারো কাছে এদেশের গোলমরিচ বিক্রি করলে তা কোম্পানীর নিয়ম-বিরুদ্ধ বলে মনে করা হতো। টিপুর হস্তচ্যুত হয়ে কেরল ইংরেজদের আধিপত্যে আসার পর থেকে ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোনো বিদেশী এদেশ থেকে গোলমরিচ কিনতে পারত না। তলশেরীর সুপারভাইসারের পক্ষে এই পন্থা ধনপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। গোলমরিচ প্রভৃতি বিদেশে চালান দেওয়ার মতো জিনিস ব্যক্তিগত-ভাবে কিনে তিনি ময়য়ী থেকে তা দালালের মাধ্যমে চড়া দামে বিক্রি করতেন। এই কাজে লুঈ পেরেরা নামক জনৈক দোভাষী সুপারভাইসারকে সাহায্য করত।

লুঈ পেরেরা প্রাক্তন এক সুপারভাইসারের কর্মচারী হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। এই দুশ্চরিত্র লোকটি সাহেবের সর্ব কুকর্মের প্রধান সহায় ও সাথী হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে মনিবের সুনজরে পড়ে যায়। ফলে সুপারভাইসার তাঁর দোভাষীদের মধ্যে একজন হিসাবে তাকে নিযুক্ত করেন। ঠিক সেই সময় টিপু কেরলকে কোম্পানীর কাছে হস্তান্তরিত করেন। কোম্পানীর ব্যবসায়ী অফিসারদের লোলুপতা এবং অপকর্মের খবরাখবর সম্বন্ধে লুঈ তখনি বেশ ভালোরকম ভাবে ওয়াকিফহাল হয়ে উঠে। কাজেই উপর-মহলও শঠতা ও নোংরামির অংশীদার হিসাবে তাকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করল না। ক্রমে ক্ষুদে অফিসারদের সহায়তায় ফরাসীদের কাছে গোলমরিচের বিক্রয়-ব্যবসাতে সে বেশ পসার জমিয়ে নিল। ফলে অত্যল্পকালের মধ্যেই লুঈ একজন বিত্তবান শ্বেতাঙ্গে পরিণত হলো। তবে দাসসুলভ নম্র ব্যবহারকে সে কোনো দিনই পরিত্যাগ করে নি।

বেবর তলশেরীর সুপারভাইসার হওয়ার পর লুঈ পেরেরার মূল্য তাঁর কাছেও বেশ চড়া বলে মনে হলো। বেবর ছিলেন অবিবাহিত।

তিনি আগেই শুনেছিলেন যে, তলশেরী ইউরোপীয় দেবতাদের জন্য অপ্সরায় ভরা একটি স্বর্গলোক বিশেষ। এ সম্পর্কে লুঈকে কেবল একবার জানাতে হয়েছিল মাত্র। বেবর জানতেন, পেরেরা একজন প্রথম স্তরের দোভাষী, যে কোনো ব্যবসা সম্পর্কীয় ব্যাপারে সে অসাধারণ জ্ঞান রাখে। তাই শীঘ্রই অনেক অপ্সরা পেরেরার উদ্যোগ ও উদ্যমে সুপারভাইসারের কুঞ্জবিহারিণী হলো। কিন্তু এই কাহিনী শুরু হবার বছর তিনেক আগে থেকে চিরুতাক্কুট্টি নামে এক উর্বশী অন্য সকলকে বহিষ্কৃত করে নিজেকে সুপারভাইসারের গৃহে একমেবা-দ্বিতীয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

পেরেরার গুণাবলীর কিছুই যখন আর সুপারভাইসারের কাছে অজ্ঞাত রইল না, তখন তিনিও তাঁর গোপন ব্যবসায়ের বিষয়টি তার কাছে গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করলেন না। ফলে যৌথভাবে ব্যবসা আরো ফলাও—জমজমাট হয়ে উঠল। শোনা যায়, এসব ক্ষেত্রে উন্নতির মূলে নাকি চিরুতাক্কুট্টিরও হাত ছিল।

ওয়েলেসলির নতুন নীতি ওঁদের এই সব কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে লাগল। মাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে যে টাকা অগ্রিম নেওয়া হয়েছিল, অন্তত সেই টাকা বাবদ প্রাপ্য গোলমরিচও ময়য়ীতে পৌঁছে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। এখন আবার মনন্তনা থেকেও সৈন্য সরিয়ে নিলে যে কত অসুবিধা হবে লুঈ তা বেবরকে ভালো-ভাবে বোঝায়। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, বেবর ওয়েলেসলির সঙ্গে দেখা করে তাঁর যুদ্ধনীতির অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা একবার করে দেখবেন।

সুপারভাইসারের প্রাসাদের অদূরেই ওয়েলেসলির বাসস্থান। মাননঞ্চেরির ঘটনার পর, দিন দুই কেটে গেছে। বিকাল হতে তখনো কয়েক প্রহর বাকি। বেবর পালকি করে কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে চললেন। গন্তব্যস্থলের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানো মাত্রই অবিলম্বে অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি এসে পৌঁছাল।

ওয়েলেসলি তখনো নিজের কাজে ব্যস্ত। উত্তর কেরলের একখানি বড় মানচিত্র দরজার সামনে দোদুল্যমান, আর তার উপর লাল ও নীল পেনসিল দিয়ে কয়েকটি নিশানা এঁকে তিনি নিজের কার্যক্রমের ব্যাপারে চিন্তামগ্ন ছিলেন। সৈন্যবাহিনীর দু-তিনজন উপনায়ক ছাড়া কর্নেলের দোভাষী এবং অন্য এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই অন্য ব্যক্তিটিকে দেখে নায়ার বলে মনে হয়।

সুপারভাইসারকে সাদর অভিবাদন সহ স্বাগত জানিয়ে ওয়েলেসলি বললেন, 'কয়েকটি ব্যাপারে আপনার পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন বলে, ভাবছিলাম লোক পাঠাব। ভালোই হলো, আপনি নিজেই এসে গেছেন।'

'গত দুদিন ধরে কিছু পরামর্শ করার জন্য আমিও এখানে আসব আসব ভাবছিলাম। কিন্তু কাজের চাপে অবকাশ পাই নি।'—সুপারভাইসার বলেন।

'আমাদের পরামর্শটা সংক্ষেপে সেরে নেওয়া যাক।'—কর্নেল বলেন, 'আমি কেরলবর্মার সঙ্গে অবিলম্বে একটা মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি। বর্ষাকালও শেষ হয়েছে। এখন আর দেরি করার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর অহঙ্কার দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি মাননঞ্চেরির প্রতিশোধ না নিলে আমাদের শক্তির উপর লোকের শ্রদ্ধা একেবারে কমে যাবে। কর্নেল, আপনার যখন যুদ্ধ করার ইচ্ছা আছে তখন পরিণাম সম্পর্কে আশঙ্কা অনাবশ্যক।'

'লড়াইয়ের কথা পরে হবে, আমার উদ্দেশ্য সেটা নয়। ঐ নকশার উপরে কয়েকটা লাল নিশানা দেখছেন? আমি সবার আগে সেইসব জায়গায় দুর্গ তৈরি করতে চাই।'

'ওগুলো কোন্ কোন্ জায়গায় আছে?'

'নকশাটার দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

সুপারভাইসার মানচিত্রের উপর দৃষ্টিপাত করে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—'বয়নাড়ু এবং কোট্টায়ামের মূল জায়গাগুলো এতে চিহ্নিত হয়েছে দেখছি। কিন্তু এতগুলি দুর্গ তৈরীর টাকা কোথায়?'

'এই ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা ছিল। লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা আপনার কর্তব্য। ইরুবনাড়ের দুর্গ যেন অবিলম্বে তৈরী হয়ে যায় এবং অন্য জায়গার কাজও শুরু হতে দেরি না হয়। জরুরী যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে বর্তমানে সর্বসাকুল্যে দু লাখ মোহর আমাদের হাতে রাখতে হবে।'

সুপারভাইসার অবাক হয়ে বলেন, 'সে কি? দু লাখ মোহর! লাখের কথা দূরে থাকুক, এখানে তো অনেক খেটেখুটেও দুটো মোহর পাওয়া যাবে না। এই তহবিলে এত টাকা আসবে কোত্থেকে? কোনো ব্যবসাই তো চলছে না আজকাল। আজকাল আবার মনত্তনা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিলে গোলমরিচের একটি টুকরোও আর আড়তে থাকবে না।'

'এই সব অজুহাত আমি শুনব না। আমার যুদ্ধ-পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে গেছে। এর জন্যে অবিলম্বে অর্থ প্রয়োজন। এখানকার তহবিলে না থাকলে বাধ্য হয়ে আমাকে কলকাতা যেতে হবে।'

কলকাতায় যাওয়ার কথাটা শুনেই সুপারভাইসারের হৃৎকম্প আরম্ভ হয়ে গেল। তিনি জানতেন যে নিজের বিশ্বস্ত ও যোগ্য স্নেহভাজন ভাইয়ের বিরুদ্ধে গভর্নর-জেনারল কিছুই করবেন না, বরং সুপারভাইসারের অপদার্থতা প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কাই অধিক। কর্নেলের সঙ্গে এখন শত্রুতা করার অর্থই হচ্ছে, নিজের চাকরি, ব্যবসা, উন্নতি প্রভৃতি সব কিছুকে হারানো। এক মুহূর্তে এই সব কথা ভেবে নিয়ে তিনি কৌশলে কাজ হাসিল করার উদ্দেশ্যে বললেন, 'লড়াইয়ের জন্যে আপনি যখন প্রস্তুত, তখন তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে হবে। সে অর্থ সংগ্রহ করা বাস্তবে কত কঠিন, আমি সেই

কথাটাই আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। আপনার অনুমতি নিয়ে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। আচ্ছা. আমরা তো বিশাল একটা সৈন্যদল তৈরি করছি। এরকম অবস্থায় অরণ্য-আশ্রিত দুর্বল রাজাকে আক্রমণ করে পরাজিত করা এমন কি কঠিন কাজ? শুনেছি তাঁকে সাহায্য করার জন্যে মাত্র এক হাজারের বেশী লোকও নেই। বোম্বাই থেকে আনা সৈন্য এবং সামগ্রী দিয়ে একটা বড় সাম্রাজ্য জয় করা যায় না কি?'

'কর্নেল ড্যুও সেই কথাই ভেবেছিলেন.'—মৃদু হেসে কর্নেল বলেন, 'কিন্তু তার পরিণাম কি হলো? সেই সেনাপতির ক'জন সৈন্য আজ বেঁচে আছে? তাঁর সৈন্যবাহিনীর ক'টা বন্দুক-কামানই বা আজ কাজে আসছে? আমি ঐ ধরনের বুদ্ধিহীন হঠকারিতায় অনভ্যস্ত।'

'কিন্তু প্রাণভয়ে পলায়মান শত্রুকে ধ্বংস করার জন্যে এতবড় আয়োজনের আবশ্যকতা কি?'—সুপারভাইসার জিজ্ঞাসা করেন।

'আপনি ভুল বুঝেছেন—তারা এক হাজার নয়। তারা এক এবং তিনি হচ্ছেন কেরলবর্মা। তাঁকে পরাজিত করতে হলে অত্যন্ত সতর্কভাবে কাজ করতে হবে। আপনি কি মনে করেন যে, তাঁর সঙ্গে শুধু এক হাজার লোকই আছে?'—কর্নেল পালটা প্রশ্ন করেন।

'আমার ধারণায় তার চেয়ে বেশী একজনও নেই। প্রজারা তো আমাদের শাসনে আছে।'—সুপারভাইসার বলেন।

কর্নেল দোভাষীর দিকে ঘুরে বলেন, 'এঁকে ঐ ধনী সামন্তদের নামের তালিকাটা পড়ে শুনিয়ে দাও—যাদের বিরুদ্ধে আমাদের অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।'

দোভাষী পড়তে শুরু করে,—'কটত্তনার রাজা অবিজ্জাট নায়ার, পেরুবয়িলা নাম্প্যার, চুয়লি নাম্প্যার, ইরুবনাট নাম্প্যার, কল্যাড বাবু, এমন নায়ার,……।'

সুপারভাইসার চমকে গিয়ে বলেন, 'এঁরা সব তো আমাদেরই বন্ধু লোক। এঁরা তো কোম্পানীর গোলমরিচের যোগানদার বন্ধু।'

কর্নেল হেসে ওঠেন,—'ঠিক বলেছেন। এঁরা আমাদের কাছে গোলমরিচ বিক্রি করেন এবং বিনিময়ে আমাদের কাছ থেকে টাকা নেন। কিন্তু আপনি কি কোনোদিন ভেবেছেন যে, তাঁরা সেই টাকা দিয়ে কি করেন! সে টাকার একটা মোটা অংশ কেরলবর্মা সাহায্য হিসাবে পান। জঙ্গলে যারা থাকে তাদের জন্য এঁরাই রসদ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, এঁরা বন্দুক এবং কামান সংগ্রহ করেন, এবং আমাদের গোপন আলোচনা রাজার কানে পৌঁছে দেন। একটি কথা সব সময় মনে রাখবেন, এই দেশের প্রত্যেকটি লোক কেরলবর্মার পক্ষে। তাদের ছলে বলে কৌশলে বিচ্ছিন্ন করার আগে যুদ্ধ করলে এখানে আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তিই নড়ে উঠবে।'

'এঁরা যে সব কেরলবর্মার সাহায্যকারী বলছেন, তার প্রমাণ কি?'—সুপারভাইসার জিজ্ঞাসা করেন, 'এঁদের অনেকেই আমাদের কাছে আসেন এবং নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন।'

'প্রমাণ? হ্যাঁ, আমিও গোড়াতে এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ ভদ্রলোকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় প্রমাণ পেয়ে গেছি।'—পাশের ঘরে উপবিষ্ট নায়ারের দিকে ইশারা করে কর্নেল জবাব দেন।

'বেশ, তাহলে এ ব্যাপারে কি করতে হবে?'—সুপারভাইসার যেন হতাশ হয়ে প্রশ্ন করেন।

'এখনো ঠিক করি নি কি করতে হবে। তবে একটা বিষয়ে এখন থেকেই আমাদের পরিষ্কার থাকা উচিত যে আগামী দিনে আমাদের মধ্যে যেন এই ধরনের ভুল ধারণা না থাকে। কেরলবর্মাকে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁদের শক্তিহীন করে দিতে পারলে কেরলবর্মা এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়বেন।'

'কিন্তু ব্যক্তি এবং তার মর্যাদার দিকে লক্ষ্য না রেখে হঠাৎ কোনো কাজ করে বসলে, সারা দেশের প্রজাদের উপর একটা খারাপ প্রতি-ক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। তখন আমাদের ব্যবসার কি অবস্থা হবে

বুঝতে পারছেন তো ?'—সতর্ক করে দেওয়ার ভঙ্গিতে সুপারভাইসার বলেন।

'ব্যবসার কথা আমি জানি না ; তবে, প্রজাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার কথা আমি ভেবেছি।—সেটা যখন হবে, তখন আমি তার প্রতিবিধান করব।'—দৃঢ়তার সঙ্গে কর্নেল বলেন।

কথার ভাবে ভঙ্গিতে সুপারভাইসার বুঝতে পারেন যে, কর্নেল তাঁর সমরনীতির মূল কথাগুলি প্রকাশে ইচ্ছুক নন। কাজেই সে সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে খুব বেশী লাভ নেই। শেষ পর্যন্ত সুপারভাইসার বেবর সংকল্প করেন যে, যে কোনো উপায়ে হোক মনত্তনা থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দিতে হবে। তাই তিনি আবার বলেন, 'আপনার যুদ্ধনীতি বোঝার মতো জ্ঞানবত্তা আমার নেই। কিন্তু পরাজিত প্রজাসাধারণকে দ্বিতীয়বার পরাজিত করার পরিকল্পনা যে সমরনীতিতে রয়েছে তা আমার কাছে নতুন।'

'বন্ধু, আমি কার্যসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করছি, স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র পন্থা হচ্ছে যুদ্ধ। কেরলকে মুঠোর মধ্যে আনা এবং বিরোধীদের খতম করাই আমাদের উদ্দেশ্য, তার জন্য চাই প্রয়োজনীয় শক্তি। কিন্তু আপনি হয়তো ভাবছেন যে, রণক্ষেত্রে দুই পক্ষের লোক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে হত্যা করার নামই যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে আমার ধারণা অন্য রকম। আর আমার মনে হয়, কেরলবর্মার সমরকৌশলও মামুলী ধরনের নয়। আমরা উভয় পক্ষই পরস্পরের যুদ্ধনীতি বুঝি। কিন্তু এই ব্যাপারে, আমার মনে হয়, আপনার মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন।—কর্নেল বলেন।

'আপনার কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু দেখুন, সৈন্যবাহিনীকে এইভাবে নিরাশ করলে, আমাদের সম্মানের কতটা হানি হবে, তা কি বুঝতে পারছেন ? এখন তো শুধু মনত্তনাতেই আমাদের সৈন্য আছে, তাও সরাতে চাইছেন !'—অভিযোগের সুরে সুপারভাইসার বলেন।

'আমি আপনার মতলব বুঝতে পেরেছি।—কিন্তু আমি নিরুপায়।'

কর্নেল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। বেবর বুঝতে পারেন যে, কর্নেল তাঁকে বিদায় দিতে চাইছেন; সুতরাং অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করাই বিধেয়।

সুপারভাইসার চলে যাওয়ার পর ওয়েলেসলি নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দেশ দেন। সর্বপ্রথম তিনি চুয়লি নাম্প্যারকে বন্দী করে তলশেরীতে আনার আদেশ দিলেন, এবং দায়িত্ব পালনের জন্য তৎক্ষণাৎ এক সৈন্যদলও নিযুক্ত হলো। তারপর তিনি বয়নাড়ুর এমন নায়ারকে বলপূর্বক ধরে শ্রীরঙ্গপত্তন নিয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় নির্দেশ জারি করলেন। ওয়েলেসলি জানতেন যে এই কাজ সহজসাধ্য নয়। এমন নায়ার খুব প্রতাপশালী সামন্ত, সারা বয়নাড়ু তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। কর্নেল এও জানতেন যে, তাঁকে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব পরিবৃত অবস্থায় বন্দী করার শক্তি এখনো কোম্পানীর হয় নি। কাজেই ছলে বলে কৌশলে তাঁকে বন্দী করতে হবে। এই কাজ হাসিলের জন্য একটি পন্থাও তিনি পূর্বেই স্থির করে রেখেছিলেন। তদনুযায়ী তাঁরই প্রেরিত একজন সেনাপতি পত্র নিয়ে গেল কটত্তনার রাজার কাছে। চিঠিতে লেখা ছিল যে, কেরলবর্মার সাথে রাজার গোপন যোগাযোগের কথা কর্নেল জানতে পেরে গেছেন। এবং এই ধরনের কাজের সঙ্গে যদি তিনি তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন না করেন তাহলে তাঁর বংশের মূলোচ্ছেদ করতে কর্নেল বদ্ধপরিকর।

ওয়েলেসলি যখন এই ধরনের কূট কর্মে ব্যস্ত, এমন সময় হোম্‌স নামে একজন উপ-সেনাপতি ঘরে প্রবেশ করল। তার মুখের ভাব এত গম্ভীর যে, দেখেই মনে হয়, সে অবশ্যই কোনো গুরুতর ব্যাপারে এসেছে। মাথা তুলে কর্নেল তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

'খবর এলো যে কেরলবর্মা সৈন্যসামন্ত নিয়ে কুট্টিয়াড়ী ছাড়িয়ে এসেছেন। মনত্তনার শিবির আক্রমণ করবার জন্য তিনি প্রস্তুত।'—মেজর হোম্‌স বলে।

'আমাদের সেনাদলকে প্রথমেই ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত ছিল।'—কর্নেল বললেন, 'কিন্তু এখন তো কোনো উপায় নেই। কেরলবর্মা ঐ সৈন্যদলকে ধ্বংস করবেনই, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যাই হোক, সাহায্যের জন্য তুমি দুশো সৈন্য নিয়ে এক্ষুণি রওনা হয়ে যাও।'

নিজের একদল সৈন্য শত্রু-পরিবেষ্টিত হয়েছে শুনেও কর্নেল বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হলো না। মেজর হোম্‌সকে জরুরী নির্দেশ দেওয়ার পর কর্নেল আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলেন।

মেজর বিদায় গ্রহণ করলে অপেক্ষমান নায়ার বললেন, 'কন্নবত নাম্প্যার সৈন্য নিয়ে বয়নাড়ুতে ঢুকে পড়েছে এ সংবাদ আমি আগেই আপনাকে দিয়েছি। এখন রাজা সাহেব নিজের আস্তানা ছেড়ে কুট্টিয়াড়ী ছাড়িয়ে এসেছেন। এই সময়ে পুরলী পাহাড়ে বিশেষ কোনো পাহারার ব্যবস্থা থাকবে না। অতর্কিত আক্রমণে রাজার ঐ ঘাঁটিটিকে এখন মুঠোর মধ্যে আনতে পারেন কিন্তু...'

'কী হবে তাতে?'—আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্যে কর্নেল নির্বিকারভাবে জিজ্ঞাসা করেন।

প্রত্যুত্তরে ঐ নায়ার পুরলী পাহাড়ে রাজা সাহেবের শিবির ও অস্ত্রাগারগুলির অবস্থান এবং সেগুলি দখল করার পন্থা কর্নেলকে জানান।

'কন্নবত ন্যাম্পার এবং রাজা সাহেব সেখানে অনুপস্থিত। এই অবস্থায় পাহারার জন্য কিছু ভিল হয়তো সেখানে রয়েছে।'—তিনি ওয়েলেসলিকে বলেন।

কর্নেল তাঁর কথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না। কারণ তাঁর ধারণা, নিজের অস্ত্রাগার সুরক্ষিত না রেখে কেরলবর্মা কোথাও যেতে পারেন না। তিনি এই সংশয় ব্যক্ত করার পর দোভাষীর মাধ্যমে নায়ার বললেন, 'কর্নেল, শুনুন। সে জায়গাটা সত্যিই খুব সুরক্ষিত। আপনি যত সৈন্যই নিয়ে যান না কেন তবু

সে স্থান খুঁজে বার করা অসাধ্য। আর যদিও বা খুঁজে বার করা যায় তো তা দখলে আনতে আপনি অসমর্থ হবেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার গোপন পথও আছে। এই পথ রাজা সাহেবের অতি বিশ্বস্ত গুটিকয়েক অনুচরই শুধু জানে। আমরা সেখানে গিয়ে দু-একদিন লুকিয়ে থাকলে সেই জায়গা দখল তো বটেই উপরন্ত রাজা সাহেবকেও বন্দী করতে সক্ষম হবো।'

'বেশ, এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা যাবে'খন। আপনি বরং আমার রাত্রের খাওয়া দাওয়ার পর একবার আসুন। তখন ঠিক করা যাবে।'—এই কথা বলে কর্নেল ভেতরে চলে যান।

সাত

কর্নেলের কাছে বিদায় নিয়ে নায়ার নিজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর খুব আনন্দ হচ্ছিল অভীষ্ঠসাধনে আর বিলম্ব নেই ভেবে। তিনি স্থিরনিশ্চয় যে এবার রাজা অবশ্যই ধৃত হবেন। পথে যেতে যেতে তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে চিন্তা করে দেখলেন, কিন্তু উদ্দেশ্য বিফল হওয়ার কোনো কারণই খুঁজে পেলেন না। কর্নেলের কথা এবং কাজ যে অভিন্ন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কাজেই কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্য মহাবৈভব ও পদবী ইত্যাদির কথা চিন্তা করে তিনি অপূর্ব আনন্দ অনুভব করলেন।

আত্মমগ্নভাবে কিছুক্ষণ পথ চলার পর নায়ার এক প্রাসাদের পশ্চাদবর্তী রাস্তায় এসে পড়লেন। চিরুতাক্কুট্টির জন্য সুপারভাইসার এখানে নতুন একটি বাসগৃহ নির্মাণ করিয়েছেন। ইমারতটি তলশেরীর মনোহর অট্টালিকাগুলির অন্যতম। সুপারভাইসারের সঙ্গে চিরুতাক্কুট্টির সম্পর্ক স্থায়িত্বের পর্যায়ে আসার পরও তলশেরীর সাধারণ মানুষের মনে চিরুতাক্কুট্টির স্থান সম্মানজনক ছিল না, যদিও কালে কালে সে এক শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা এবং সম্মান লাভ করেছে।

নিজস্ব ঘর-দোর বলতে তাঁর ছিল না কিছুই। অনির্দিষ্ট ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে যাযাবরের মতো ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে কয়েক বছর পূর্বে সে এসে তলশেরীতে এসে জুটেছিল। কিন্তু কোনো এক যাদু-মন্ত্রবলে অতি অল্পকালের মধ্যেই সে যেন এক মহারানীর পদমর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হলো। জনরব ছিল, তার কাছে অগাধ

ধন-সম্পত্তি মজুত আছে। চিরুতাক্কুট্টি যে ধরনের বস্ত্র ও অলঙ্কার ব্যবহার করত সে ধরনের মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য-সম্ভার নাকি সে যুগে কেরলের কোথাও পাওয়া যেতো না।

নানা রকম বৈচিত্র্যের সমাবেশে চিরুতাক্কুট্টির জন্য যে প্রাসাদ সুপারভাইসার সাহেব গড়ে তুলেছিলেন তার সঙ্গে স্বর্গের ইন্দ্রপুরীরই শুধু তুলনা চলে। নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য রাজা-মহারাজা, মহাসামন্ত, শ্রেষ্ঠী, ধনপতি প্রভৃতিরাও সেই প্রাসাদে পদার্পণ করে থাকেন। এমনও জনশ্রুতিও আছে যে, কন্নুরের বেগমের সঙ্গে ইংরেজরা শত্রুতাসাধনে অগ্রসর হলে তীক্ষ্ণ বাস্তবজ্ঞানসম্পন্না সেই নারীও চিরুতাক্কুট্টির মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে উপঢৌকন নিয়ে ঐ প্রাসাদে এসেছিলেন। সারা দেশে একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে ইংরেজদের কাছ থেকে কোনো রকম সুযোগ লাভ করতে হলে যেটি সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হলো চিরুতাক্কুট্টিকে সন্তুষ্ট করা।

সুতরাং ঐ নায়ারও ভাবলেন যে একবার ঐ সুন্দর প্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন করে গেলে তা অবশ্যই কোনো-না-কোনো ভাবে লাভজনক হবে। কারুকার্যখচিত দেবী মন্দিরের মাহাত্ম্য-মণ্ডিত সৌন্দর্যের প্রতি ভক্তের মানসিক আবেগ-বিহ্বলতা নিয়ে তিনি কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকেন সেই প্রাসাদের দিকে। কিন্তু একি! এযে অবিশ্বাস্য! প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বার উন্মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে মনুষ্যমূর্তিটি তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো, স্থান-কাল বিবেচনায় তাঁর উপস্থিতি যে অকল্পনীয়! কৈনেরীর আম্পু নায়ার এখানে! উভয়েই উভয়কে দেখলেন এবং চিনলেন। কারো মুখ থেকে কোনো কথা বেরুনোর আগেই আম্পু এক পলকে প্রাসাদের মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হলেন এবং ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে ঐ নায়ারের অলক্ষ্যে প্রাসাদ অতিক্রম করে নিঃসঙ্কোচে সম্মুখবর্তী পথে পা বাড়ালেন।

এদিকে ঐ নায়ারও অবিলম্বে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন ওয়েলেসলির বাসস্থানের দিকে। কর্নেলের দোভাষীর সঙ্গে দেখা হতেই

উত্তেজিত ব্যগ্রকণ্ঠে তিনি তার কাছে যা নিবেদন করলেন তার মর্মার্থ হলো, মাননঞ্চেরির মারণযজ্ঞের হোতা, রাজা সাহেবের অন্যতম প্রধান কর্মচারী আম্পু নায়ার তলশেরীতে আত্মগোপন করে রয়েছেন এবং কমপক্ষে চারজন দক্ষ সৈনিকের সহায়তা পেলেই তিনি ঐ আত্ম-গোপনকারী শত্রুকে বন্দী করতে সক্ষম হবার আশা রাখেন। শেষ পর্যন্ত কর্নেলের নির্দেশে দশজন সৈন্য নিয়ে ঐ নায়ার সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তাঁর অনুমান ছিল, আম্পু নায়ার শহরের রাজপথ ধরে অগ্রসর হবার সাহস করবেন না। কাজেই তিনি দ্রুতগতিতে তলশেরী থেকে নিষ্ক্রমণের পথের দিকে চলতে লাগলেন। কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছে অনুসন্ধানে জানা গেল যে আম্পু নায়ার ইতিমধ্যেই নগরসীমা অতিক্রম করেছেন এবং পান্নুরের পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছেন। সুতরাং তাঁরাও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতর গতিতে শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

ইতিমধ্যে আম্পু নায়ার বুঝতে পারলেন যে, শত্রুপক্ষ তাকে অনুসরণ করছে। সুতরাং গা ঢাকা দেওয়ার জন্য তিনি সাবধানে গোপন পথ ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ তার মনে পড়ল যে, শত্রুপক্ষও এই গোপন পথের সন্ধান রাখে। এতক্ষণ ভেবে চিন্তে অগ্রসর না হওয়ায় নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুশোচনা করে অবশেষে তিনি রাজপথ ধরেই আবার অগ্রসর হলেন।

হঠাৎ 'ঐ তো যাচ্ছে' বলে কোম্পানীর লোক তাঁর পিছু ধাওয়া করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই তিনটে তীর আম্পুর কাছে এসে পড়ে। শিকারী কর্তৃক ঘেরাও হওয়া বাঘের মতো তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং সর্বশক্তি নিয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করেন। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর দেখেন, পথটা বেঁকে গেছে। শত্রুরা যাতে দেখতে না পায় এমনিভাবে হঠাৎ একটি বনে ঢুকে পড়ে তিনি সোজা গিয়ে এক বটগাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

আম্পুর পশ্চাদ্ধাবমান সৈন্যরা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু তারা আম্পুর এই চাল বুঝতে পারে নি। রাস্তা ধরে ছুটে গিয়ে তাঁর পাত্তা না পেয়ে ঐ নায়ার পথিকদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, ঐ ধরনের কোনো লোককে তারা দেখে নি। তখন সৈন্যদের দুজন দুজন করে ভাগ করে বনে ঢুকে চারদিক খোঁজ করতে পাঠালেন।

আম্পু নায়ার ভেবেছিলেন শত্রুরা এগিয়ে গেলে গা ঢাকা দিয়ে আবার তিনি তলশেরীর পথ ধরতে পারবেন। কিন্তু এই চিন্তা কার্যকরী হওয়ার আগেই তিনি দেখতে পেলেন যে, তাদের মধ্যে দুজন তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে বটগাছটির দিকে এগিয়ে আসছে। কিছুটা দূর থেকেই হঠাৎ তারা চিৎকার করে উঠল,—'এই তো এখানে দাঁড়িয়ে আছে।' তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একজন গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হকচকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আম্পু নায়ারের তালোয়ারের শিকার হয়।

বন্দুকের আওয়াজ শুনে শত্রুরা এখনি ঘটনাস্থলে ধেয়ে আসবে চিন্তা করে আম্পু আবার দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করেন।

সূর্যাস্তের আর বেশী দেরি নেই। নায়ারের মন ভেঙে পড়ে। কারণ কর্নেলের সঙ্গে যে ব্যাপারে তিনি পরামর্শ করেছিলেন তার জবাব পাওয়ার জন্য তাঁকে রাত্রেই আবার তাঁর কাছে যেতে হবে। বিষয়টি খুব জরুরী এবং তার উপর তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সন্ধ্যার আগে তলশেরী ফিরে গিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে কার্যসিদ্ধির জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করতে হবে। তা না করে এক অপদার্থ কর্মচারীর পেছনে ছুটে পরিশ্রান্ত হয়ে কোনো লাভ নেই। এই সব কথা ভেবে তিনি সেই মুহূর্তে ফিরে যাওয়া ঠিক করেন।

আম্পুকে ধাওয়া করতে করতে ইতিমধ্যে তারা পানুরে পৌঁছে গেছে। পানুর কোম্পানী-অধিকৃত অঞ্চল নয়। সুতরাং নায়ার বুঝতে পারলেন যে, এখন আর আম্পুকে ধরা সহজ নয়। তবু একবার শেষ

চেষ্টা করে দেখবার জন্য ক্লান্ত অনুগামীদের নিয়ে তিনি চন্ত্রোতের ক্ষেত দিয়ে চলতে শুরু করলেন। ক্ষেতের চড়াই-উতরাই দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার অসুবিধার জন্য আম্পু নায়ার সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন। সোজা পথে চন্ত্রোত-বাড়ি গেলে কোম্পানীর লোক চন্ত্রোত নাম্প্যারের উপর উপদ্রব করবে আশঙ্কা করে আম্পু হঠাৎ সরু এক পথ ধরে অন্য এক ময়দানে নেবে ছুটতে শুরু করলেন। ঘটনাচক্রে হঠাৎ পথে উন্নির সাথে দেখা। রাত্রের রান্নার জন্য সে কলস-কাঁখে পুকুরের দিকে জল আনতে যাচ্ছিল।

'একি, বাবু যে!'—বিস্ময়ভরা কণ্ঠে সে বলে।

'চুপ,'—আম্পু ঈশারায় বলেন, 'পিছনে কোম্পানীর লোক লেগেছে, আমাকে খুঁজছে। তাড়াতাড়ি কোথাও লুকোতে হবে।' তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলো বলে যান।

উন্নির চোখের সামনে অন্ধকার নামে, তার মাথা ঘুরতে থাকে। আম্পু নায়ারের দুরবস্থা দেখে মন তার ব্যথায় ভরে যায়। সে শুধু বলে, 'এই দিক দিয়ে ভেতরে চলে যান। ঘরে কেউ নেই, মামী আর বাচ্চারা চন্ত্রোত-বাড়ি গেছে।'

মুহূর্তে আম্পু আঙ্গিনায় পৌঁছে যান। কিন্তু ঘরে লুকোনোর পরে শত্রুরা যদি তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়. এই ভেবে তাঁর খুব আশঙ্কা হলো। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় না থাকায় অবশেষে তিনি ঘরের ভিতরেই আশ্রয় নিলেন।

কোম্পানীর লোকের ক্ষেতের উপর দিয়ে চলার অভ্যাস ছিল না। তাই তারা যখন ক্ষেত পেরিয়ে এসে আম্পু নায়ারের নাগাল পাওয়ার পরিবর্তে পুকুর থেকে জল নিয়ে ফিরতে-থাকা কলস-কাঁখে এক যুবতীকে দেখতে পেল, তখন তাকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ছুঁড়ি, এই পথ দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছিস?'

কথাটা শুনেই উন্নি চিৎকার করে ওঠে,—'ওগো, কে কোথায় আছ গো, আমাকে বাঁচাও! বাঁচাও! ডাকাত! ডাকাত!'

'ওর মুখ চেপে ধর।'—নায়ার নির্দেশ দেন।

উন্নির হাঁক-ডাক শুনে চন্ত্রোতের কয়েকজন লোক ছুটে আসে।

'ভীষণ বিপদ ঘটতে পারে এবার, শীগগির এখান থেকে চলো। হাতের কাছে একে পেয়েছি, একেই নিয়ে চলো।'—নায়ার বলেন।

উন্নিকে কাঁধে নিয়ে এবার তারা সেই ক্ষেতের পথ ধরে ফিরতে শুরু করে। চন্ত্রোতের চারজন লোক তাদের পিছু নিয়ে ক্ষেতে নামে। কিন্তু নায়ারের রিভলবারের আওয়াজ শুনে তাদের পিছু হটতে হয়। তারা চন্ত্রোতবাবুকে খবর দেওয়ার জন্যে চন্ত্রোত-বাড়ির দিকে ফিরে যায়।

আম্পু নায়ার ঘরের ভিতরে ঢুকেছিলেন বটে কিন্তু সেখানে বসে না থেকে তিনি চন্ত্রোত-বাড়ির দিকে গেলেন। ফলে ঘটনাটি তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারলেন। তাঁকে বাঁচানোর জন্যে উন্নির উপর এতখানি বিপদ ঘনিয়ে এসেছে জেনে তিনি মনে বড় ব্যথা পান এবং সমস্ত রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়েও উন্নিকে ঐ রাক্ষসদের হাত থেকে মুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করেন মনে মনে। কিন্তু অবিলম্বে রাজা সাহেবের নির্দেশ পালন করাও প্রয়োজন। যে সব বিষয়ে তিনি তলশেরী থেকে জানতে পেরেছেন, সেগুলি কালমাত্র বিলম্ব না করে রাজা সাহেবকে জানানো দরকার। মুহূর্তের বিলম্বে সবকিছু পণ্ড হয়ে যেতে পারে।

কোন্ কাজ আগে করবেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না আম্পু নায়ার। শেষ পর্যন্ত তিনি আগে চন্ত্রোতবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাঁকে জানাতে মনস্থ করলেন।

গোপনভাবে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আম্পু নায়ারের কোনো অসুবিধা হলো না। খবর পাঠানো হলো, তলশেরী থেকে একজন লোক এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে চন্ত্রোত নাম্প্যার তাঁকে তাঁর সামনে হাজির করতে নির্দেশ দিলেন। আম্পু নায়ারের হাবভাবে তিনি বুঝলেন, কোনো জরুরী কথা আছে। কাজেই ভালোমন্দের

তু-একটি মামুলী কথা জিজ্ঞাসা করার পর নাম্প্যারের প্রশ্নের উত্তরে আম্পু জানালেন, তিনি কি ভাবে বিপদে জড়িয়ে পড়েছিলেন আর সেই বিপদ থেকে কি ভাবেই বা রক্ষা পেয়েছেন। উন্নি তাঁকে কতখানি সাহায্য করেছে আর কারাই বা তাকে ধরে নিয়ে গেছে, সে কথাও তিনি নাম্প্যারকে বলতে ভুললেন না।

'তাহলে এখন উপায় কি ?'—নাম্প্যার জিজ্ঞাসা করেন।

'মেয়েটিকে এই ভাবে তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই গৌরবের নয়। জানি না তুর্বৃত্তরা তাকে কি ধরনের কষ্ট দেবে। দাসী বানিয়ে বিক্রি করতেও বোধ হয় তারা সংকোচ বোধ করবে না।'

'তাহলে কি করা যায় ?'

'আমার মতে, এখনি একজন লোক পাঠিয়ে তলশেরীর সুপার-ভাইসারকে ঘটনাটি জানালে এ বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। তাঁর কাছে দাবির সুরে একটি আবেদন পেশ করলে কিছু লাভ হবে। তাতে পরিষ্কার ভাবে লেখা থাকবে যে, কোম্পানীর লোক চন্ত্রোত-বাড়িতে ঢুকে তাদের আশ্রিতা কন্যাকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গেছে।'

'এই ধরনের আবেদন পেশ করে লাভ কি ?'—নাম্প্যার জিজ্ঞাসা করেন, 'সুপারভাইসার এ সব সময় তদন্ত করতে কতদিন নেবে ঠিক আছে ? আর তাছাড়া সৈন্যরা যদি বলে যে শত্রুকে সাহায্য করেছিল বলেই তারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে, তখন আমাদের করণীয় কি হবে ঠিক করা আছে ?'

'চিরুতাকুট্টি তার পথ করে দেবে। সুপারভাইসারের কাছেই শুধু আবেদন পেশ করলে কাজ হবে না, তাকে ওসব ঘটনা জানাতে হবে।'

'কি, চিরুতা ? সে কি তোমার কথা রাখবে।'—বিস্ময়ের সঙ্গে নাম্প্যার জিজ্ঞাসা করেন।

'আমার কথা রাখবে কি না হলফ করে বলা শক্ত। তবে এটা

ঠিক যে, আমাদের কোনো কার্যসিদ্ধির জন্যে তার সাহায্য চাইলে সে পিছু হটবে না।'—আম্পু নায়ার কথাটা বলেই গম্ভীর হয়ে যান।

'আমি এর ভিতরের কোনো রহস্য জানতে চাই না, কিন্তু তবুও ভাবছি, অন্য লোকের মুখে শুনে কি চিরুতা এ সব কথা বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করানোর কোনো উপায় আছে?'

'যাতে বিশ্বাস করে তার জন্যে আমি একখানা চিঠি লিখে দেবো।'—বলেই আম্পু তালপাতা নিয়ে তাতে লিখলেন, 'যে কোনো ভাবে হোক উন্নিকে বাঁচাতেই হবে। অন্যান্য কথা এই পত্রবাহক বলবে।'—লিখেই তিনি চিঠিখানা নাম্প্যারের হাতে দেন।

'শেষের কাজটি আমি করব',—নাম্প্যার বলেন। আম্পু নায়ার আশ্বস্ত হন এবং রাজা সাহেবের কাজে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়ার অনুমতি চান। তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখে নাম্প্যার স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলেন, 'রাত্রি একটু গভীর হলে প্রয়োজনীয় লোক নিয়ে পালকি করে যাবে। পালকিতে কে আছে তা যাতে কেউ জানতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।' নির্দিষ্ট সময়ে আম্পু নায়ার ফোঁটাচন্দন কেটে পোশাক বদলে একজন বড় সামন্ত প্রভুর মতো পালকিতে চড়ে বিদায় নেন।

* * *

নিরাশ হয়ে সেই নায়ার এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সন্ধ্যা নাগাদ তলশেরীতে ফিরে আসে এবং তৎক্ষণাৎ তিনি দোভাষীর সঙ্গে দেখা করে তাকে সমস্ত কিছু জানান। জানানো হয় যে আম্পু ছুটে গিয়ে যে বাড়িতে ঢুকে পড়েন সেটা চন্দ্রোতদেরই। সেখান থেকে তাঁকে ধরা গেল না, কারণ তার আগেই তিনি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সেখান থেকেও পালিয়ে গেছেন। এসব কাজে তাঁকে যে মেয়েটি সাহায্য করেছিল তাকে ধরে আনা হয়েছে; সে এ সবের সাক্ষ্য দিতে পারবে। ইত্যাদি ইত্যাদি ··

'এসব কথা শুনে কর্নেল যে কি বলবেন ঠিক বুঝতে পারছি না। কারণ মহিলা এবং শিশুদের উপর উপদ্রব করাকে তিনি গুরুতর

অপরাধ বলে মনে করেন। যারা এ কাজ করে, তাদের প্রয়োজন হলে তিনি কড়া শাস্তি দিতেও ইতস্তত বোধ করেন না।'—দোভাষী বলে।

নায়ার খুবই বেকায়দায় পড়ে যান। তিনি শুনেছিলেন যে মেজাজ শান্ত থাকা অবস্থাতেও নির্দেশ লঙ্ঘনকারীকে কঠোর শাস্তি দিতে কর্নেল একটুও দ্বিধা বোধ করেন না। এবং এই যদি অবস্থা হয় তাহলে তিনি নিজে যা করেছেন তা তাঁর ভালো লাগার কথা নয়। শুধু তাই নয়, অত্যাচারী হিসাবে হয়তো তাঁকে শাস্তিও পেতে হবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি খুব মানসিক যন্ত্রণা বোধ করতে থাকেন। ঘাবড়ে গিয়ে তিনি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মহিলাটিকে তাহলে কি করা যায়?' জবাব পান,—'শত্রুকে সাহায্য করার অপরাধে সৈন্যদের পাহারায় না রেখে তাকে সুপারভাইসারের অধীন সিভিল জেলে পুরে দেওয়াই ভালো।' প্রস্তাবটি নায়ারের ভালো লাগল না। কারণ আগে থেকে তিনি ঠিক করে বসে ছিলেন যে, উন্নিকে বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা-পয়সা ঘরে আনবেন। তাই প্রথমে তিনি দোভাষীর উপদেশের বিরোধিতা করেন। কিন্তু যখন বুঝতে পারেন যে, কর্নেলের ক্রোধবহ্নিতে পড়লে তাঁর জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তখন বাধ্য হয়ে তিনি ঐ বন্দিনী মহিলাকে সিভিল কর্তাদের হাতে তুলে দিতে রাজী হন।

বলা বাহুল্য, পুকুরঘাট থেকে অপহরণ করে আনার সময় পথে উন্নিকে নানা ধরনের কষ্ট এবং অসম্মানজনক জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে। ক্ষেত পেরিয়ে কিছু দূর পর্যন্ত একজন সৈনিক জোর করে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আসে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যখন তারা দেখে যে কেউ তাদের পিছু নেয় নি, তখন তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে তারা হাঁটিয়ে আনতে থাকে। ক্লান্ত হয়ে একটু ধীরে হাঁটতে শুরু করলেই ঐ নায়ার তাকে পথে অশ্রাব্য গালিগালাজ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মনে কোনো রকমের প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় ঐ নিষ্ঠুর লোকটির রাগ আরো বেড়ে যায় এবং তিনি তাকে হঠাৎ দুই-তিনটি ঘুষিও মারেন।

কিন্তু উন্নি তাতে কাঁদে নি, অথবা অন্য কোনোভাবে নিজের দুঃখ প্রকাশের চেষ্টা করে নি। সত্যি কথা বলতে কি, দুঃখের কোনো অনুভূতিই তখন তার মধ্যে ছিল না। আম্পু নায়ারকে প্রথম যে দিন সে পথে দেখতে পায়, সেই দিন থেকে তার পবিত্র মানসপটে শুধু সেই বীর পুরুষেরই আলেখ্য উজ্জ্বলভাবে আঁকা আছে। দয়া এবং পৌরুষ-সমুজ্জ্বল-প্রতীক আম্পুর ছবির উজ্জ্বল উপস্থিতি আজো তার মনে অটুট। আম্পু চলে যাওয়ায় নিজের ভাইয়ের উপরে তার একদিন রাগ হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মন খুব আনন্দও পেল এই ভেবে যে, আম্পু এবং তার মধ্যে ভবিষ্যতে একটা সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। কাজেই নিজের মনের মানুষের জন্যে এই ধরনের যন্ত্রণা সহ্য করা তার পক্ষে কষ্টকর ছিল না। 'সে যাই হোক তিনি তো বেঁচে গেছেন, আমার কি হবে তার চিন্তা আমি নাই বা করলাম।' এই ছিল তার মনের কথা। তার দৃঢ় ধারণা ছিল, আম্পু নায়ার তাকে উদ্ধার করার জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা করবেন।

তলশেরীতে পৌঁছে ঐ নায়ার তাকে মিলিটারী কয়েদখানায় রেখে দোভাষীর সঙ্গে দেখা করতে যান। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, উন্নিকে নিজের কবলে কোনো গোপন জায়গায় রাখবেন। কিন্তু সৈন্যরা তাঁর এই মতলব কার্যকারী করতে রাজী হয় নি। অবশেষে উন্নিকে সিভিল জেলের কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ নিয়ে দোভাষী কয়েদখানার কাছে হাজির হলো।

আট

রাজা সাহেবের কুট্টিয়াড়ী পার হয়ে যাওয়ার খবর সারা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। শুধুমাত্র মাননঞ্চেরির ঘটনাতেই কেরলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। তার উপর রাজা সাহেবের এই ধৈর্যপূর্ণ উদ্যম দেখে জনতা আরো আশান্বিত হয়ে ওঠে। ওয়েলেসলির আগমনের পর দেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত ঘটনাবলীর ফলে জনসাধারণ ভয়ে আতঙ্কিত হয়েছিল। কিন্তু সদ্য-অনুষ্ঠিত এই দুটি ঘটনা নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় জনসাধারণের বিশ্বাস এবং মনোবল দৃঢ়তর করতে সাহায্য করে। যেন প্রমাণ হয়ে যায় যে টিপুজয়ী ওয়েলেসলিকেও রাজা সাহেব ভয় করেন না; এবং ইংরেজদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির ভয়ে নয়, বরং পালটা আঘাত তীব্রতর করে তোলার জন্যই তিনি বনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জনসাধারণ খুব উৎকণ্ঠিত থাকে পরবর্তী ঘটনা কি হবে জানার আগ্রহে।

শত্রুমিত্র সকলেরই জানা ছিল যে রাজা সাহেবের লোক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে স্বাধীনতার চেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে। কৈনেরীর আম্পু নায়ার এবং পয়য়ম পরিবারের চন্তু নায়ারও নিযুক্ত হয়েছিলেন এই কাজে। এ ছাড়া কিছু ধনী লোকও গোপনে গোপনে রাজা সাহেবকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল।

দেশের বেশির ভাগ ধনী মনে মনে রাজা সাহেবের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ইংরেজদের ভয়ে কিছু প্রকাশ করতো না। ইংরেজের সঙ্গে রাজা সাহেবের আগামী সংঘর্ষের সংবাদ শুনে তারা খুশীই

হলো। এ ছাড়া রাজা সাহেবকে সাহায্য করার মতো কিছু অন্য লোকও ছিল। উন্নিমুপ্পন নামে এক মুসলমান সর্দার টিপুর ছড়িয়ে-পড়া সৈনিকদের একত্র করে একটি ছোট সৈন্যদল তৈরি করেছিলেন। তিনি মুরিডাণ্ডেডীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বারে বারে আক্রমণ করে আস্তানা গাড়েন এবং ওয়েলেসলির ভয়ে রাজা সাহেবের দলে যোগ দেন। মাননঞ্চেরির উত্তন কুরুক্কলও কেরলবর্মার সঙ্গে আঁতাত করতে প্রস্তুত ছিলেন বলেও শোনা যায়।

কুটিয়াড়ী পার হওয়ার সময় রাজা সাহেবের সঙ্গে ছিল মাত্র দুশো জন নায়ার এবং দেড়শো জন ভিল। এত কম সৈন্য নিয়ে মনন্তনার ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর কাছে খবর এসেছিল যে উত্তরাঞ্চল থেকে ইংরেজ সৈনিকদের জন্য যে বিস্তর রসদ মনন্তনায় আসে, তা রক্ষার জন্য শুধু একশো সৈনিক পাহারায় নিযুক্ত থাকে। এই কারণেই তাঁরা এই ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হন।

রাজা সাহেবের এই অভিযানের কথা গুপ্তচরের মাধ্যমে সর্বপ্রথম তলশেরীতে পৌঁছে যায়। সাহায্যের জন্যে মেয়র হোম্‌স-এর নেতৃত্বে তিন দিনের মধ্যে এক সৈন্যদল আসছে—তলশেরী থেকে এক দূত এসে মনন্তনার সৈন্যদের নেতা ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে খবর দেয়। তখন পর্যন্ত স্টুয়ার্ট রাজা সাহেবের এই অভিযানের কোনো খবরই জানত না। বহু যুদ্ধজয়ী কর্নাটকীয় সৈন্যের একটি দল তখন সব রকমের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় বসে ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃৎকম্প উপস্থিত হলো। সে মনস্থ করল যে, হোম্‌স-এর নেতৃত্বে সৈন্যদলের আগমনের পরেই ঐক্যবদ্ধভাবে রাজা সাহেবকে মোকাবেলা করাই শ্রেয় হবে।

অবিলম্বে এসব কথা গুপ্তচর মারফত রাজা সাহেব জানতে পারেন। এই অবস্থায় তিনি উন্নিমুপ্পনকে নির্দেশ দেন যে, রসদবাহী লোকের উপর পথেই আক্রমণ করতে হবে। তারপর তিনি মনন্তনার দিকে

রওয়ানা হন। রণনিপুণ রাজার পরিকল্পনা ছিল মেয়র হোম্‌স-এর সৈন্যের আগমনের আগেই ওদের সৈন্যকে আক্রমণ করা।

প্রথমে তিনি পাহাড়ের উপরকার সরু পথ দিয়ে গোপনে ভিলদের মনত্তনায় পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং একটি গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, তিনি সৈন্য নিয়ে উন্নিমুপ্পনের সঙ্গে দেখা করতে মুরিডাণ্ডোড যাচ্ছেন। সাথে সাথে এও প্রচার করে দেওয়া হয় যে, যখন হোম্‌স-এর সৈন্য আসছে তখন মনত্তনায় আর হামলা করে কোনো লাভ হবে না। স্টুয়ার্টের গুপ্তচররা রাজার এই কথা এবং গতিবিধি লক্ষ্য করে। কাজেই তারা মনে করে যে, রাজা সাহেব ভিলদের পাহাড়ের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর সেনাদল ইংরেজ সৈন্যদের ভয়ে মনত্তনায় না এসে মুরিডাণ্ডোড চলে গেছে।

'সে যাই হোক, তবু দ্বিগুণ সৈন্যের পাহারার ব্যবস্থা করা দরকার। আমি অবশ্য গোড়াতেই জানতাম তারা আসবে না।'—স্টুয়ার্ট দূরদর্শীর মতো গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে বলে।

সেদিন রাত্রে বনে অথবা প্রান্তরে কোনো ঘটনা ঘটল না। ভোর রাতের অনেক আগেই চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে গেল কালো মেঘে। খাওয়া-দাওয়ার পর স্টুয়ার্ট তাদের দেশের অমৃত হুইস্‌কি পান করল এবং তার পরেই আছন্ন হয়ে পড়ল গভীর নিদ্রায়। প্রহরীরা তাদের আস্তানার চারদিকে সাবধানে টহল দিতে লাগল। কিন্তু সে রাত্রে কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটল না।

সকালে উঠে সৈন্যরা তাদের জীবনের দৈনন্দিন কাজে লিপ্ত হলো। যে স্টুয়ার্ট কর্তব্যনিষ্ঠাকে নিজের জীবনের আদর্শ বলে ঘোষণা করত সে তখন সবে তার দৈনন্দিন জীবনের প্রথম কাজটি শুরু করেছিল অর্থাৎ নিজের পালঙ্কে বসে চা পান করছিল।

হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে সে পালঙ্ক থেকে উঠে দাঁড়ায়। কোত্থেকে সৈন্যদের শিবিরে তীর এসে পড়ছে। সে লক্ষ্য করে, কয়েকজন প্রহরী ইতিমধ্যেই মারা গেছে। তার হাতের কাছে যে ভেরীটি

ছিল, সেটি তখন সে খুব জোরে বাজাতে লাগল। সকালে ঠিক এমনি সময়ে এই ধরনের আক্রমণে সৈন্যরা বিস্মিত হয় এবং শিবিরের চারদিকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। সবে তারা যখন প্রাতঃকৃত্য সেরে পুকুর ও বাগান থেকে ফিরছে, ঠিক সেই সময়ই এই গণ্ডগোল। অনবরত আসতে-থাকা তীর বিঁধে কয়েকজন তৎক্ষণাৎ মারা যায়। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের গায়েও তীর লাগে। নিজের জানুতে বিঁধে-যাওয়া সেই তীর সে উপড়ে ফেলে নিজের হাতে। সাথে সাথে ফিনকি দিয়ে রক্ত শিরশির করে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে থাকে।

হঠাৎ ভিলদের আক্রমণের তীব্রতা কমে গিয়ে অন্যদিক দিয়ে বন্দুকের গর্জন শোনা গেল। স্টুয়ার্ট বুঝতে পারল যে শত্রুরা সংগঠিত ভাবে প্রত্যক্ষ আক্রমণে নেমেছে এবং এখন তার নিজের সৈন্যদের অস্ত্রধারণ করিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোরও অবকাশ নেই। তা-ছাড়া শিবিরের সৈন্যরাও ছিল অপ্রস্তুত। সমস্ত দিক চিন্তা করে সে এই সিদ্ধান্তে এলো যে, আক্রমণকারী শত্রুব মুখোমুখি মোকাবিলা করা মনত্তনার ইংরেজ সৈনিকদের সামর্থ্যের বাইরে।

ক্ষতস্থান থেকে অঝোরে রক্ত ঝরার ফলে বিদেশী সেনাপতিটির ক্লান্তি প্রতি মুহূর্তে বাড়তে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজের সৈনিকদের হুকুম দিয়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে তার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না—সেখানেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। নিজেদের সেনাপতিকে টলতে দেখে সৈন্যরা আরো ঘাবড়ে যায় এবং তাদের মধ্যেও কিছু লোক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করে। কিন্তু পলায়নকারী সৈন্যরা একে একে ভিলদের অব্যর্থ তীরের শিকার হতে লাগল, আর যে সব সৈনিক প্রতিরোধ করার জন্য অগ্রসর হলো সামনের দিকে, তাদের বুকে এসে বিঁধতে লাগল বন্দুকের গুলি। ইতিমধ্যে রাজা সাহেবের নেতৃত্বে তাঁর বন্দুকধারী সৈন্যরা শিবির-সন্নিকটে এসে পড়ল।

গোড়ার দিকে অনেক ইংরেজ সৈনিক ধৈর্য ধরে লড়লেও শেষের দিকে নেতৃত্বের দুর্বলতার ফলে তাদের অনেকেই লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে এদিক ওদিক ছুটে পালাতে শুরু করে। কিন্তু অবিলম্বে রাজার সৈন্যরা তাদের ঘিরে ফেলে। শত্রুবেষ্টিত হয়েও সেই ইংরেজ সৈনিকরা জানের পরোয়া না করে লড়াই করতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের নিরুপায় হয়ে হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে পরাজয় বরণ করতে হয়।

সূর্যোদয় হয়েছে অনেক আগে। রাজা সাহেব আহত স্টুয়ার্টকে প্রাথমিক শুশ্রূষা করার নির্দেশ দিলেন এবং মৃত সৈনিকদের কবর দেওয়া বা পুড়িয়ে ফেলার জন্য লোক নিযুক্ত করলেন। তাছাড়া এদিক ওদিক পলাতকদের খুঁজে বের করে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বন্দী করতে একটি ছোট সৈন্যদলও নিয়োগ করলেন।

মনত্তনার জয়ের ফলে পাঁচশো বন্দুক ও তার উপকরণ, সৈন্যদের জন্য মজুত রসদ এবং তিন হাজার টাকা রাজা সাহেবের হস্তগত হলো। তিনি বিশেষ করে ইংরেজ সৈন্যদের পোশাক এবং পাগড়ি খুব যত্নের সঙ্গে রাখার নির্দেশ দিলেন। দুপুরের আগেই মনত্তনায় এমন শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে এলো যে, দেখে মনেই হয় না, কয়েক ঘণ্টা আগে সেখানে লড়াই হয়েছে। রাজা সাহেব স্নান করে সেখানকার মন্দিরে গিয়ে দেবীর পূজা করলেন। তারপর শান্তিপূর্ণ দেশের রাজার মতো প্রসন্ন চিত্তে তিনি রাজকার্যের জন্য একটি পিপ্পল বৃক্ষের নিম্নস্থ বেদীতে সাময়িকভাবে নির্মিত রাজাসনে গিয়ে বসলেন।

ইংরেজ পক্ষের কয়েকজন সৈন্যকে বন্দী করে রাজা সাহেবের সামনে হাজির করা হলো। তারা মহীশূরের বাসিন্দা, কাজেই রাজা স্বয়ং তাদের সঙ্গে কানাড়ী ভাষায় প্রশ্ন করে ইংরেজদের গোপন খবর জানার চেষ্টা করলেন। তাদের কাছ থেকে প্রসঙ্গত জানা গেল যে, বিদেশী কোম্পানীর লোকের উপর তাদের কোনো আনুগত্য নেই, নিছক টাকার জন্য তারা ইংরেজদের সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। টাকা

দিলে রাজার সৈন্যদলেও তারা যোগ দিতে প্রস্তুত কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে সৈনিকরা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করল। তার পর তাদের নেতা তাদের সকলের সম্মতি জানাল। রাজা সাহেব তাদের সবাইকে সাদরে গ্রহণ করলেন। কালক্রমে ঐ মহীশূরী সৈন্যরা রাজার বিশ্বস্ত সৈনিকে পরিণত হয়।

দেশের কয়েকজন প্রভাবশালী লোকও রাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁরা অনেক দিন ধরে তাঁকে সাহায্য করছেন, কাজেই তাঁদের সবাইকে পুরস্কৃত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফসল, রাজস্ব, দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা প্রভৃতি সম্পর্কে রাজা সাহেব তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। 'ভগবানের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলে তিনি সবাইকে বিদায় দেন।

তারপর ভিলদের সর্দার তলক্কল চন্তুকে ডেকে পাঠানো হয়। জনশ্রুতি আছে, রামচন্দ্র এবং গুহকের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, রাজা সাহেব এবং চন্তুর মধ্যে ছিল সেই সম্পর্ক। চন্তু এক নীচ জাতির ছেলে। তার মধ্যে আত্মম্ভরিতা বা দাম্ভিকতা ছিল না। রাজা সাহেবের মতে তার মতো প্রত্যুৎপন্নমতি ও দক্ষ মানুষ কেরলে আর নেই। তাই যে কোন বিপদে চন্তুর সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি কোনো কিছু করতেন না। তাঁর দৃঢ় ধারণা, সব রকম বিপদ-আপদের ঝুঁকি নিয়ে যে কোনো সময় রাজা সাহেবের সাহায্য করাই চন্তুর জীবনের লক্ষ্য। ভিলদের কাছে সে শুধু নেতাই নয়, আরাধ্য দেবতাও। তার মুখের কথা তাদের কাছে ছিল যেন ধর্মের এক অলঙ্ঘনীয় বিধান। রাজা সাহেব বলতেন, 'নায়াররা সবাই আমাকে ছেড়ে গেলেও শুধু এই ভিলরা আমার সঙ্গে থাকলেই আমি ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে পারব।'

চন্তু এসে অদূরে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

'চন্তুর সাহায্যের ফলেই আজকের এই বিজয় সম্ভব হয়েছে। এখন, আমাদের আগামী দিনের কর্মসূচী কি হবে?'

'অধীন আর এমন কী সাহায্য করেছে?' চন্তু বলে, 'আপনার দক্ষতার ফলেই তো এই বিজয়। শুধু চন্তু আর এই ভিলদের দিয়ে এমন কী হতে পারে?'

'যাই হোক, আমাদের নিজেদের মধ্যে ধন্যবাদ আদান-প্রদানের প্রয়োজন নেই। এখন, আগামী দিনের কর্মসূচী কী হবে তাই ঠিক করা যাক। অন্য কোনো খবর এসেছে?' রাজা সাহেব জিজ্ঞাসা করেন।

রাজার অনেক গুপ্তচর ছিল ভিল। যেখানে খুশি সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে তারা ছিল নির্বাধ। সুতরাং রাজা সাহেবের পক্ষে যে কোনো জরুরী খবর পাওয়া আদৌ কষ্টকর ছিল না।

'শত্রুপক্ষের একটি সৈন্যদল এদিকে আসছে।' চন্তু বলে, 'তারা এখন কুত্তুপরম্প থেকে বেরুবে। এর সাথে আরো একটি খবর আছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী হবে তা অধীন জানে না।'

রাজা সাহেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আজ খবর পেয়েছি পথেই শত্রুদের সেই সৈন্যবাহিনীকে মোকাবিলা করতে কৈনেরীর আম্পুবাবু লোক ঠিক করেছেন। একশো জন ভিলকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যেও তিনি খবর পাঠিয়েছেন।'

'জানি না আম্পু আবার কি বিপদ টেনে আনবে।' রাজা সাহেব কিছুটা চিন্তিত হয়ে বলেন, 'তলশেরী থেকে আসতে-থাকা শত্রুসৈন্য একেবারে নগণ্য নয়। শুনেছি তাদের সঙ্গে দু'তিনটে কামানও আছে। আম্পু তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লে ক্ষতি হবে আমাদের। অবিলম্বে তাকে ফিরে আসতে বলতে হবে।'

রাজা সাহেব আবার বলেন, 'চন্তু, তাড়াতাড়ি তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আজ আমরা এখানে যা কিছু পেয়েছি, সে সব পুরলী পাহাড়ে নিয়ে যেতে হবে। এখানে রাখা ঠিক হবে না। এই কাজে এখনই তুমি কয়েকজন ভিলকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও।

এড়চ্চেন কুংকনকে ব'লো, সে যেন এ সব ভাঁড়ার ঘরে ভালোভাবে রেখে দেয়।'

'রাজার পুরলী পাহাড়ে ফিরবার আগেই অধীনের অন্য কোথাও যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'আমার ধারণা, মেজর হোম্‌সের সঙ্গে পথেই মোকাবিলা করা ভালো। কাল সকালের দিকে যদি আমরা তা করতে পারি, তবে সন্ধ্যার দিকে কন্নবত পৌঁছে যাব। তারপর আম্পুর বক্তব্য শোনা যাবে। চারদিনের মধ্যে আমি অবশ্যই পুরলী পাহাড়ে ফিরব।'

রাজা সাহেবের নির্দেশ অনুসারে চন্তু সেখান থেকে রওনা হয়ে যায়। প্রত্যেকদিন রাত্রে ঘণ্টা দুয়েক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান না হলে রাজা সাহেবের মন তৃপ্ত হতো না। যুদ্ধশেষের অবকাশমুহূর্তে নিজের সহগামীদের দিয়ে তিনি নাটক করাতেন এবং তার মাধ্যমে 'কথাকলি'র স্বাদ মেটাতেন।

রাজা সাহেবের নাট্য সঙ্ঘের পরিচালক ছিলেন তাঁরই এক সেনাপতি। তাঁর সঙ্গে তিনি পরামর্শ করলেন, ঐ দিন কোন্ কাহিনী পরিবেশন করা যায়। মুখ্য ব্যক্তিরাও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলেন। কয়েক জনের মতে স্বয়ং রাজা সাহেবের রচিত 'কালিকেয় বধ' কাহিনীই বর্তমান অবকাশমুহূর্তের সবচেয়ে উপযোগী। কিন্তু রাজা সাহেব বললেন, 'তিরুবিতাঙ্কুরের যুবরাজ বিরচিত 'পুতনামোক্ষ' হোক।' শেষ পর্যন্ত নাট্য সঙ্ঘের পরিচালকের কথাই রইল, তিনি বললেন, 'দক্ষিণ দেশে প্রচলিত একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত একখানি নাটক আমাদের এই সঙ্ঘের অভিনেতারা মহলা দিয়ে রেখেছেন। 'নলচরিত' নামে এই নাটকখানি চারটি অংশে বিভক্ত। তৃতীয় অংশটি বেশ চিত্তাকর্ষক। আজ সেটিরই অভিনয় হোক।'

রাজা সাহেব বললেন, 'আমিও সে রচনা পড়েছি। তিরুবনন্তপুরমের রাজা আমার নামে একখানা সেই বই পাঠিয়েছিলেন।

রচনাটি প্রথম শ্রেণীর কাব্য। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তা সফল হবে কিনা সন্দেহ আছে। তবু ওটাই হোক।'

যুদ্ধক্ষেত্রকেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র করে তোলা রাজা সাহেবের এক বিশেষ গুণ। তাঁর সেনাপতিরা তাঁর এই কাজে আশ্চর্য হন না। কেন না, অনেক দিন ধরেই তাঁরা রাজা সাহেবের স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত। সারা কেরলে প্রসিদ্ধি ছিল যে, জয়ভেরীর পর রাজার নাট্যানুষ্ঠানের বাজনা শোনা যায়। তিনি বলতেন, 'বাজনা শুনে শত্রুরা জানুক আমি কোথায় আছি। তারা যেন এটা না মনে করে যে আমি তাদের ভয়ে লুকিয়ে আছি।'

রাজকার্য এবং নাট্যানুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও রাজা সাহেব আহত স্টুয়ার্টকে ভোলেন নি। ইতিপূর্বেই তিনি তাকে বন্দিশালায় রাখার জন্য উন্নিমুপ্পনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

নয়

ছোটরানী মাক্কম অনুভব করেন, তাঁর দাম্পত্য জীবনের আনন্দ-মুখর দিন শেষ হয়েছে। তা সত্ত্বেও স্বামীর নতুন কি বিপদ-আপদ ঘটে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে উদ্বিগ্নতা তাঁর প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যায়। উনি কোথায় আছেন, কি করছেন, শত্রুরা কি ভাবে তাঁকে উত্যক্ত করছে ইত্যাদি চিন্তা-ভাবনা অহরহ তাঁর মন তোলপাড় করে তোলে। ফলে, মাক্কমের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করতে থাকে অসীম দুঃখময় দিনগুলি। স্বামীর জয়ের উপর যে দেশের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে এ কথা জানা সত্ত্বেও মন যেন তাঁর কেমন করত্।

মাক্কম তাঁর মনের এই সকরুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ভাবেই প্রকাশ করতেন না। কিন্তু উন্নিআম্মার ব্যবহার তাঁর জীবনকে অসহ্য করে তোলে। মাক্কমের পয়শী থেকে ফিরে আসার পর হতে তাঁর প্রতি উন্নিআম্মার বিদ্বেষ বাড়তে থাকে। সময়ে অসময়ে তিনি তাঁর বাঁকা কথার আঘাতে মাক্কমের মনের ক্ষতকে আরো বাড়িয়ে দেন। এই ধরনের কথা প্রয়োগে তিনি ছিলেন পটীয়সী। মাক্কমের কোনো অপরাধ থাক বা না থাক, কারণে-অকারণে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করা কথা উন্নিআম্মার মুখ দিয়ে স্বাভাবিক গতিতেই বেরিয়ে আসে। মাক্কমরানী ঘরের কাজকর্ম করতে গেলে, খুঁত ধরে বলেন, 'সেজে-গুজে পুতুলের মতো বসে থাকা ছাড়া ছোটরানী কি কোনো কাজ করতে পারে? দেখি কতদিন এই ঠাট বজায় থাকে।' দিদির

গালাগাল শুনেও না শুনে মাক্কম ফিরে গেলে উন্নিআম্মা তৎক্ষণাৎ আবার বলে ওঠেন, 'তার হাত তো আর সাধারণ মানুষের হাত নয়? ওগুলো যে এক-একটা ননীর পুতুলের হাত, কাজ করতে গেলে গলে যাবে যে! এভাবে আর কতদিন কাটবে?' মাক্কমরানী পরিচ্ছন্ন পোশাক পরলেও তিনি কটাক্ষ করেন, 'দেখ না কি ভাবে পতিতার মতো সেজেছে। যেন কার প্রতীক্ষায় বসে আছে। চুলোয় যাক। যার যা ইচ্ছে সে তাই করুক। এ বংশের মুখে চুনকালি না পড়ে শুধু এইটুকু দেখার জন্যই আমার এত মাথা ঘামানো।'

বড় বোনের এই ধরনের গালাগালিতে মাক্কম খুব দুঃখ পেলেও প্রত্যুত্তরে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। সম্প্রতি দিদি আরো ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলতে শুরু করেছে। প্রথম প্রথম রাজা সাহেব উন্নিআম্মার কাছ থেকে দেবতার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা পেতেন। কিন্তু আজকাল উন্নিআম্মা রাজা সাহেবকেও কথা না শুনিয়ে ছাড়েন না।

প্রথম প্রথম মাক্কম বিনীতভাবে এই ধরনের কথাবার্তায় ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে বলতেন, 'উনি কি দোষ করেছেন? এই ধরনের কথাবার্তা কেন বলো? কেউ শুনলে, আমাদের সকলেরই যে অপমান।'

'তুমি জিজ্ঞাসা করছ তোমার 'উনি' কি দোষ করেছেন? বাইরের যে শোনার শুনুক, আমার তাতে বয়ে গেল। বেশ করব বলব। খেয়ে ফেলবে নাকি? দেখা যাবে তোমাদের মাতব্বরীর দৌড়।'

নাম জপ করার মতো এই ধরনের কথা অনর্গল বলে যাওয়া উন্নিআম্মার অভ্যাস। রাজা সাহেবের সম্পর্কে উন্নিআম্মার ঐ ধরনের মন্তব্যের সময় কানে আঙুল দিয়ে মাক্কমের সেখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

তাঁর নিজের প্রতি যাই হোক না কেন রাজা সাহেবের সম্পর্কে এই সব কথা উচ্চারণ করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে—মাক্কম তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না।

দু সপ্তাহ ধরে কাম্মু কৈনেরীতে আছে। সে আখড়ায় শেখানো শুরু করার পর থেকে কৈনেরী-বাড়িতে ছোটখাটো পরিবর্তন আরম্ভ হয়। যাদের অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নি তারা ঢাল তলোয়ার নিয়ে আবার অভ্যাস করতে শুরু করে। তাদের নতুন নতুন কৌশল শেখানোর ব্যাপারে কাম্মু ঐকান্তিক চিত্তে লেগে থাকে। বিশ-পঁচিশ জন যুবক সব সময় ঐ আখড়ায় অনুশীলন করার ফলে ধীরে ধীরে সেখানে একটা জীবন স্পন্দন দেখা দিতে শুরু করে।

উত্তর দিকের বাড়ির ইক্কাট্টান নায়ারের কাছে এ সব ভালো লাগে না। বয়স্ক পুরুষ মানুষ বলতে কৈনেরী-বাড়িতে কেউ নেই। সুতরাং এই অবস্থায় তাঁর অনুমতি না নিয়ে এই ধরনের কাজকর্ম করা অনুচিত বলেই তিনি মনে করেন। দু-তিন বার লোক পাঠিয়ে তিনি মাক্কম এবং উন্নিআম্মাকে তাঁর নিজের মত জানিয়েও দেন। অপর দিকে, নিজেদের পারিবারিক ব্যাপারে উত্তর-বাড়ির লোকদের নাক গলানো দুই বোনের কেউই পছন্দ করেন না। এ ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন একমত। সুতরাং উন্নিআম্মা বলে পাঠান, 'এই বাড়ির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য পুরুষ মানুষ আছে। তাদের নির্দেশেই এখানে সব কিছু হচ্ছে।' উন্নিআম্মার এই জবাব শুনে ইক্কাট্টান নায়ার জবরদস্তি করে তাদের নিজের মনের মতন চালাবেন ঠিক করলেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শুরু করার আগেই তিনি তলশেরী থেকে সবেমাত্র আনা একটি বোতল খুলে টেনে নিলেন। হয়তো তার ভিতরকার পদার্থের তেজ ছিল কম। তাই উন্নিআম্মার কাটা কাটা কথার কোনো সমুচিত উত্তর না দিয়ে ইক্কাট্টান বুঁদ হয়ে বসে রইলেন।

আখড়ায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে মাক্কম অংশ গ্রহণ না করলেও নীলুকুট্টিকে অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার ভার তিনি কাম্মুর উপর দিলেন। আখড়ায় যুবকদের সঙ্গে একসাথে ঐ তরুণীকে শিক্ষা দেওয়া অনুচিত হবে ভেবে, প্রত্যেক দিন সকালে এবং সন্ধ্যায় কাম্মু

তাকে প্রাসাদের সামনে অস্ত্রশিক্ষা দিত। ঐ সময় মাক্কমও বারান্দায় বসে দেখতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি নিজের বন্দুক নিয়েও অনুশীলন করতেন।

মনত্তনার লড়াইয়ের দিন সকালেই ইংরেজ সৈন্যের উপর রাজা সাহেবের সেনাদলের আক্রমণের খবর ছড়িয়ে পড়ল। সকালে স্নানান্তে দেবী-আরাধনার পর মাক্কমরানী বাড়ির ত্রিসীমায় ঢুকতে না ঢুকতেই কাম্মু তাঁকে খবরটা জানাল। রাজা সাহেব নিজেই সৈন্য পরিচালনা করছেন শুনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'শ্রীপোর্কলী দেবী তাঁকে সাহায্য করুন।' অল্প বয়সেই যাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ, সেই রাজা সাহেবের এই যুদ্ধ পরিচালনার সংবাদ মাক্কম দেবীকে একটুও ভীত সন্ত্রস্ত বা উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারল না। তিনি জানতেন যে, যতদিন না দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে পারছেন, ততদিন রাজা নিজেই প্রয়োজন হলে জীবনপণ করেও প্রত্যেকটি যুদ্ধ পরিচালনা করবেন।

'আর কোনো খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিও।'—এই কথা বলে মাক্কমদেবী ভিতরে চলে গেলেন।

সন্ধ্যা হয়ে গেল, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের আর কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে লোক পাঠিয়ে কাম্মু আশপাশের গাঁ থেকে খবর নিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই জানা যায় নি। ফলে মাক্কম উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

'উনি কি কোনো বিপদে পড়েছেন? যুদ্ধে হেরে যান নি তো?' এই ধরনের চিন্তা তাঁর মনকে ব্যাকুল করে তোলে। কিন্তু উন্নিআম্মা খুব খুশী হন, বলেন, 'তোর রাজা সাহেবের কিছু হয়তো হয়েছে। এত গর্বের পরিণতি এই রকমই হয়।'

সেদিন রাত্রিটা মাক্কমের অভুক্ত অবস্থায় কাটল। অসহ্য মাথা ব্যাথার ভান করে তিনি ঘরে ঢুকে দরজা দিলেন। কিন্তু উদ্বিগ্ন মনে কি ঘুম আসে? অনেক চেষ্টা করেও তিনি মন থেকে রাজার

বিপদের আশঙ্কা দূর করতে পারলেন না। চোখ বুঝলেই যেন দেখতে পান যুদ্ধরত রাজার বীরোচিত মূর্তি। পাশ ফিরে ঘুমনোর চেষ্টা করেও তাঁকে ব্যর্থ হতে হলো।

নিঃশব্দ মধ্যরাত্রি। হঠাৎ উন্নিআম্মার ঘরের দরজা খোলার শব্দ যেন অন্ধকার নিস্তব্ধতার বুক চিরে ফেলল এবং ক্ষণকাল পরেই পয়য়ম-বাড়ির চন্তু নায়ারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

চন্তু নায়ারের কণ্ঠস্বর এবং কথাবার্তার ধরন কেমন যেন সন্দেহ-জনক ঠেকল মাক্কমের কাছে। তাঁর বিচিত্র হাসি আর অদ্ভুত আবেগপূর্ণ কথায় মাক্কম অনুমান করলেন যে, চন্তু নেশায় বিভোর হয়ে আছেন। কখনো নিম্নস্বরে কখনো বা উচ্চকণ্ঠে তাঁর অসংলগ্ন কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। যখনই তিনি জোরে কথা বলতে থাকেন, উন্নিআম্মা তাঁকে সাবধান করে দেন, 'আস্তে কথা বলো, ডাইনিটা শুনে ফেলবে।' মাঝে মাঝে এই কথাগুলি মাক্কমের কানে আসছিল।

স্বামী-স্ত্রীর কথা আড়িপেতে শোনা তাঁর ইচ্ছে নয়। কিন্তু বার বার রাজা সাহেবের নাম শুনতে পেয়ে তিনি কান পাতলেন। মাঝে মাঝে আবেগে বা নেশার ঘোরে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকায় অল্পক্ষণের মধ্যেই মাক্কমদেবী চন্তু নায়ারের কথার সারমর্ম বুঝতে পারলেন।

'ওর প্রতিষ্ঠা এবং অহংকার এবার আমি দেখব। ও আবার মহাদেবী! আমাকে একেবারে দাসীর মতো দেখা হয়। আমিও এবার দেখাব, আমি কে।' উন্নিআম্মার ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যায়।

'এই চন্তু যদি পুরুষ মানুষ হয় তাহলে দু-তিন দিনের মধ্যেই দেখিয়ে দেবে, কি অসাধ্য সাধন সে করতে পারে। তখন বুঝা যাবে প্রতিষ্ঠা কার আছে। তখন আর আমাদের পরের মুখ চেয়ে বসে থাকার দরকার হবে না।'

এই ভাবে তখনকার মতো তাদের আকাশকুসুম রচনা সমাপ্ত হয়।

মাক্কম কান পেতে শুনছিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্তু নায়ার গাঢ় নিদ্রায় নাক ডাকতে শুরু করলেন এবং উন্নিআম্মাও নিজের ভাবী

পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করতে করতে নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নিলেন।

মাক্কমদেবী কিন্তু ঘুমতে পারলেন না। এমনিতেই তাঁর মন ছিল ব্যগ্র। তার উপর চন্তুর কথাবার্তা শোনবার পর ঘুমতে গেলেই কেমন যেন তাঁর ভয় করতে লাগল এবং সব সময়ের জন্য জেগে থাকার এক দারুণ ইচ্ছা তাঁর মনকে পেয়ে বসল। চন্তুর এই চক্রান্তকে ফাঁস করার জন্যে অবিলম্বে কি করণীয় সে সম্পর্কে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। মাক্কম ঠিক করেছিলেন, বিনিদ্র অবস্থায় কোনোভাবে রাতটা কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু অসহ্য এক অব্যক্ত যাতনায় তিনি আর বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারলেন না। আস্তে আস্তে দরজা খুলে দালানে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ঘুমন্ত কাম্মুকে জাগিয়ে তুলে বললেন, 'ভোরের অনেক আগেই আমাকে এখান থেকে রওনা হতে হবে, তার জন্যে একটি পালকি এবং সাত আট জন অনুচর চাই। কেউ যাতে টের না পায়, সেই ভাবে তোমাকে এসবের ব্যবস্থা করতে হবে।'

প্রভুপত্নীর নির্দেশ পালন করা তার অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করে কাম্মু। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে আখড়ায় গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গোপনে ডাক দিয়ে জড়ো করল। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল যে ভোর হতে তখনো অনেক দেরি। কোনো রকম অসুবিধায় না পড়েই কাম্মু যাত্রার সমস্ত আয়োজন ঠিক করে ফেলল। আখড়ার শিক্ষার্থী যুবকরা ছিল সেই দেশেরই বাসিন্দা। সুতরাং সেই গাঢ় অন্ধকারে তারাই গিয়ে পালকিবাহককে গোপনে ডেকে আনল। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার বেশ কিছুক্ষণ আগে কাম্মু এবং আর ছয় জন নায়ারকে সঙ্গে নিয়ে মাক্কমদেবী রওনা হলেন।

মাক্কমদেবীর নির্দেশ ছিল সকালের আগেই কারেট্রাম পৌঁছানোর। কাম্মু অথবা অন্য কেউ জানে না কোন্ উদ্দেশ্যে তাঁর এই যাত্রা।

পয়য়ম-পরিবারের চন্তুও সূর্যোদয়ের আগেই উন্নিআম্মার ঘর থেকে

বেরিয়ে রওনা দেন। সকালেই কুত্তুপরম্পে গিয়ে পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য সবার দৃষ্টি এড়িয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি।

স্বামীর চলে যাওয়ার পর উন্নিআম্মার শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছিল বলে তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়েন।

সকালের নিত্যকর্ম সেরে প্রাসাদে ঢুকে উন্নিআম্মা জানতে পারলেন, মাক্কমদেবী বাড়িতে নেই। দাসীর কাছ থেকে খবর নিয়ে আরো জানলেন যে, আখড়ার গুরু কাম্মুরও কোনো পাত্তা নেই।

'ইস, কী লজ্জা আর অপমানের কথা! আগে কে ভাবতে পেরেছিল যে এ বাড়িতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটবে। তার মনে মনে এত নোংরামিও ছিল। সবার চোখে ধুলো দিয়ে শেষে কিনা সে এক পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গেল। এতখানি বুকের পাটা হয়েছে তার।'

মাক্কম সম্পর্কে জঘন্য কুৎসা-কল্পনাকেও বিশ্বাস করার জন্য উন্নিআম্মার মন প্রস্তুত ছিল। কাম্মুর কৈনেরী-বাড়িতে আসার পর থেকে তার সঙ্গে মাক্কমের নাম জুড়ে মাঝে মাঝে তিনি কোনো-না-কোনো কুৎসার কথা দাসীদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন। বাড়ির সবাই মাক্কমকে ভালোবাসত। তাই উন্নিআম্মার কথা দাগ কাটতো না কারো মনে। কিন্তু তারাও যেন আজ মাক্কমের এই ধরনের হঠাৎ নিরুদ্দেশের জন্য সন্দেহ পোষণ না করে পারল না। তাঁর সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধার ভিত যেন টলে উঠল।

আখড়ার যুবকের সঙ্গে ছোটরানী মাক্কমের অন্তর্ধানের খবর বিদ্যুৎগতিতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি শুনে উত্তর-বাড়ির লোকেরা খুব খুশী হয়। ব্যাপারটা ভালো করে জানার জন্য ইক্কাট্টান নায়ার এসে উপস্থিত হন কৈনেরী-বাড়িতে।

'স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা দিলে এই পরিণামই হয়।' তিনি বলেন, 'ঘরবাড়িতে পুরুষ মানুষ না থাকলে মানসম্মান এই ভাবেই

খোয়াতে হয়। আম্পুর আর কি দোষ, সে তো রাজা সাহেব বলতে পাগল। ঘরের মেয়েরা বেয়াড়া হলে কে কি করতে পারে।'

'আমি মাক্কমকে কত বলেছি।' ভিতরে দাঁড়িয়ে উন্নিআম্মা বলেন, 'কিন্তু সে যে ছোটরানী। বড় বোন হলেও বা আমার কথায় কান দেবে কেন। কি লজ্জার কথা, মান ইজ্জত সব গেল!'

উন্নিআম্মা এবং ইক্কাট্টান নায়ারের মধ্যে এই কথোপকথনের পর পরস্পরের সম্পর্কে একটি ভালো ধারনা তাঁদের উভয়ের মনেই দানা বাঁধে। ইক্কাট্টান বলেন, 'এই ঘটনার জন্যে রাজা সাহেব এবং আম্পুর কাণ্ডজ্ঞানহীনতাই দায়ী।' উন্নিআম্মাও এই কথায় সায় দেন এবং ইক্কাট্টান খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে যান।

তাঁদের মধ্যে যখন এই সব পারিবারিক কথাবার্তা চলছিল, ঠিক সেই সময় মাক্কম এবং তাঁর অনুচরেরা কারেট্টাম ছাড়িয়ে গেলেন। তারপরই নির্জন অরণ্য পথ। আগে সেখানে লোকবসতি ছিল, কিন্তু হায়দারের আক্রমণের পর যে যার পোঁটলা-পুঁটলি গুটিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। মাঠ সব আগাছায় ভরে গেছে। এখনো এদিকে সেদিকে পোড়োবাড়ি পাতকুয়া পুকুর প্রভৃতি চোখে পড়ে, আর এসব দেখে বুঝা যায় যে, এককালে লোকজন বসবাস করত সে অঞ্চলে।

টিপুর সময় সেখানে হলো ডাকাতদের আড্ডা। আর সেই জন্যেই সমগ্র এলাকাটি একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ে। তাঁর মৃত্যুর পরেও গ্রামাঞ্চলে রাজশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ডাকাতী এবং অত্যাচার বেড়ে যায়।

নির্জন সেই অরণ্যের মধ্যে ঐ সব দস্যুদের অনেকেরই আছে আস্তানা। তাদের সর্দার কুজ্জানী মোয়দিনের নাম শুনলে ছেলেবুড়ো সকলের বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। তাই পারতপক্ষে কেউ সে পথ মাড়ায় না।

ঐ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কথা জানতে পেরে পালকি-বাহকরা কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যায়। নিজেদের প্রাণের

ভয়ের কথা বাদ দিলেও মাক্কমদেবীর সুরক্ষার কথা চিন্তা করে তারা ঐ ভয়াবহ অরণ্যপথে যেতে গররাজী হয়। কুজ্জানী মোয়দিনের হাতে আছে দেড়শো লোক। আর শুধু কি তাই, অস্ত্রও আছে প্রচুর। এমতাবস্থায় হঠাৎ তাদের খপ্পরে পড়লে বাঁচার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কাম্মু তাদের এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারল না। পালকির ভেতরে বসেই মাক্কমদেবী জবাব দিলেন, 'মোয়দিন কি রাজা সাহেবের লোককেও জ্বালাবে? তা করলে সে আর কতদিন এ জঙ্গলে থাকতে পারবে? তোমাদের মধ্যে কেউ একজন গিয়ে জানিয়ে দাও যে আমি এই পথ ধরে যাচ্ছি। আমার মনে হয়, সে এই খবর পেলে আমাদের সাহায্য করতেই প্রস্তুত হবে।'

বনের মধ্যে পালকি থামিয়ে কাম্মু নিজেই মোয়দিনের আস্তানার সন্ধানে বেরোয়। তার যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই কয়েকজন অস্ত্রধারীকে এদিকে আসতে দেখা যায়। সবার আগে উন্মুক্ত তরবারি হাতে এক প্রকাণ্ড দেহধারী মানুষ। তার গোঁফ, দাড়ি, রক্তবর্ণ চোখ আর মাথার টুপি দেখে মাক্কম অনুমান করেন যে, লোকটা মুসলমানই হবে এবং খুব সম্ভব, এ-ই সেই মোয়দিন! তৎক্ষণাৎ তিনি কোমরে বাঁধা বন্দুকের উপর হাত রাখেন।

দস্যুসর্দারের আকৃতি ও তীক্ষ্দৃষ্টি এবং তার সঙ্গী-সাথীদের দৃষ্টিকটু জংলী পোশাক দেখে মাক্কম কিছুটা ঘাবড়ে যান। তবু বুকে সাহস এনে তিনি ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে বন্দুক ঠিক করে নেন। পালকিবাহকরা বাঘ-দেখা হরিণের মতো প্রাণপণে ছুটে পালায়। শুধু দুজন অস্ত্র-বিদ্যার্থী নায়ার যুবক তাঁকে সাহায্য করতে উপস্থিত থাকে। কিন্তু তাদের মুখ চোখ দেখে মনে হয়, তারাও ভয় পেয়েছে।

পালকিবাহকদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন, নায়ার যুবকদের অবস্থা, এবং বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মাক্কমের ক্রোধ ও সাহস দেখে ডাকাত সর্দার হো হো করে হেসে ওঠে উপহাসের হাসি। ভয়ঙ্কর শয়তানের ভয় দেখানো

চীৎকারের মতো তার ঐ অট্টহাসি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় নিস্তব্ধ অরণ্যের দিকে দিকে। হঠাৎ তার মুখের সেই হাসি মিলিয়ে যায়। কোথা থেকে তার সামনে একের পর এক তীর এসে পড়তে থাকে তার থেকে এক পা মাত্র দূরে। তার ডান দিকে এবং বাঁ দিকেও ঠিক অতখানি দূরত্বে এসে পড়ে আরো তীর। মুসলমানটি দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে চারদিক তাকাতে থাকে। কিন্তু আশে পাশে কাউকে দেখতে পায় না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই উভয়পক্ষ বুঝতে পারে, তীর আসছে কোত্থেকে। এই ধরনের ঘটনার কথা মোয়দিন আগেই শুনেছে, সুতরাং অবিলম্বে সে এর অন্তর্নিহিত রহস্যটি ধরতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, পিছনের দিকে না পালিয়ে এগোতে গেলেই তীর এসে বিঁধবে।

মাক্কমদেবী বুঝতে পারেন, তীর আসছে ভিলদের কাছ থেকে। তিনি মনে মনে বললেন, ভিলরা এখানে যদি আমাদের সাহায্য করতেই এসে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা এসেছে রাজা সাহেবের নির্দেশে। তাঁর নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা দেখে বিস্মিত হন মাক্কম।

তীর যে আসছে ভিলদের কাছ থেকে, সে ব্যাপারে মোয়দিনেরও কোনো সন্দেহ ছিল না। সে জানত যে, তার ঐ নির্জন জঙ্গলের বাসস্থানে তাকে প্রচণ্ড আঘাত করার শক্তি একমাত্র ভিলদেরই আছে এবং এখন তারা এসব করছে রাজা সাহেবের নির্দেশেই। কাজেই তীরন্দাজরা ঐ মহিলার পক্ষের লোক ভেবে নিমেষে সে পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করে নেয় এবং ইশারায় তার অনুচরদের ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়।

তারপর মোয়দিন সামনের মাটিতে গেঁথে যাওয়া শর উপড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো। সে লক্ষ্য করল তার দিকে আর তীর বর্ষিত হচ্ছে না। সসম্মানে মাক্কমকে অভিবাদন জানিয়ে সে বলল, 'এই অধীনের বাসস্থানে রাজা সাহেবের লোকের যাতে কোনো

অসুবিধা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা মোয়দিনের কর্তব্য। মোয়দিন রাজারই লোক, সুতরাং এখানে বিশ্রাম করে গেলে হতো না?'

মাক্কমের অনুচরদের মধ্যে একজন বলল, 'ছোটরানী একটা জরুরী কাজে যাচ্ছেন। অতএব বিশ্রামের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

ছোটরানীর নাম শুনেই মোয়দিন কৃতাঞ্জলীপুটে মাথা নত করে বলল, 'আম্পুবাবু এই অধীনের প্রভু। মোয়দিন আপনার জন্য কি করতে পারে বলুন? যে কোনো কাজের নির্দেশ পেলে এই অধীন তা আল্লার নির্দেশের মতই পালন করতে সব সময় প্রস্তুত।'

'তোমার সম্পর্কে আমি শুনেছি।' মাক্কমদেবী বললেন, 'ভালোই হলো। এ কাজে সাহায্য করার জন্যে কিছু লোক আমার সঙ্গে পাঠাতে পারলে ভালো হয়।'

'আমি এই জঙ্গলের ঐ প্রান্তে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত আপনাদের পৌঁছে দেবো।' মোয়দিন বলল, 'তার পরের রাস্তা আমি জানি না। শুধু ভিলরাই জানে।'

'তহলে আমি আজকের মধ্যেই কি করে রাজার কাছে যেতে পারব?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মোয়দিন জবাব দিলো, 'পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে সেখানকার প্রহরীর মাধ্যমে আমি ভিলদের সর্দারের কাছে লোক পাঠাব। আপনার আগমনের খবর পেলে তারা কি আর জরুরী ব্যবস্থা করবে না!'

'বেশ তাই করো।' মাক্কমদেবী বললেন।

ইতিমধ্যে কাম্মুও এসে যায়। ততক্ষণে মোয়দিনের লোক নানা রকমের ফলমূল সযত্নে মাক্কমের সামনে এনে রাখে। আহারান্তে ছোটরানী পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হন।

দশ

আহারান্তে আবিজ্জিক্কাডের মহারানী পানের রৌপ্যনির্মিত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বসলেন। স্নানের পর তিনি চোখে কাজল ও কপালে কুমকুমের ফোঁটা দিয়েছেন, পরিধান করেছেন শুভ্র বস্ত্র এবং অঙ্গে ধারণ করেছেন অলঙ্কার। দেখে মনে হয়, তিনি যেন আজ অরণ্যবাসিনী নন, নিজের প্রাসাদেই আছেন। প্রথম প্রথম কিছু লোক এ সম্পর্কে মন্তব্য করলে, মহারানী বলতেন, 'আমার স্বামী যেখানে থাকেন, সেইটাই আমার কাছে রাজপ্রাসাদ। এ অবস্থায় আমার কাছে অরণ্য আর প্রাসাদে কোনো পার্থক্য নেই। এখানেই থাকি আর পয়শীতেই থাকি, আমার কাছে দুই সমান।' এ কথা শুনবার পরে আর কোনো কথা বলার মতো কারো কিছু থাকে না। রাজা সাহেব তাঁর এই মন্তব্য শুনে তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

বড়রানী কুজ্জানীর বয়স বর্তমানে চল্লিশের উর্ধ্বে। পনের বছর বয়সে মহাদেবী হয়ে তিনি পয়শীতে আসেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত রাজমহলে থাকার সুযোগ তাঁর খুব কমই হয়েছে। সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়ে বিয়ের পর মাস দুই যেতে না যেতেই স্বামীর অনুগামিনী হয়ে তাঁকে বনপথ ধরতে হয়। অন্যান্য রাজা এবং রানীরা যখন তিরুবিত্তাঙ্কুরের মহারাজার আতিথ্য স্বীকার করতে বাচ্চিদেশের দিকে রওনা হয়ে গেলেন, মহাদেবী কুজ্জানী তখন চতুর্থ রাজকুমার কেরলবর্মার সঙ্গে পুরলীর দুর্গম পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হন। গত পঁচিশ বছর ধরে বনে জঙ্গলেই তাঁর দিন কেটেছে। ইংরেজদের সঙ্গে

বুঝাপড়ার পর কিছুদিনের জন্য রাজা সাহেব যখন পয়শীতে ছিলেন, তখন তিনিও রাজমহলের সুখ ভোগ করেছেন।

চল্লিশ বছর বয়স হলেও এখনো তাঁর রূপ-লাবণ্যে ভাটা পড়ে নি। সোনার মতো রঙ, সুন্দর সবল দেহ। ভ্রমরকালো সুদীর্ঘ রেশমস্নিগ্ধ কেশরাশি, স্নানের পর সেগুলিকে তিনি সাধারণভাবেই বেঁধে রাখেন। বিস্ফারিত আঁখি, কোমল দুখানি বাহু আর অলঙ্কারে সজ্জিত তাঁর কর্ণযুগল। তাম্বুল ব্যতিরেকেই আরক্তিম তাঁর ওষ্ঠাধর এবং মুখমণ্ডলে তাঁর সদা-বিরাজিত প্রসন্নতা। এ সব ছিল রানী কুঞ্জানীর সৌভাগ্যের লক্ষণ। তাঁর এই রূপ-লাবণ্যের ফলে মনে হতো যেন তিনি রাজা সাহেবের মতো মহান ব্যক্তিরও সহধর্মিণী হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির ফলে আজকাল তাঁর দেহ কিছুটা মেদবহুল হয়ে উঠেছে। এবং তাই দেখেই লোকে অনুমান করে, তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

বহুমুখী প্রতিভাবান ও সংস্কৃতিপ্রেমী স্বামীর সঙ্গগুণে তিনিও সাহিত্য-সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজা সাহেব কাহিনী, সঙ্গীত বা যা কিছু রচনা করতেন, সর্বাগ্রে তা তিনি তাঁকেই পড়িয়ে শোনাতেন এবং তাঁর মতামত চাইতেন।

যে ভাবে রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবী গিয়েছিলেন বনবাসে, বড়-রানী কুঞ্জানীও সেই ভাবে স্বামীর সাথে বনপথ ধরেন। আর এই জন্যেই রাজার অনুচরেরা তাঁকে সম্মান করে দেবীর মতো। রাজার শিবিরে তিনি এবং তাঁর এক দাসী ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীলোক ছিল না।

কুঞ্জানী তখন সবে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু নিশ্চিন্তে বসে পান সাজছেন, এমন সময় হঠাৎ এক সংবাদ আসায় তাঁর সে বিশ্রামে ছেদ পড়ল। একজন নায়ার এসে জানাল যে, কৈনেরীর ছোটরানী পালকি করে এদিকে আসছেন। সাজা পান ঐ ভাবেই পানের বাটায় রেখে বড়রানী দ্রুত পদক্ষেপে বাইরে এলেন। সস্নেহ হাসিতে তিনি পালকি

থেকে অবতরণকারী মাক্কমকে স্বাগত জানালেন এবং পরস্পরের অভিবাদন বিনিময়ের পর তাঁরা হাত ধরাধরি করে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

'কৈনেরীতে সবাই ভালো আছে তো? আগে থেকে না জানিয়ে হঠাৎ এ ভাবে চলে এলে কেন?' কুঞ্জানী জিজ্ঞাসা করলেন।

'খুব জরুরী কথা আছে। অবিলম্বে তাঁকে খবর না দিলে ভীষণ বিপদ ঘটতে পারে ভেবে সোজা চলে এলাম।'

মাক্কমের মুখে ব্যস্ততার ভাব দেখে বড়রানী আঁচ করলেন যে, ব্যাপারটা তাহলে সাধারণ নয়।

'চারদিন আগে উনি ছিলেন কুট্টিয়াড়ীতে, গতকাল ছিলেন মনত্তনায় এবং খবর পেয়েছি, আজ থাকবেন কন্নবতে। আসল ব্যাপারটা আমাকে বলতে কি কোনো আপত্তি আছে?'

'এমন কি কথা থাকতে পারে আমার, যা আপনার কাছে গোপন করব।' মাক্কম বললেন, 'সংক্ষেপে বলছি—ইংরেজদের একটি সৈন্যদল এই জায়গাটা দখল করার জন্য বেরিয়ে পড়েছে।'

'এই জায়গা? এখানে তারা আসবে কি করে। পথে তো খুব ভালো পাহারার ব্যবস্থা আছে।'

'তারা সোজা পথে আসবে না। পেছনের গোপন পথ দিয়ে এসে সুড়ঙ্গে ঢুকে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ এখানে এসে পৌঁছবে।'

মাক্কমের কথায় বড়রানী অবাক হয়ে যান। এই গুপ্ত সুড়ঙ্গপথের খবর রাজা সাহেবের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অনেকেরই অজানা। জানতেন শুধু কন্নবতের নাম্প্যার, তলক্কল চন্তু, আম্পু নায়ার, পয়য়ম বাড়ির চন্তু—এই চারজন কর্মচারী এবং বড়রানী, রাজা সাহেব ও তাঁর ভাইপো।

কিছুক্ষণ কি ভেবে বড়রানী বললেন, 'কিছুতেই তাঁরা সে পথ জানতে পারে না। এই রকম একটা পথ আছে অনুমান করে যদি তারা আসে, তবে প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে পথ আর তাদের বের

করতে হবে না। আমাদের মধ্যে রাজা ও তাঁর ভাইপো বাদে খুব বেশী হলে আর মাত্র চারজন এই পথ জানেন।'

'আপনার কথা সত্যি। কিন্তু সেই চারজনের মধ্যেই কেউ যদি ইংরেজদের বলে দিয়ে থাকেন?'

'কখনোই তা হতে পারে না। রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার এদের মধ্যে কেউ নেই।'

'তা সত্ত্বেও আমি বলছি। আমাদের চারদিকে বিপদের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। পয়য়ম বাড়ির চন্তু নায়ার ইংরেজদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছেন, আর তিনিই করছেন এই বিশ্বাসঘাতকতা।'

বড়রানীর তবু বিশ্বাস হয় না এ কথা। চন্তু রাজা সাহেবকে প্রতারণা করবেন, এ কথা যেন তিনি ভাবতেই পারেন না। চন্তু ছিলেন ভবঘুরে অনাথ একটি ছেলে। রাজা সাহেবই তাঁকে নিজের কর্মচারী হিসাবে রেখেছিলেন এবং ধীরে ধীরে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ পদে উন্নীত করেছেন। তাঁর উপর আজকাল রাজা সাহেব তাঁকে নিজের ডান হাত বলে মনে করেন। মানুষ যত খারাপই হোক না কেন, এতখানি নেমকহারামি তো করতে পারে না। এখনো তাঁর উপর রাজা সাহেবের আছে অটুট বিশ্বাস। এখনো তিনি তাঁকে দেখেন একেবারে নিজের ছেলের মতন। এসব সত্ত্বেও কি সে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে?

এই সব চিন্তা বড়রানীর মাথায় তোলপাড় করে ফিরতে থাকে। কিছুক্ষণ তাঁর নীরবে কাটে। কয়েক দিন আগে থেকে চন্তুর ব্যবহার যে কিছুটা অন্য রকমের হয়ে উঠেছে তা যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল। তাঁর সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যেও কোথায় যেন একটা আন্তরিকতার অভাব ছিল। কিন্তু ঐ সবের কারণ চন্তুর অনভিজ্ঞতাই ভেবে তিনি তেমন কিছু মনে করেন নি এবং তাঁর ঐ রকম ব্যবহার সম্বন্ধে খুব বেশী একটা গুরুত্ব দিয়ে ভাববার মতো কারণও তিনি অনুভব করেন নি। এখন তাঁর মনে কিছুটা সন্দেহ প্রবিষ্ট হওয়ায় সেই সন্দেহের আলোকে

অতীতের কয়েকটি ঘটনা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তুমি এসব জানলে কি করে?'

মাক্কম গত রাত্রের সমস্ত ঘটনাটি তাঁকে বিস্তারিতভাবে বললেন। 'ও বুঝেছি।' বড়রানী বললেন, 'এখন এর উপায়? আজ রাত্রের আগে উনি পাহাড়ের ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারবেন না। অথচ এই খবরটা এক্ষুণি রাজাকে জানানো উচিত। সৈনিকদের রুখবার জন্য তাঁর সেখানে থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই। তলক্কল চন্তু এসে গেছে না?'

বড়রানী তৎক্ষণাৎ তলক্কল চন্তুকে ডেকে পাঠালেন। ভিলদের ঐ সর্দারকে সব কথা বলতেই তিনি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'যাক, আজ তাহলে ফাঁস হলো সব। অনেকদিন ধরেই আমি সন্দেহ করছি, কিন্তু তাঁর উপর রাজা সাহেবের ভালোবাসা এবং বিশ্বাস দেখে কিছু বলতে পারি নি। তা সত্ত্বেও আমি সতর্ক ছিলাম। কোম্পানীর লোক নিয়ে আসুক না, একটিকেও গর্দান নিয়ে ফিরে যেতে হবে না।'

ভিল সর্দার প্রস্থান করলেন এবং রাজা সাহেবকে খবর দেওয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক পাঠানো হলো। শিবিরের গোপন পথ পাহারা দেওয়ার জন্য চন্তু প্রস্তুত হলেন। সুড়ঙ্গের ঐ মুখটি বড় বড় পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ তিনি লোক নিযুক্ত করলেন এবং তারপর দুশ ভিল সঙ্গে নিয়ে কালমাত্র বিলম্ব না করে তিনি ঐ গভীর অরণ্যে লুকিয়ে পড়লেন। পয়য়ম বাড়ির চন্তু নায়ারের গোপন চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা পণ্ড করবার ব্যবস্থা করতে পারায় কুঞ্জানী ও মাক্কম নিশ্চিন্ত মনে অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন।

মাক্কম তাড়াতাড়ি স্নান করে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলেন। তারপর দুজনের মধ্যে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ঘরবাড়ি সম্বন্ধে কথা-বার্তা চলল। রাজা সাহেবের দয়া, ধৈর্য ও অন্যান্য গুণের আলোচনা ছিল তাদের এই সমস্ত কথাবার্তার মূল অবলম্বন। এক সময় মাক্কম জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজকাল উনি কি কাব্য রচনা ছেড়ে দিয়েছেন?'

'না, লিখছেন। "কৃমির বধ" নামে একখানা নতুন কাব্য লিখতে শুরু করেছেন। সবে প্রথম খণ্ড লেখা শেষ হয়েছে।'

'একটু দেখি। আপনার কাছে নিশ্চয়ই সেটা আছে।'

বড়রানী বাক্স খুলে সুরক্ষিত চার পাঁচটি তালপাতা বের করে মাক্কমকে দিলেন। মাক্কম তা সাদরে দু হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

একটি পঙক্তি পড়ার সময় বড়রানী লক্ষ্য করলেন মাক্কমের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পড়তে পড়তে মাক্কমের চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। বড়রানী বনবাসের দুঃখ ভুলে গেছেন, কিন্তু এখনো তাঁর মনে অতীতের সেই দিনগুলি উঁকি মারতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের নীরবে কাটে। এক সময় মাক্কম বলেন, 'এ অংশ নিশ্চয়ই আপনার লেখা। এখানে নারীর ধ্যানধারণা চিন্তা নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।'

'কি যে বল, তার ঠিক নেই। তাঁর লেখায় আমি হাত দিতে পারি ?'

তারপর বড়রানী সযত্নে রক্ষিত তালপাতার একটি টুকরো নিয়ে এলেন। 'এটা তাঁর বিছানার বালিশের তলায় পেয়েছি।'

'আমাকে দিন, একটু পড়ব।'

'না না, আমিই পড়ে শোনাচ্ছি।'

বড়রানী কবিতাটি পড়লেন। সেটির মর্মার্থ হলো—রাজা সাহেব ফুলের কাছে এই বলে মিনতি জানাচ্ছেন যে মাক্কম যখন তাঁর খোঁপায় ফুল পরবেন, তখন সে যেন তাঁর কানে রাজার বিরহ-বেদনার গুঞ্জন কান্না পৌঁছে দেয়।

'লেখার ভাবটি বড় করুণ। কি সুন্দর কবি-কল্পনা আর কি আবেগ! আমার কিন্তু মনে হয় না যে, এই বিরহের মধ্যেও তুমি ফুল খোঁপায় পরেছ।'

'বেশ কয়েক মাস হলো আমি একটি ফুলও ছুঁইনি। কিন্তু তা

সত্ত্বেও উনি এ কথা কী করে ভাবতে পারলেন ? আর ভেবেছেন বলেই তো উনি ফুলকে সম্বোধন করেছেন ঐ ভাবে। আমার উপর যদি আপনার বিন্দুমাত্রও স্নেহ থাকে, তাহলে এক্ষুণি আপনি ঐ তালপাতাটিকে নষ্ট করে ফেলুন।'

'আমি তাঁর রচনা নষ্ট করতে পারি ? তবে এ থেকে একটি কথা তো ঠিক যে, এখানে তোমার শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁর মনে তুমি সদাসর্বদা বিরাজমান।'

এই ধরনের কথাবার্তায় তাঁদের সময় কাটে।

* * *

তলক্কল চন্তু যে ভিলটিকে পাঠিয়েছিলেন সে সন্ধ্যা নাগাদ কন্নবত পৌঁছে যায়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই একটি ছোট সৈন্য দল নিয়ে রাজা সাহেবও সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি মেজর হোম্‌সের সৈন্যের মনন্তনার দিকে অগ্রসর হওয়ার আগেই তিন দিক দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালানো স্থির করেছিলেন। তাঁর সেনাপতিত্বে তাঁর ভাইপো বন্থু নায়ার এবং ভিল সৈনিক মনন্তনা থেকে হেঁটে গিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন। রাজা সাহেব এও জানতেন যে, আম্পু-নায়ারের নেতৃত্বাধীন সৈন্যদল মানঞ্চেরি থেকে বেরিয়ে পেছন দিক দিয়ে ইংরেজ সৈন্যের উপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত আছে। এই ভাবে দু দিক দিয়ে আক্রান্ত হয়ে ইংরেজ সৈন্যরা যখন খুব বেকায়দায় পড়ে যাবে তখন তাদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য একদল সৈন্য নিয়ে রাজা সাহেব নিজেই অগ্রসর হবেন। আক্রমণের জন্য নিজের সৈন্যদলকে ঠিকমত জায়গায় রেখে আম্পু নায়ার রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য কন্নবতে হাজির হলেন।

আম্পু ছিলেন চিন্তাগম্ভীর। তাঁর মুখ দেখে রাজা সাহেব বুঝে নিলেন, কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। কাজেই তিনি ধীরভাবে কথা শুরু করলেন, 'কি আম্পু, সব ব্যবস্থা ঠিক করে এসেছ তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ভগবতী শ্রী পোর্কলির কৃপায় সব কিছু ঠিক করে এসেছি। উত্তরাঞ্চলের নায়াররা অবশ্যই সাহায্য করবেন। কটত্ত-নারের রাজা পরোক্ষভাবে আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। ইরুব দেশের নাম্প্যারদেরও এই ইচ্ছা। চিরক্কলের রাজা নিজের সাধ্যমত সাহায্য করবেন।'

'তাহলে তুমি কেন এত মনমরা হয়ে আছ?'

'আমাদের উপর একটা বড় ধরনের বিপদ আসছে।'

'কোনো কিছু না ঢেকে পরিষ্কার করে বল।'

'এবারের ইংরেজ সেনাপতি সাধারণ লোক নয়। আমাদের সাথে মোকাবিলা করার আগেই সে আমাদের সাহায্যকারীদের সর্বনাশ করতে চায়। এই উদ্দেশ্যেই সে ইরুব দেশে আস্তানা গাড়ছে। তার কাছ থেকে একজন লোক গেছে কটত্তনার রাজাকে শাসাতে। শোনা যাচ্ছে, অন্যদের বিচ্ছিন্ন করাও তার উদ্দেশ্য।'

'কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের গোপন সাহায্যকারীদের নাম সে জানল কি করে? এসব তো আমাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মচারী ছাড়া অন্য কেউ জানে না।'

'এই উর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে একজন ইংরেজদের পক্ষে চলে গেছে।' আম্পু বলেন।

'কি বললে, আমাদের একজন কর্মচারী ইংরেজ পক্ষে চলে গেছে?"

আম্পু এখন কি ভাবে তলশেরীতে পয়য়ম বাড়ির চন্তুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে চন্তু তাঁকে বন্দী করার জন্যে কি ধরনের ফাঁদ পেতেছিলেন এবং ঘটনাচক্রে আম্পু কি ভাবে ওখান থেকে রক্ষা পেলেন প্রভৃতি কথা—রাজা সাহেবকে বললেন।

এই সব শুনে ধৈর্যশীল রাজাও যুগপৎ বিস্মিত, চিন্তিত ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন, এবং মনে পেলেন নিদারুণ আঘাত—যে চন্তু তাঁর এমন একজন বিশ্বস্ত অনুচর, আজ সে কিনা যোগ দিয়েছে ইংরেজদের সঙ্গে। গত পাঁচিশ বছর ধরে তাকে যে ভাবে রাজা সাহেব দেখে

আসছেন, তার সঙ্গে এই ঘটনার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া ভার। কত বিপজ্জনক অবস্থায় চন্তু রাজার সঙ্গে থেকেছেন। কতবার নিজের জীবনের পরোয়া না করে তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন। পঁচিশ বছর আগে তিনি ছিলেন এক পান-বিক্রেতা বালক। সেই হিসাবেই তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তাঁর ধৈর্য, চাতুর্য এবং বিশ্বস্ততা দেখে রাজা সাহেব তাঁকে ক্রমে ক্রমে বর্তমান পদে উন্নীত করেছেন। পয়য়ম পরিবারে বাতি দেওয়ার মতো ছিল না আর কোনো উত্তর পুরুষ। রাজাই তাঁকে ধীরে ধীরে একজন সামন্তে পরিণত করেন তারপর। কৈনেরী পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পর তিনি তাঁকে বর্তমান পদে উন্নীত করেন। চন্তু এ সবের উপযুক্ত ছিলেন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে নিযুক্তও ছিলেন। কিন্তু এখন সেই লোকই নিজের মাতৃভূমি এবং রাজা সাহেবের শত্রু ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই ভাবে নেমকহারামি করবে. এটা কি করে বিশ্বাস করা যায়!

রাজা সাহেবের মন নানা চিন্তায় বিক্ষুব্ধ থাকায় তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না। তাঁর কাছে এসব যেন স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল।

আম্পু সেই অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে বললেন, 'পাহাড়ে পৌঁছানোর আগেই অধীনের মনে কিছু সন্দেহের উদ্রেক হয়। আজকাল চন্তু উত্তর বাড়ির নায়ারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করছেন শুনে সেই সম্পর্কে আমি কিছু খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পরিষ্কার কিছু জানতে পারি নি। তবে একটা খবর পেয়েছি যে, নতুন কর্নেলের দোভাষী ছদ্মবেশে সেই বাড়িতে আসে। শেষ পর্যন্ত তলশেরীতে চন্তুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় সব রহস্য বুঝতে পারি।'

'এখন কি করণীয় তাহলে?' রাজা সাহেব জিজ্ঞাসা করেন।

'অধীনের মত হচ্ছে, ঐ বিষদাঁত সমূলে উৎপাটিত করাই ভালো।' রাজা সাহেব নীরব থাকেন।

আম্পু বলেন, 'এ ব্যাপারে কোনো রকম দ্বিধা থাকলে অনেক বেশী ক্ষতি হবে। কর্নেল তাঁকে দিয়েই আমাদের সাহায্যকারীদের বিনাশ করবেন। জানি না, ইতিমধ্যেই কার কার মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়েছে।'

'যে হাতে এতদিন দুধ খাইয়েছি, সে হাতে কি করে বিষ দিই ?' রাজা সাহেবের কথায় তাঁর মনের ব্যথা চাপা থাকে না। 'তাকে বন্দী করতে পারো না ?'

'আপনি তো জানেন, সে কি রকম কৌশলী। সুতরাং ঐ দুঃশাসনকে বন্দী করে রাখা অত সহজ হবে না। কাজেই বলছি, যদি আজ্ঞা দেন তো ...'

'সে আমার জন্য কি না করেছে। একটি ভুলের জন্য তার অতীতের সমস্ত কাজকে ভুলে যাওয়া কি উচিত হবে ?'

'অধীনের বক্তব্য হচ্ছে, এই সময় দয়া প্রদর্শন করার অর্থ নিজের বিপদ ডেকে আনা। আজ্ঞা যদি নিজের মুখে না দিতে পারেন তো অন্ততঃ বাধা দেবেন না।'

রাজা সাহেব খুব দোটানার মধ্যে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে থেকে বললেন, 'আমি আর কিছু শুনতে চাই না, তোমাদের যা ইচ্ছা কর।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন ভিল এসে সেখানে হাজির হলো। অবিলম্বে তাঁর পুরলী পাহাড়ে প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা নিয়ে বড়রানীর কাছ থেকে সে এসেছে শুনে রাজা সাহেব আরো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি জানতেন যে বিগত দীর্ঘ পঁচিশ বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন যুদ্ধে মহাদেবী কুজ্জানী কোনো দিনই বিচলিত হন নি। সেই বীরাঙ্গনার কাছে যুদ্ধ ছিল অতি সাধারণ একটি ঘটনা মাত্র। কাজেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটেছে, নচেৎ যুধ্যমান স্বামীকে প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত আহ্বান

করার মতো স্ত্রী তিনি নন। তৎক্ষনাৎ ফিরে যাওয়ার জন্যে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'আম্মু, আগামীকালের যুদ্ধে আমি উপস্থিত থাকতে পারছি না। আমাকে অবিলম্বে পাহাড়ে যেতে হচ্ছে। এখানকার সৈন্যদলও তোমার সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করবে। আর মানঞ্চেরির সৈন্যদের জন্য সর্দার উন্নিমুপ্পন নিজেই আছে।'

'যথা আজ্ঞা! অধীন চেষ্টার ত্রুটি করবে না।'

'দেখো, ঝোঁকের মাথায় আবার কোনো বোকামি করে বসো না যেন। খুব ভেবে চিন্তে কাজ করবে।'

এই কথা বলে রাজা সাহেব আর কালমাত্র বিলম্ব না করে রওনা হলেন।

এগার

রাজা সাহেবের পরিকল্পনানুসারে দ্বিতীয় দিন যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হলো। মেজর হোম্‌সের সৈন্য তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ে পালিয়ে গেল এবং হোম্‌স ও তাঁর চারজন সাথীকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে আম্পুর কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হলো। যুদ্ধে রাজা সাহেবের দলের লোক ইংরেজদের অনেক বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করল। ঐ সব নিয়ে ইংরেজ বন্দীদের সঙ্গে করে আম্পু পুরলী পাহাড়ে চলে গেলেন।

তলশেরীতে এই সংবাদ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দারুণ একটা সাড়া পড়ে যায়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ ওয়েলেসলিও ভীষণ চটে গিয়ে নিজের অফিসের মধ্যে দ্রুত পায়চারী করতে থাকেন আর বিড় বিড় করে বকতে থাকেন। তাঁর কথার সারমর্ম হচ্ছে, রাজাকে পরাজিত করতে হলে প্রথম তলশেরী দুর্গের প্রত্যেক অফিসারকে ফাঁসী দেওয়া উচিত।

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আহত অবস্থায় রয়েছেন শত্রুদের কবলে। তাঁর সৈন্যবাহিনী গিয়েছে ধ্বংস হয়ে। তার উপর তাঁর শিবিরের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য-সামগ্রী চলে গেছে শত্রুদের হাতে। এখন আবার তাঁর বন্ধু মেজর হোম্‌সও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরবৃন্দসহ বন্দী হলেন। যদিও ওয়েলেসলির আগামী দিনের যুদ্ধ পরিকল্পনায় এই পরাজয় বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না, তবু তিনি একথা অনুমান না করে পারলেন না যে, এই ভাবে বারে বারে যে বিপদ আসছে, তার কারণ নিশ্চয়ই বিশ্বাস-ঘাতকতা। তাঁর এই ধারণা পোষণ করার পেছনে কারণস্বরূপ আরো

অনেক ঘটনা ছিল। শত্রুকে সাহায্য করার অপরাধে উন্নি নামে একটি মেয়েকে সৈন্যরা সিভিল জেলে বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু বেবর তাঁকে না জানিয়েই তাকে ছেড়ে দেন। এর মূল কারণটি জানা দরকার। শুধু তাই নয়, রাজা সাহেবকে সাহায্যকারী সামন্তদের বন্দী করার জন্যে তিনি যে সমস্ত সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন, তার প্রায় প্রত্যেকটি দলই পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। কেবল চুয়লী নাম্প্যার ধরা পড়েছে এবং তাও তার শারীরিক অসুস্থতার জন্য। তাছাড়া বয়নাড়ুর এমন নায়ারকে অতর্কিত আক্রমণে শ্রীরঙ্গপত্তন পর্যন্ত হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ইংরেজদের লোক অন্যান্য সামন্তদের বাড়ি গিয়ে খবর পায় যে, তারা সব বিভিন্ন কাজে অন্যত্র চলে গেছে। এই সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করে, ওয়েলেসলি বুঝতে পারেন যে, তাঁর পরিকল্পনা পূর্বাহ্নেই শত্রুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি সক্রিয় চতুর দল তলশেরীতেই কাজ করছে। এই গুপ্তচর দলটিকে টুঁটি টিপে মারতে পারলেই তাঁর আগামী দিনের পরিকল্পনা সফল হবে।

সর্বপ্রথম তিনি বেবরকে ডেকে পাঠালেন এবং সব কথা তাঁকে জানিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। উত্তরে বেবর বললেন যে, কর্নেল মিছামিছি তাঁর উপর বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ আনছেন। আসলে তলশেরীতে ঐ ধরনের কোনো দল নেই। কর্নেল নিজের পরাজয়ের প্রতিশোধ অনন্যোপায় হয়ে এখন তাঁর উপর দিয়ে নিতে চাইছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কর্নেলও জানতেন যে, সত্যিই বেবর নিরপরাধ। তাছাড়া তাঁর সাহায্য না পেলে সহজে কিছু করাও যায় না। তাই তাঁকে ধমক দিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন না আমার কথাগুলি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতায় এ খবর গিয়ে পৌঁছলে খুব ক্ষতি হবে।'

বেবর বুঝলেন, কর্নেল তাঁর নিজের ভাই গভর্নর জেনারেলের মাধ্যমে তাঁকে শাস্তি দিতে চান। কিন্তু ওসবের তিনি পরোয়া করেন

না। তিনি জানতেন যে, গভর্নর জেনারেলের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষেই একটি দল আছে। ইংলণ্ডে কোম্পানীর সর্বাধিপতি ডণ্ডাস্ হলেন সেই দলের সহায়ক এবং সেই সূত্রে গভর্নর জেনারেলকে অনেকবার ওয়ার্নিংও দেওয়া হয়েছে। কর্নেল ওয়েলেসলি তলশেরীতে এসে যখন নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন, সেই সময়ই বেবর বোম্বাইয়ে তাঁর উপরওয়ালা অফিসারদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, 'সিভিল অফিসারদের পক্ষে সেনাপতিদের আজ্ঞাবহ হওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যদি ওয়েলেসলি জোর-জুলুম করেন তো তাঁরা লণ্ডনস্থ মালিকদের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ চিঠি দিতে প্রস্তুত।' বেবর এই শক্তির উপরই নির্ভর করে ওয়েলেসলির কথার জবাবে বললেন, 'আপনি তা হলে লিখে পাঠান। সিভিল শাসনের উপর সেনাবিভাগের যে আইনত কোনো অধিকার নেই, তা আমি ভালোভাবেই জানি। তাই আপনার বর্তমান কার্যকলাপের কথা বোম্বাইয়ে মালিকদের কাছে আমিও লিখে পাঠাব।'

কর্নেল ওয়েলেসলি একজন সাধারণ সেনাপতি মাত্র নন। ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার মতো উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনা তাঁর মধ্যে ছিল। কাজেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, সুপারভাইসারের এই নির্ভয়-দৃঢ় উত্তরের পিছনে শক্তিশালী কোনো ভিত্তি আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর ও ব্যবহার বদলে ফেলে বললেন, 'আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা উচিত নয় মিঃ বেবর। সেটা কোম্পানীর পক্ষেই ক্ষতিকর হবে। এই শহরে কিছু লোক আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। আমি তার প্রমাণও পেয়েছি। আমার অনুরোধ, আপনি তাদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।'

'এই ধরনের কোনো গুপ্তচর দলের সন্ধান পেলে আমি তাদের দমন করব। কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়?'

'বলব?' কর্নেল বললেন, 'শুনলাম সিভিল বন্দিশালা থেকে সেই

মেয়েটিকে আপনার নির্দেশ অনুযায়ী মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কী? মেয়েটি নিশ্চয়ই সাধারণ অপরাধী ছিল না?'

উন্নিকে মুক্ত করার পিছনে কারণস্বরূপ যে ঘটনাটি কাজ করেছে, তা নিম্নরূপ।—

বন্দিশালায় আটক করার পর দ্বিতীয় দিন সকালে বেবরের কাছে চন্ত্রোত নাম্প্যার এসে হাজির হয়। ময়য়ীতে থাকার ফলে নাম্প্যার ইউরোপীয় আদব-কায়দা, রীতিনীতি ভালো করেই রপ্ত করে নিয়েছিলেন। এই জন্য ইউরোপীয় অফিসাররা তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিল। মাঝে মাঝে তিনি তলশেরী এসে তাদের অভিবাদন জানিয়ে যেতেন, এবং ভালো ভালো জিনিস উপহার দিতেন। তিনি বেবরের কাছে অভিযোগ করেন যে, তাঁরই আশ্রিত একটি বালিকাকে কোম্পানীর লোক জোর-জুলুম করে ধরে নিয়ে এসেছে। চন্ত্রোতবাবুর মুখে সমস্ত ঘটনাটি শুনে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ভবিষ্যতে এই জাতীয় ব্যাপার আর ঘটতে দেওয়া অনুচিত হবে। তাই বেবর বললেন, 'আচ্ছা, খোঁজ-খবর নিয়ে চিন্তা করে দেখি।'

বেবর জানতেন না যে, আম্পু নায়ারের চিঠি নিয়ে নাম্প্যার প্রথমেই চিরুতাকুট্টির সঙ্গে দেখা করেছেন। আম্পুর চিঠি পড়ে সে বলেছে, 'আমি তাঁর জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত। এতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।' তারপর বিনীতভাবে সে আরো বলে, 'আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্যে আমি আনন্দিত। কোথেকে এই নির্দেশ আসছে, কিছু দিন আগে আমি তার আভাস পেয়েছি আম্পুবাবুর কাছে। এ কাজে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

চিরুতার বিনয় দেখে নাম্প্যারের মন তার প্রতি স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমিও আনন্দিত। এখান থেকে ইংরেজদের কাজকর্মের গোপন সব সংবাদ পাওয়ার উপর রাজা সাহেবের জয়-পরাজয় অনেকখানি নির্ভর করছে।'

,আমিও তাই মনে করি। রাজা সাহেব আমাদের সকলের।' এই বলে চিরুতাকুট্টি বিদায় নেয়।

নাম্প্যার এবং সুপারভাইসারের মধ্যে যখন কথাবার্তা চলছিল, চিরুতাকুট্টি তখন ছিল ভিতরে। অতিথিকে বিদায় দিয়ে সুপার-ভাইসার ভিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করল, 'চন্দ্রোতবাবু এসেছিলেন কেন?'

'তিনি বলছেন যে, তাঁর বাড়ি থেকে একটি মেয়েকে কয়েকজন সৈনিক জোর করে ধরে বেঁধে নিয়ে এসেছে।' বেবর বললেন।

'এ কি অত্যাচার! সৈন্যরা যদি এ ধরনের কাজ করে, তাহলে মেয়েদের অবস্থা কি হবে? আর এসব দেখে শুনে জনসাধারণই বা কোম্পানীকে সাহায্য করবে কেন?'

'প্রত্যেকটি দেশের সৈন্য এই রকমই হয়। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার-বুদ্ধি তাদের থাকে না। ওয়েলেসলি আসবার পর এ জাতীয় ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সৈনিকরা মনে করে, দুনিয়ার সব কিছু বুঝি তাদের হাতের মুঠোয়।'

'শেষ পর্যন্ত কি ঠিক করলে?'

'আদালতে একটি আবেদন পেশ করতে বলেছি। মেয়েটির বক্তব্য শুনে দেখা যাক কী করতে পারি।'

চিরুতাকুট্টি তখনকার মতো এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বলে না।

এগারটার সময় আদালতে সুপারভাইসারের সামনে উন্নিকে হাজির করা হয়। গত দিনের কষ্টভোগ এবং রাত্রে অনাহারে কয়েদ-খানায় কাটানোর ফলে তার চেহারা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল; তার উপর ময়লা শাড়ী, চুল উস্কখুস্ক। তা সত্ত্বেও তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখে আদালতে উপস্থিত সকলেই একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখমণ্ডলে তার দুঃখের কোনো চিহ্নই নেই। উপরন্তু তাতে যেন সব আপদ-বিপদকে মোকাবিলা করার মতো দৃঢ়তা প্রতিফলিত হচ্ছে। একজন পাহারাদারের সঙ্গে সে আদালতে প্রবেশ করল এবং কারো

দিকে না তাকিয়ে আনত নেত্রে মাথা নীচু করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

সুপারভাইসার মামলার সব কাগজপত্র পড়লেন। তারপর দোভাষীর মাধ্যমে উন্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি বলার আছে ? মকদ্দমার কাগজপত্রে লেখা আছে, তুমি একজন বিদ্রোহীকে পালাতে সাহায্য করেছিলে। এ কথা কি সত্যি ?'

উন্নি মাথাতুলে তাকাল। সুপারভাইসারের চেয়ারের কাছেই একটু দূরে চন্ত্রোতবাবু দাঁড়িয়ে আছেন দেখে তার ম্লান বিষণ্ণ মুখমণ্ডল নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁর দিকে তাকিয়ে উন্নি দেখতে পেল তাঁর প্রসন্ন মুখ। সুতরাং সে বুঝতে পারল যে, আর কোনো বিপদ-আপদের আশঙ্কা নেই।

দোভাষী আবার সুপারভাইসারের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। ততক্ষণে সে তাঁর যথার্থ কর্তব্য বুঝতে পেরেছে। কোনো রকম দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব না রেখে সোজাসুজি সে জবাব দিল, 'আমি কোনো বিদ্রোহীকে সাহায্য করি নি।'

'তবে কি হয়েছিল, খুলে বল ?' বেবর নির্দেশ দিলেন।

যুবতী বলল, 'আমি গতকাল সন্ধ্যার সময় পুকুর থেকে জল আনতে যাচ্ছি। এমন সময় একজন লোককে ক্ষেত থেকে বাগানে ঢুকতে দেখি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার খোঁজে চার-পাঁচ জন লোক এসে সেখানে উপস্থিত হয় এবং আমাকে সন্দেহ করে নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকে। হঠাৎ এসব দেখে আমি ভয়ে কিছু বলতে পারি না। ফলে তারা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জোর করে ধরে বেঁধে নিয়ে আসে।'

অল্পবয়সী বালিকাটির বক্তব্যের স্বাভাবিকতা এবং সৈনিকদের অত্যাচারের কথা চিন্তা করে, সুপারভাইসার তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতে নির্দেশ দেন। চন্ত্রোত নাম্প্যার তাকে নিয়ে আদালতের বাইরে এলেন।

চিরুতাকুট্টির সঙ্গে দেখা করে তাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য নাম্প্যার তারপর উন্নিকে সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে। চিরুতা খুব আনন্দের সঙ্গে তাদের স্বাগত জানাল এবং নাম্প্যার জানালেন তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

'আম্পুবাবুকে যথাশক্তি সাহায্য করাই আমার কর্তব্য। এখন তো আপনার সঙ্গেও পরিচিত হয়ে গেলাম।' চিরুতাকুট্টি বলল।

নাম্প্যার বললেন, 'আমার আর একটি আবেদন আছে তোমার কাছে। তুমি শুধু এর জীবন এবং ইজ্জতই রক্ষা কর নি, আমারও সম্মান রেখেছ। এর পরিবর্তে আমার দেওয়ার মতো কিছুই নেই। তবুও নিজের কৃতজ্ঞতার প্রতীকস্বরূপ আমার এই আংটিটি তোমাকে দিলাম। দয়া করে গ্রহণ কর।' নাম্প্যার নিজের আঙুল থেকে আংটিটি বের করে চিরুতাকুট্টির সামনে রাখলেন।

'আপনি যা দিলেন সেটা আমার কাছে আশীর্বাদের মতো।' চিরুতা বলল।

এই ভাবে উন্নি জেল থেকে বেরিয়ে আসে। এই খবরটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলেসলির মনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। অথচ আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলতেও পারেন না। কিন্তু এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মনে নানা বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিতে থাকে এবং তিনি সেগুলি পর্যালোচনা করতে শুরু করেন।

তাঁর অভিযোগের জবাবে এখন সুপারভাইসার বললেন, 'নিয়মানুসারে ঐ মহিলাকে জেলে রাখবেন কি করে? তার জবানবন্দী অনুসারে সে নিরপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।'

'নিয়মানুসারে যা হয়েছে, সেটা হয়তো ঠিক। আমি সে সম্পর্কে কোনো তর্ক-বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু কুত্তুপরম্প থেকে মেজর হোম্‌সের বেরোনোর আগেই সে কোন্ পথে যাবে, তার সৈনিকদের সংখ্যা কত প্রভৃতি শত্রুর কানে কি করে গেল সেটাই হলো প্রশ্ন।'

'এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার কর্তব্য নয়। আমার মনে হয়, সেনাপতিদের দূরদৃষ্টি এবং উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবই এর কারণ।'

কর্নেল ওয়েলেসলির মুখ অগ্নিশিখার মতো লাল হয়ে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন যে, বেবর তাঁকেই কটাক্ষ করে কথাগুলো বলছেন। তিনি মনে মনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাইরে কোনো ভাবে তা প্রকাশ না করে তিনি বলেন, 'আমি মেনে নিচ্ছি যে আমার পরিকল্পনার মধ্যে চাতুর্যের অভাব আছে। ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয় তার জন্য সচেষ্ট হব। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও নিশ্চিত যে, শত্রুর কাছে আমাদের গোপনীয় খবর পেঁাছে দেওয়ার জন্য এই শহরেই তার সাহায্যকারী আছে। আমি তাদের সম্পর্কেই বলছি। তাদের দমন করতে না পারলে কিছুই হবে না।'

'আমি আপনার অভিসন্ধি বুঝতে পারছি। আপনি সিভিল অফিসারদের উপরেও আপনার অধিকার কায়েম করতে চান, এই তো? অনেক দিন ধরেই আপনার আমার উপর সন্দেহ। মনে রাখবেন, এই শহরকে আপনার হাতে সঁপে দেওয়ার অনুমতি আইন-কানুনে নেই। যতদিন আমি এখানকার সুপারভাইসার আছি ততদিন ওসব চলবে না।'

'যুদ্ধ চালানোর জন্য যদি মিলিটারী আইনও প্রয়োগ করা প্রয়োজন মনে করি, তাও করতে আমি পিছ-পা হবো না। এর জন্য কারো অনুমতির অপেক্ষা রাখব না।'

সুপারভাইসার সেনাপতির এই ধরনের ধৃষ্টতা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বললেন, 'যদি তাই হয় তাহলে আমিও বলে যাচ্ছি: নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে আমি আপনার এই জাতীয় প্রত্যেকটি উদ্যোগকে রুখতে চেষ্টা করব। মনে রাখবেন, আমি বোম্বাই সরকারের কর্মচারী। তাঁদের অনুমতি ছাড়া আমি কারো হাতে এখানকার অধিকার অর্পণ করব না।' এই কথা বলে সুপারভাইসার সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন।

কর্নেল আরামকেদারায় বসে গভীর চিন্তায় ডুবে যান। ইংরেজ সৈন্যের অনেকগুলি ছোট ছোট দল শত্রুরা নষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সিভিল আইনের বিরুদ্ধে তিনি কি-ই বা করতে পারেন? তাঁর ধারণা ছিল যে এমন নায়ারকে শ্রীরঙ্গপত্তনে তাড়ানোতে এবং চুয়লি নাম্প্যারকে বন্দী করার ফলে জনতা ঘাবড়ে যাবে।

ভীতিপ্রদর্শন এবং অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের রাজা সাহেবের কাছ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে তাদের বিনাশ করাই ছিল কর্নেলের উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে সিভিল কর্তৃপক্ষের সাহায্য ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কর্নেল বুঝতে পারলেন যে সুপারভাইসার তাঁর কথা মতো চলবেন না। তাঁর নীতির সফল রূপায়ণের জন্য এখন কি করা যায়, সেই কথাই তিনি ভাবতে লাগলেন। সুপারভাইসারকে ধমক দেওয়ার জন্য তিনি বলেছিলেন যে, মিলিটারী আইন জারী করে সম্পূর্ণ অধিকার নিজের হাতে নেবেন। কিন্তু কাজটা যে সহজ নয় তা তিনি জানতেন। গভর্নর জেনারেলের নির্দেশ না পেয়ে কোনো সেনাপতি এই ধরনের কাজ করতে পারেন না। আবার, গভর্নর জেনারেল বোম্বাই সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে এই জাতীয় নির্দেশ কোনো সেনাপতিকে দিতে পারেন না। এবং গভর্নর জেনারেলও তা করতে প্রস্তুত হবেন না। একথা কর্নেল জানতেন। এই জন্যে তিনি নিজের পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে স্থির করেন। প্রথমেই তাঁর কাজ হলো, তলশেরীতে রাজা সাহেবকে সাহায্যকারী দল সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া। এই ধরনের একটি দল যে আছে সে সম্পর্কে তাঁর একটুও সন্দেহ নেই। এই দলের নেতাটি কে, কার কাছ থেকে বুদ্ধি আর প্রেরণা পেয়ে এই দলটি কাজ করছে, এই সব খবর জানা এবং তার অনুকূলে সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড় করার ব্যাপারে ওয়েলেসলি উঠে-পড়ে লাগেন।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কর্নেল তাঁর পরামর্শদাতা

দোভাষীকে ডাকলেন। লোকটির নাম লোপো সিক্কুবেরা। অনেকগুলো ভাষা সে জানত। অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল তার। মহীশূরের যুদ্ধের আগে সে কর্নেলের দোভাষী হয়। তাকে সঙ্গে রাখার ফলে ঐ সময়ে কর্নেলের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। সেও কর্নেল ওয়েলেসলিকে সম্মান করে।

দিন কয়েক আগেই কর্নেল সিক্কুবেরার কাছে নিজের মনের এই আশঙ্কাগুলো প্রকাশ করেছেন। এবং তখনই সে কর্নেলের অনুমিত দলটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে নিযুক্ত হয়েছে। দোভাষী এখন বলল, 'যদ্দূর আমি দেখতে পাচ্ছি, এই তদন্তের ফল কি দাঁড়াবে, কিছুই বলা যায় না। আমি নিজের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছি এর গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য।'

'রাজার সেই কর্মচারী নায়ারটি কোথায়?' কর্নেল জিজ্ঞাসা করলেন। 'মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে সে খুব সাহায্য করতে পারবে।'

'চন্তু নায়ার লোকটি খুব সাধারণ নয়। কেরলবর্মার দলে তার একটা উঁচু স্থান ছিল। সম্প্রতি কোনো এক কারণে সে রাজার উপর চটে আছে। বর্তমানে সে রাজার আস্তানা দখল করতে বেরিয়ে পড়েছে। দিন দুয়ের মধ্যে ফিরে আসবে।'

'নিজের লোকের অমঙ্গলকামীদের বিশ্বাস করো না। আমার মতে সে যথেষ্ট হুঁশিয়ার এবং চতুর। তার পেট থেকে গোপন কথা বের করে নেওয়া এবং আমাদের গোপন কথা তাকে না জানানো এই উভয় ব্যাপারেই যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।'

'এখন পর্যন্ত এই ধরনের সতর্কতার মাধ্যমেই সব কিছু চলছে।'

'ফিরে আসার পর তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে তাকে।'

দোভাষী ফিরে গেলেন। সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে লিখে কর্নেল তাঁর বড় ভাই গভর্নর জেনারেলের নামে চিঠি দিলেন। তাতে এও জানিয়ে দিলেন যে, এখনই এ সম্বন্ধে কোনো কিছু করার প্রয়োজন নেই।

বার

পয়য়ম পরিবারের চন্তু নায়ারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শোনার পর বড়রানীর কাছ থেকে ফিরে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে রাজা কন্নবত থেকে সেই রাত্রেই রওনা হলেন। এতকাল তিনি চন্তু সম্পর্কে যা ভেবে আসছেন এখন ঠিক তার উলটা হলো। গভীর অকল্যাণের আশঙ্কায় সারা পথ তাঁর সমস্ত মনটা যেন কাঁটা হয়ে রইল। চন্তুর মহীশূরের সেই গোড়ার জীবন থেকে শুরু করে তাঁর আজকের এই বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা পর্যন্ত সমস্ত কিছু বার বার রাজা সাহেবের মনে পড়তে লাগল। দিন কয়েক আগে থেকেই তিনি লক্ষ্য করছিলেন চন্তু এবং আম্পু নায়ারের মধ্যে একটা বিরোধ। এর জন্য তিনি মনে মনে আম্পুকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু আজ চন্তুর এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ কী মর্মান্তিক! মাঝে মাঝে রাজা সাহেবের মনে হতে লাগল, এর জন্য বুঝি বা তাঁর নিজের দুর্ভাগ্যই দায়ী। একদিকে চন্তুর প্রতি দুর্নিবার এক স্নেহ, ভালোবাসা তাঁকে অবিশ্রান্তভাবে টানছিল, আবার অপর দিকে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে পড়তেই ঘৃণায় সমস্ত মন তাঁর বিষিয়ে উঠছিল।

পথে যেতে যেতে রাজা সাহেব দেশের বর্তমান অবস্থা আপন মনে পর্যালোচনা করতে থাকেন। ওয়েলেসলির বর্তমান পরিকল্পনা ও তার ফলে দেশের ভাবী অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে তাঁর মন সংশয়িত হয়ে ওঠে। তিনি জানতেন যে, ইংরেজ পক্ষ থেকে তাঁর সাহায্য-কারীদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে তাঁদের জব্দ করার চেষ্টা করলে

সাহায্যকারীদের তথা জনসাধারণের মনে দারুণ এক সন্ত্রাসের সৃষ্টি হবে। দেশের জন্য প্রভাবশালী লোক তাঁকে সাহায্য করেন বলেই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারছেন। তাঁদের কাছ থেকে তিনি রসদ, বন্দুক এবং অন্যান্য সামগ্রীও পান। এই সাহায্য না পাওয়া গেলে দেশের মুক্তি অসম্ভব। তিনি বুঝতে পারেন যে, আঁতাত ও সংঘর্ষের মাধ্যমে তাঁর সাহায্যকারীদের বিচ্ছিন্ন করার ওয়েলেসলির এই কৌশলকে পরাস্ত না করে প্রথমেই ইংরেজদের ছোট ছোট দলকে আক্রমণ করা এখন নিষ্প্রয়োজন।

সেই মুহূর্তে আবার চন্তুর বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে পড়ে রাজার। তার সাথে সাথে মন চন্তুর প্রতি ঘৃণায় আর বিদ্বেষে ভরে যায়। পথে সারা রাত ঘুম হয় না। পালকিবাহকদের হুন্ হুনা আওয়াজও তাঁর কাছে অসহ্য লাগে। সারাটা রাত যেন ভয়ঙ্কর এক তুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে যায়।

পরদিন রাজা সাহেব পুরলী পাহাড়ে পৌঁছলেন। দূর থেকে তিনি আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করা একটি কোলাহল শুনতে পেলেন। রাস্তার আশে পাশে ভিলদের সংখ্যাও বেশী মনে হলো। সারা অরণ্যে পশুপাখিদের চীৎকার। সব কিছু রাজা সাহেবকে বিস্মিত করে; তিনি অনুমান করতে চেষ্টা করেন এর কারণ। বিশ্বসংসারে শুধু এই স্থানটুকুই তিনি রাখতে চান শান্তির ছায়া দিয়ে ঘিরে। কেবলমাত্র কথাকলি অনুষ্ঠানের বাদ্য ছাড়া অন্য কোনো নিনাদ তিনি পছন্দ করেন না এখানে, একথা তাঁর পার্শ্বচররা সকলেই জানে। তা সত্ত্বেও কেন যে এই কোলাহল, তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না।

এই কোলাহলের ফলে রাজার মনে যে উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হলো, পালকিবাহকেরা হয়তো তা বুঝতে পেরেই আরো দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগল। বাসস্থানের সন্নিকটস্থ উদ্যানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখতে পেলেন, কুজ্জানী ও মাক্কম তাঁকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন। মাক্কমকে দেখে রাজার বিস্ময় আরো বেড়ে যায়, তাঁর

বিনা আহ্বানে এবং আম্পুর অজান্তে মাক্কমের এই আগমনে তাঁর মন কোন্ এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ছোটরানীর আগমন এবং পুরলী পাহাড়ের এই কোলাহলের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় তাঁর।

রাজার চোখে মুখে রাত্রি জাগরণের সমস্ত চিহ্ন জাজ্বল্যমান। রানীদের অভিবাদন গ্রহণ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার কুজ্জানী? এত তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠালে যে?'

'এ ভাবে ডেকে পাঠানোর কারণ মাক্কমের কাছ থেকেই জানতে পারবে। আজ আমাদের সে-ই বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

দীর্ঘকাল পরে স্বামীর সঙ্গে দেখা। তাঁর জিজ্ঞাসু মুখের উপর দৃষ্টিপাত মাত্র মাক্কমের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। এই সময়ে কুজ্জানীর উপস্থিতির ফলে মাক্কম কিছুটা সংকোচ বোধ করেন। বড়রানী তা বুঝতে পেরে বললেন, 'আমি স্নান করে আসি। মাক্কম, তোমার যা বলার বল।' বড়রানী মাক্কমের দিকে ফিরে মুচকি হাসি হেসে চলে গেলেন।

রাজা সাহেব পালঙ্কে বসে মাক্কমকে পাশে বসিয়ে বললেন, 'অন্য কথার আগে কেমন আছ তাই বল।'

'রাজার কাছ থেকে দূরে থেকে ভালো থাকা কি স্বাভাবিক?'

'তা অবশ্য ঠিক।···আচ্ছা, এভাবে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে এলে কেন?'

মাক্কম আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটি বললেন। মুহূর্ত মাত্র রাজা সাহেব স্তব্ধ হয়ে থাকেন। ইংরেজ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে চন্তু গুপ্তপথ ধরে এই জায়গা আক্রমণ করবার জন্য রওনা হচ্ছে, শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজা সাহেবের মূর্তি বদলে যায়। ক্রোধে তাঁর চোখ দুটি রক্তিম হয়ে ওঠে, স্ফীত হয়ে ওঠে শিরা-উপশিরাগুলি। রাজা সাহেবের মন যেন ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকে। অকস্মাৎ তিনি উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন। চন্তুর বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর অন্তঃকরণকে যেন রোলারের

মতো পিষতে লাগল। স্বামীর সৌম্যদর্শন মুখশ্রীর ভয়াবহ রূপান্তর লক্ষ্য করে মাক্কমের রক্তচলাচল যেন বন্ধ হয়ে এলো, নেমে এলো পাণ্ডুর বিবর্ণতা তাঁর মুখমণ্ডলের 'পরে। হঠাৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রাজা চীৎকার করে উঠলেন—'ভগবতী শ্রীপোর্কলীর নামে শপথ করে বলছি, ওকে······।' সঙ্গে সঙ্গে মাক্কম তাঁর পায়ের উপর পড়ে শান্ত হওয়ার জন্য সকাতর প্রার্থনা জানালেন।

দাবাগ্নি কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে ত্রস্ত ব্যাকুল ছোটরানীকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজা সাহেব বললেন, 'তুমি আমার একটি নয়, দুটি উপকার করেছ। প্রথমত, চন্তুর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিয়েছ। দ্বিতীয়ত, আমার ক্রোধের বহ্নি প্রশমিত করেছ, বিশেষ করে দ্বিতীয়টির জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। সমস্ত কিছুর জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল লোকের পক্ষে ক্রোধ পরম শত্রু।'

'ক্রোধ তো তোমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়, দুষ্ট লোকের অমার্জনীয় অপরাধই তোমার মনে সাময়িক ভাবে এই জ্বালার সৃষ্টি করেছে।'

'যাক, এখন সে সম্পর্কে এখানে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?'

'দিদি তলক্কল চন্তুকে ডেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন। তোমার কাছে খবর পাঠানোর সাথে সাথে ভিলদের নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে সব ব্যবস্থা করতে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রাজা সাহেব বললেন, 'চন্তু যদি গিয়ে থাকে তবে ইংরেজদের সমস্ত সৈন্য এলেও তার ব্যূহ ভেদ করে আমাদের এই গুপ্ত পথে প্রবেশ করতে পারবে না। এই ব্যবস্থা করার পর অবশ্য আমাকে ডেকে না পাঠালেও চলত।' কথাটা শুনে মুহূর্তের মধ্যে মাক্কমের মুখে থেকে যেন রক্তের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গেল। রাজা তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পেরে বললেন, 'ভেবেছিলাম এখানে আসার আগে কৈনেরী যাবো।'

'থাক, সেদিন আর আসবে না আমার জীবনে।' আর কোনো কথা বলতে পারলেন না মাক্কম। রাজার দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির যাতনা তাঁর অন্তরে মহাকল্লোলের মতো শতভঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে গুমরে ফিরতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর মাক্কম বললেন, 'সেখানে এক-একটি দিন যেন এক-একটি যুগ। কতদিন আর এ দুঃখ সহ্য করব?'

'এখানে এলে কত ধরনের দুঃখ কষ্ট যে পোয়াতে হবে তা তোমাকে আগেই বলেছি, মাক্কম। সেখানে এর তুলনায় কষ্ট কত কম! সেখানে কিসের দুঃখ?'

মাক্কম নীরবে কাঁদেন। কী বলবেন, ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

'তুমি ধৈর্যবতী, কান্না তোমার মানায় না।' রাজা বলেন, 'ভগবতী শ্রীপোর্কলী সব দুঃখ দূর করে দেবেন। পাণ্ডবেরা বনবাসে চলে গেলে সুভদ্রা তো ঘরেই ছিল, উর্মিলাও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে যায় নি।'

'উন্নিআম্মার মতো তাদের ঘাড়ের উপর কি কোনো দিদি ছিল?'

'তোমার সঙ্গে কি সে খারাপ ব্যবহার করছে?' উন্নিআম্মার প্রতি ঘৃণা মাক্কমের বুকে যেন বিরাট এক পাথর হয়ে চেপে আছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাক্কম বলেন, 'আমি তোমার কাছে কী করে যে বলি! সব সময় আমাকে কটাক্ষ করে অনর্গল কুৎসিত সব কথা বলে। আমার মুখ দেখলেই তার গা জ্বালা করে। আমি যে তোমার স্ত্রী, তা ভাবতেও যেন তার অসহ্য লাগে। সব সময় তার চোখে ধিকিধিকি জ্বলছে ঈর্ষার আগুন।' বলতে বলতে মাক্কমের চোখ সজল হয়ে ওঠে; আর তা দেখে রাজার মুখমণ্ডলও বেদনায় হয়ে আসে ম্লান।

'চন্তুই হয়তো তার মনে বিষ ঢেলেছে। তা না হলে এরকম সে হতে পারে না। আচ্ছা এর একটা বিহিত আমি অবশ্যই করব। তুমি এসবে দুঃখ পেও না।'

ইতিমধ্যে তলক্কল চন্তু এবং ভিলদের কয়েকজন সর্দার বাইরে এসে দাঁড়ায়। তাদের দেখেই রাজা বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি চন্তু, সে ধরা পড়েছে ?'

'তাঁকে দেখতেও পাই নি। রাত্রেই তাঁর সঙ্গেকার অধিকাংশ সৈনিককে ইহজগৎ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এবং সকাল হতে না হতেই অবশিষ্ট সৈনিকদের নিয়ে তিনি পালিয়েছেন।'

'এক্ষুণি ঐ পথ বন্ধ করা উচিত, কি বল ?'

'তার ব্যবস্থাও করেছি। একটু আঁকাবাঁকা হলেও এই অধম তার চেয়েও দুর্গম অন্য একটি পথ খুঁজে বের করেছে। অনুমতি পেলে সে পথ ঠিক করে রাখতে পারি। চন্তুর জানা সুড়ঙ্গপথের মুখ এখন পাথর চাপা দিয়ে রেখেছি।'

'কাল রাত্রে ওদের কি ভাবে পরাস্ত করলে, কি কি ঘটল বিস্তারিত ভাবে সব বল।'

তলক্কল চন্তু স্বল্পভাষী। নিজের বীরত্বের কথা বর্ণনা করতে তাঁর মন চায় না। রাজার কাছে সংক্ষেপে তিনি যা বললেন, তা নিম্নরূপ।—

মহাদেবীর কাছ থেকে ঐ দুঃসংবাদ পেয়েই তলক্কল চন্তু ভিলদের একত্রিত করে পাহাড়ের চারদিকে এবং সুড়ঙ্গের মুখে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করে। বহু ভিলকে ঐসব স্থানে মোতায়েন করা হয়। শত্রুপক্ষের আগমন তথা তাদের সমস্ত রকমের গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহের জন্যও লোক নিযুক্ত হয়। সন্ধ্যা নাগাদ পয়য়ম পরিবারের চন্তু নায়ার ইংরেজ সৈন্য নিয়ে পাহাড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে এসে পৌঁছান। রাত্রিটা সেখানেই কাটিয়ে সকালে অতর্কিতে সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করে রাজার আস্তানা আক্রমণ করাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। রাত কাটানোর জন্যে সেখানে আস্তানা গাড়ার আগে যুদ্ধনিপুণ চন্তু নায়ার একবার ঘুরে ফিরে আশে পাশে ভালোভাবে দেখে নেন, কোনো ভিল তাঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে কিনা। কিন্তু ভিলদের কাউকেই

তিনি দেখতে পেলেন না। তা সত্ত্বেও অর্ধেক সৈন্যকে তিনি সারারাত সতর্ক প্রহরায় থাকার নির্দেশ দিলেন এবং সাথে সাথে নিজেও তিনি সজাগ হয়ে রইলেন। গাঢ় অন্ধকার রাত, তা সত্ত্বেও চন্তু নায়ার শিবিরে প্রদীপ না জ্বালানোর হুকুম দিলেন। তাঁর ভয়, পাছে ঐ আলো রাজার ভিলদের দৃষ্টিতে পড়ে। চন্তু নায়ার জানতেন, ভিল সর্দার তলক্কল চন্তু এবং রাজা সাহেব মনত্তনায়। তাঁদের অনুপস্থিতিতে ভিলরা নিজেদের বুদ্ধিতে কিছুই করতে পারবে না। সুতরাং জন কতক ভিল এলে নিশ্চয়ই তাদের হটানো যাবে।

নিজের গুপ্তচরদের কাছ থেকে ইংরেজদের কথা, চন্তু নায়ারের আগমন ও অবস্থানের খবর পেয়ে তলক্কল চন্তু সেই রাত্রেই তাদের আক্রমণ করা স্থির করলেন। গাঢ় অন্ধকার রাত্রে ঐ দুর্গম পথ অতিক্রমণ একমাত্র ভিলদের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ লোকের পক্ষে দিনের আলোতেও ঐ পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। যাত্রা শুরু হলো। সামনে রইলেন তলক্কল চন্তু, পিছনে ভিলেরা। রাত্রির শেষ প্রহর। চন্তু নায়ারের শিবিরের কাছে পৌঁছতে তখন আরো দু মাইল পথ বাকি। ভিল সর্দার তলক্কল চন্তুর ইচ্ছা ভোর রাত্রেই ওদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়া। কারণ তখন অর্ধেক সৈন্য থাকবে গাঢ় নিদ্রায় আর অন্যরা সারারাত জেগে পাহারা দেওয়ার ফলে থাকবে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। সুতরাং ঐ দুর্বল মুহূর্তে আক্রমণই হবে সঠিক কাজ।

এর পর সব কিছু পরিকল্পনা মতোই সম্পন্ন হয়। একমাত্র পয়য়ম-বাড়ির চন্তু নায়ার এবং তাঁর চারজন পার্শ্বচর ছাড়া আর কেউই বাঁচতে পারে নি। চন্তু নায়ার ও ঐ চারজন পলায়ন করে, এবং তলক্কল চন্তু ও অন্যান্য ভিলেরা সেখানে পাওয়া নানা সামগ্রী নিয়ে ফিরে আসে পুরলী পাহাড়ে রাজার আস্তানায়।

চন্তু নায়ারের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে রাজার চোখে ফুটে ওঠে তাঁর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা। তাঁর মনের ভিতরে তখনো

যেন আগুন জ্বলছে। আগাগোড়া শোনবার পর কিছুক্ষণ থেমে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভগবতীর কৃপায় ভীষণ বিপদ থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। ভবিষ্যতে আরো সাবধানে অগ্রসর হতে হবে। এডচ্চেন কুংকন কোথায়? তাকে এখানে ডাক তো!'

কুংকন নায়ার নতুন সৈনিকদের যুদ্ধ কৌশল শেখাচ্ছিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজার সামনে এসে করজোড়ে দাঁড়ালেন।

'সব শুনেছ তো? বল এবার কি করা যায়?' রাজা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, সব শুনেছি', কুংকন উত্তরে বললেন, 'খুব ভেবে চিন্তে সতর্কতার সাথে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। পয়য়ম পরিবারের চন্তু নায়ার ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেওয়ায় এখন এ স্থান আর নিরাপদ নয়।'

'আমারও তাই ধারণা। আমি ওয়েলেসলির অভিসন্ধি বেশ বুঝতে পারছি। আমাদের সাথে প্রকাশ্য ময়দানে লড়তে চায় না ইংরেজরা। ওঁদের পরিকল্পনা হচ্ছে, আমাদের সাহায্যকারীদের বিচ্ছিন্ন বা বিনাশ করে, আমাদের রসদ আসার পথ বন্ধ করে দেওয়া এবং তারপর চারদিক ঘিরে ফেলে অবশেষে এই অরণ্যের মধ্যেই জন্তু-জানোয়ারের মতো আমাদের হত্যা করা।'

'তা কি সম্ভব?'

'দেশে তাদের আধিপত্য বাড়লে এসব করা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। এই উদ্দেশ্যেই ওয়েলেসলি সারা দেশে ছোট ছোট দুর্গ বানাচ্ছেন। দুর্গের কাছে যারা বাস করে, আমাদের সাহায্য করতে, তারা সাহস করবে না। ইরুব দেশের নাম্প্যারদের অবস্থা তো জানি আমরা।'

'শুনেছি চুয়লি নাম্প্যারকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার ফলে তারা সব ভয় পেয়ে গেছে।'

'শুধু শহরাঞ্চলেই তাদের মাতব্বরী খাটবে।' তলক্কল চন্তু বলেন, 'আমরা তো এখান থেকেই তাদের উপর আক্রমণ করতে পারি।'

'ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের রসদ ফুরিয়ে গেলে বাঁচব কি করে? কাজেই ভবিষ্যতের প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানতার সঙ্গেই করতে হবে। মনত্তনা থেকে চন্তুর সঙ্গে পাঠানো সেই মহীশূরী সৈন্যরা কোথায়?' রাজা সাহেব জিজ্ঞাসা করেন।

'আমার সঙ্গেই আছে। লোকগুলো খুব হুঁশিয়ার আর বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। বিশেষ করে তাদের মধ্যে একজন সৈনিক মহীশূর রাজপরিবারের। অন্যরা তার সঙ্গে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলে।' কুংকন নায়ার বলেন।

'আমরাও যেন তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখি।' রাজা বললেন, 'তাকে দেখাশোনার জন্য দুজন নায়ারকে নিযুক্ত করবে। স্নান খাওয়া সেরে আমি নিজে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করব।'

'কানাড়ী ভাষা তার জানা আছে। কাল আমরা দুজনে অনেক কথাবার্তা বলেছি। মালয়ালমও সে জানে। আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধা অপরিসীম।'

'দুপুরে আমার কাছে তাকে নিয়ে এসো।'

রাজা সাহেব তাঁকে বিদায় দিলেন। মাক্কমও ইতিমধ্যে স্নান করতে চলে গেছেন। ঐ অবকাশে রাজা সাহেব অর্লাত নাম্প্যারের কানে কানে কী যেন বলে নিজেও স্নান করতে গেলেন। স্নান, পূজা ও খাওয়া-দাওয়া সেরে দেখেন বড়রানী ও মাক্কম বসে আছেন। রাজাকে ভিতরের দিকে আসতে দেখেই তাঁরা কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'মাক্কম দু-চার দিন এখানে থাক, কি বল?'

'না, তাকে আজকে এই মুহূর্তে ফিরে যেতে হবে।'

'কি যে বল বুঝি না। অত তাড়া কিসের? ও না থাকলে তো

এদিকে ফুলের কাছে প্রার্থনা করা হয়, আবার এলে দেখি তাড়াহুড়া করে পাঠিয়ে দিতে পারলে বাঁচ।'

রাজা সামান্য একটু হেসে বললেন, 'কোত্থেকে যে সব ফুলটুল আনছ, বুঝি না।'

মাক্কমের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। থাকার প্রচণ্ড ইচ্ছাকে শান্ত মুখে দমন করে আনত নেত্রে তিনি বলেন, 'দিদি, তুমি ওঁকে বিরক্ত করো না। আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ অখণ্ড এক নিস্তব্ধতা। হঠাৎ কি ভেবে বড়রানী নিষ্ক্রান্ত হলেন সেখান থেকে। রাজা সাহেব ধীরে ধীরে বললেন, 'মাক্কম, দুঃখ করো না আজকেই তোমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে বলে।'

'এতে দুঃখ আমার কিছু নেই। শুধু কষ্ট পাই তুমি এখনো আমায় ভুল বুঝে বসে আছ ভেবে।' বলার সাথে সাথে দুর্নিবার অশ্রুর ঢেউ মাক্কমের কণ্ঠ ভরাট করে আনে, কিন্তু প্রাণপণে তা দমন করে তিনি নীরবে নত মস্তকে বসে থাকেন।

'মাক্কমকে আমি ভুল বুঝেছি! কি রকম শুনি?' রাজা আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মাক্কমের মুখের প্রতি প্রীতিভরা প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে বললেন, 'দিন সাতেকের মধ্যেই কৈনেরী যাবো।' কথাটি শুনেই মাক্কমের মন আনন্দে ভরে যায়।

ক্ষণকাল পরে মাক্কম বললেন, 'আমার স্বামী যখন বনে তখন রাজপ্রাসাদে বসে আমি খোঁপায় ফুল গুঁজছি, এ সব ভাবতে পারলে কি করে?'

রাজা বুঝতে পারলেন ছোটরানীর এই অনুযোগের কারণ। তার জন্য মাক্কমের কাছে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন।

বড়রানী ঘরে প্রবেশ করে বললেন, 'জানো মাক্কম, তাঁর মনে কিন্তু রাত্রিদিন তোমারই স্মৃতির রোমন্থন চলে।'

কুজ্জানীর এই কথা শুনে হয়তো সেই মুহূর্তে মাক্কমের সমস্ত হৃদয় কুজ্জানীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

পালকিবাহকরা উপস্থিত হলে মাক্কম রাজা ও কুজ্জানীর কাছে বিদায় নিয়ে কাম্মুর সঙ্গে রওনা হলেন।

তারপর রাজা রাজকাজে মনোনিবেশ করলেন। কুংকন নায়ার চোক্করায়কে এনে রাজার কাছে হাজির করলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে কানাড়ী ভাষায় কথাবার্তা বললেন। টিপুর মৃত্যুর পর কৃষ্ণরায় পৈত্রিক রাজ্যের শাসক হন। রাজা চোক্করায়ের সঙ্গে মহীশূরের শাসন-ব্যবস্থা, সেখানকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও তৎকালীন কানাড়ী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করলেন। ঐ আলোচনার মাধ্যমে রাজা বুঝতে পারলেন যে চোক্করায় একজন মহান পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ। চোক্করায়ও রাজার পরিচয় আগে থেকেই জানতেন। টিপুর সঙ্গে যুদ্ধকালীন পয়শীর রাজার নাম সারা মহীশূরেও খ্যাতি অর্জন করেছিল। ওয়েলেসলির সৈন্য টিপুকে আক্রমণ করলে একদল মহীশূরী সৈন্য ইংরেজদের কবলে পড়ে। চোক্করায় ঐ দলেরই একজন উপসেনাপতি ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই ওয়েলেসলি চোক্করায়ের রণনিপুণতার পরিচয় পেয়ে তাকে একজন সেনানায়কের পদে উন্নীত করেন।

আলোচনা শেষে রাজা বলেন, 'শুনেছি, ইংরেজ এবং মারাঠিদের মধ্যে একটা জোর লড়াই হবে। তাতে নাকি জয়ী হওয়া ইংরেজদের পক্ষে তত সহজ হবে না।'

'আমিও শুনেছি যুদ্ধ হবে। অতীতে মারাঠারা প্রবল ছিল, এখন তাদের কি অবস্থা জানেন কি?'

মারাঠার তৎকালীন অবস্থা, ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে বিরোধ, এই আভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ গ্রহণের জন্য গভর্নর জেনারেলের ওত পেতে থাকা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে চোক্করায় এবং রাজা সাহেবের

মধ্যে আরো অনেকক্ষণ আলোচনা চলে। হঠাৎ রাজা প্রশ্ন করেন, 'ওদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাধলে ওয়েলেসলিকেও কি কর্তৃপক্ষ ওদিকে নিয়ে যাবে?'

'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

সেদিনের মতো চোক্করায়কে বিদায় দিয়ে রাজা গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

তের

চোক্করায়ের সঙ্গে সেদিনের আলাপ আলোচনার পর থেকে রাজার কার্যকলাপের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপারে হঠাৎ যেন তাঁর অনিচ্ছা প্রকাশ পেতে লাগল। পুরলী পাহাড়ে যুদ্ধের কোনো কথা বিশেষ কারো মুখে শোনা যায় না। তলক্কল চন্তু এবং অধিকাংশ ভিল সেই স্থান ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছে। এডচ্চেন কুংকন প্রত্যেক দিন সকালে রাজার সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু গোপন কথাবার্তাও বলেন। এছাড়া সেখানে কিন্তু যুদ্ধের কোনো প্রস্তুতি দেখা গেল না। এডচ্চেনের সঙ্গে গোপন আলোচনার পর রাজা স্নান করতে যান। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। 'কৃমির বধ'-এর দুই তিনটি পদ রচনা করার পর বড়রানীকে তা পড়িয়ে শোনান। তারপর অর্লাত নাম্প্যারের সঙ্গে কিছুক্ষণ দাবা খেলে বিশ্রামান্তে গোধূলিবেলায় চোক্করায়ের সঙ্গে কানাড়ি ভাষায় আলোচনা করেন। রাত্রে শুরু হয় 'কথাকলি'। এইভাবে পুরলী পাহাড়ের ঐ যুদ্ধ প্রস্তুতির স্থানটি যেন দু-চার দিনের মধ্যেই এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হলো।

কুংকন নায়ারের সঙ্গে রাজার গোপন আলোচনা এবং কন্নবত নাম্প্যারের সঙ্গে তাঁর দেখা করার প্রবল আগ্রহ দেখে মনে হয়, তিনি তাঁর কর্তব্য একেবারে ভুলে যান নি। দু সপ্তাহ আগে কন্নবত

নাম্প্যার মানঞ্চেরির উত্তল কুরুক্কলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। আজ পর্যন্ত সেখানকার কোনো খবর পাওয়া যায় নি। ফলে আশঙ্কিত হয়ে ওঠে রাজার মন। মনে তাঁর প্রশ্ন জাগে, কন্নবত নাম্প্যার এখনো ফিরছে না কেন, তবে কি কোনো বিপদ ঘটল? এমন নায়ারের কাছে তিনি মনের আশঙ্কাগুলি প্রকাশ করেন। এমন নায়ার রাজার অন্যতম সেনাপতি; তাছাড়া তিনি কন্নবতের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। বিশেষ করে এই জন্যেই হয়তো শুধু তাঁর সঙ্গেই রাজা এ বিষয়ে আলোচনা করেন। এমন নায়ারেরও এতে উৎকণ্ঠা কম নয়। অতীতে যে কোনো কাজে বেরিয়ে কন্নবত নাম্প্যার অবিলম্বে রাজার কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দিতেন। এটা ছিল তাঁর কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রমের ফলেই রাজার এই উদ্বিগ্নতা।

রাজা সাহেব নিজের উৎকণ্ঠা আর কারো কাছে প্রকাশ করলেন না। এক সপ্তাহ ধরে তিনি যেন শুধু কথাকলিতেই মেতে রইলেন। ইতিমধ্যে কৈনেরীতে গিয়ে মাক্কমের সঙ্গে দেখা করার নির্দিষ্ট দিনটিও এগিয়ে এলো। এ বিষয়ে একমাত্র বড়রানীই জানতেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর রাজা গোপনে পালকি আনতে বললেন। অন্য কেউ জানল না, রাজা কোথায় যাচ্ছেন। সঙ্গে গেল মাত্র দু-এক জন পার্শ্বচর। পাহাড় থেকে অবতরণ করে তিনি গেলেন কুঞ্জানী মোয়দিনের আস্তানায়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তিনি সেখানে কিছু দেশীয় প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তাঁদের মধ্যে উন্নিমুপ্পনও ছিলেন। আলোচনা চলল অনেকক্ষণ।

রাজা সাহেবের যাত্রার পরক্ষণেই চোক্করায়ও ঐ আস্তানা থেকে গোপনে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন। তাঁর গন্তব্য স্থানের বিষয়ে এডচ্চেন কুংকন ও এমন নায়ার ছাড়া অন্য কেউ কিছু জানল না। তিনি বাড়িতে নয়, গেলেন বয়নাড়ুতে।

রাজার আগমনের দিন মাক্কমের আনন্দের যেন সীমা পরিসীমা ছিল না। রাজার নির্দেশ অনুসারে পুরলী পাহাড় থেকে বিদায়

নিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যার আগে মাক্কম কৈনেরী ফিরে আসেন। সেদিন উন্নিআম্মার দাপট ছিল একটি দর্শনীয় ব্যাপার। বাড়ির সীমানায় পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মাক্কমকে তিনি অকথ্য ভাষায় জর্জরিত করে তোলেন, নানা ধরনের কুৎসিত ইঙ্গিত করে কথা বলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল : কে জানে কোন্ অপরিচিত লোকের কাছে রাত কাটিয়ে এসেছে। গোপন কোনো কাজ না থাকলে গোপনে বেরুবে কেন? কুলের কোনো মান ইজ্জত আর রইল না। এসব দেখার আগে তাঁর মৃত্যু হলে ভালো হতো।—মাক্কমকে এসব কথা উন্নিআম্মা দাসদাসীদের উপস্থিতিতেই বলেন এবং এবিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে ইক্কাট্টান নায়ারও ছুটে আসেন।

ইক্কাট্টান নায়ার গম্ভীরভাবে বলেন, 'ঐ সব বিষয়ে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? তাছাড়া তোমার কথামত সে কি কোনো দিন চলেছে যে অত করে বলছ? তবে হ্যাঁ, আমাদের দিক থেকে বলতে পারি যে, ওকে যদি দূর না করে দাও তো আমাদের বাড়ির কোনো লোক তোমাদের বাড়ির কারো হাতের জলও গ্রহণ করবে না। আমাদের উভয় পরিবারের সম্পর্ক এখানেই ছিন্ন হয়ে যাবে।'

উন্নিআম্মা ঝাঁঝাল গলায় বলেন, 'মামা ঠিক কথাই বলছেন। কে জানে, এই কুলটা মেয়েটা কোথায় গিয়েছিল? আর যাই হোক, আমি আর ওকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেবো না।' মাক্কম এই সব কথায় কান না দিয়ে পালকি থেকে নেবে স্নান করতে যান। তারপর দেবীদর্শন করে সোজা নিজের ঘরে প্রবেশ করেন।

ইক্কাট্টান নায়ার নানা পরামর্শের মধ্যে মাক্কমকে বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়ার ব্যাপারেই বেশী জোর দেন। উন্নিআম্মাও তাঁর উপদেশ কার্যে পরিণত করার আশ্বাস দিলেন বটে কিন্তু কাজটা যে অত সহজ নয়, এমনকি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লে শেষ পর্যন্ত হয়তো তাঁকেই বাড়ি থেকে বেরুতে হতে পারে ভেবে তাঁর মন আশঙ্কিত হয়ে ওঠে।

উন্নিআম্মা জানেন এ বিষয়ে তাঁর ভাই আম্পু নায়ার তাঁকে সাহায্য করা তো দূরের কথা উলটে তার উপরেই দোষ চাপাবেন। অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই উন্নিআম্মা বলেন, 'দাদাও হয়েছে সেই পদের। সব সময় মাক্কমের পক্ষে কথা বলে। সেই জন্যেই তো আরো বেশী করে দিন দিন তার অহঙ্কার বাড়ছে। আর রাজার তো কথাই নেই। উনি তো মাক্কম বলতে অজ্ঞান। কী যে করি?'

'রাজাকে আর বেশী দিন সজ্ঞান থাকতে হবে না।' রাজার উপর একটা ভবিষ্যৎ আক্রমণের ইঙ্গিত করে ইক্কাট্টান নায়ার আরো বলেন, 'আম্পুকেও খুব অল্প দিনের মধ্যেই ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে। সুতরাং তোমাকে অত বেশী ভাবতে হবে না।'

ভাইয়ের ফাঁসি কাঠে ঝোলার কথা শুনে উন্নিআম্মা উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, 'সে কি? দাদার ফাঁসি হবে না-কি-যেন বললেন?'

ইক্কাট্টান নায়ার বুঝতে পারেন, মুখ ফসকে হঠাৎ কী মারাত্মক কথা তিনি বলে ফেলেছেন। তৎক্ষণাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি বলেন, 'আরে না, না, কোথায়? তুমি একেবারে ঘাবড়ে গেলে দেখছি! ওসব হলো ভবিষ্যতের কথা, অনেক পরের ব্যাপার। আচ্ছা, সে সব বিষয়ে তোমার সঙ্গে অন্য সময়ে আলোচনা করব। এখন চলি।' এই বলে তিনি হনহন করে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।

চার পাঁচদিন কেটে গেল তবুও উন্নিআম্মার ক্রোধ এবং গালি-গালাজ কমল না, তাঁকে উপদেশ দিতে ইক্কাট্টান নায়ার প্রত্যেক দিন আসতেন, চন্ত নায়ারকে খবর দিয়ে কিছু একটা করার ফন্দিতে রইলেন তিনি।

এই সমস্ত খবর মাক্কমের কানে যেত। এতে তিনি কিন্তু ক্ষুব্ধ হতেন না বা কাউকে পরোয়াও করতেন না। প্রতিপক্ষ থেকে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখা না দেওয়ায় উন্নিআম্মার রাগ আরো বেড়ে গেল। মাক্কম কোথায় গিয়েছিল সেদিন, জানার জন্য গোপনে তিনি অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক কৌশল খাটিয়ে প্রশ্ন

করবার পরও মাক্কমের কাছ থেকে শুধু এই উত্তর এল, 'জরুরী কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল।'

প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজা সাহেবের আজ কৈনেরী আগমনের দিন। সূর্যাস্তের আর অল্পক্ষণ মাত্র বাকি। জনৈক মুসলমান এসে ছোটরানীর সঙ্গে দেখা করতে চাইল, রাজার কাছ থেকে নাকি কোনো গোপন খবর দিতে এসেছে। মাক্কম ফটক পর্যন্ত গিয়ে রাজার আগমন-সংবাদ শুনে ফিরে এলেন। তিনি এখন মোয়দিনের ওখানে আছেন। রাত্রে কৈনেরী পোঁছবেন।

গোধূলিবেলা। মাক্কমের মন খুব চঞ্চল। দাসদাসীরা তাম্বুল পাত্র প্রভৃতি মেজেঘষে পরিষ্কার ঝকঝকে করে রেখেছে। সন্ধ্যার আগেই ছোটরানী ঘরটাকে গুছিয়ে ঠিকঠাক করে সুগন্ধী ধূপের ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলেন। সুন্দর মোলায়েম কাপড়ে সজ্জিত হলো পালঙ্ক। কোনো কিছুতেই যেন পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। স্নানের পর মাক্কম দামী পোশাক, সুগন্ধী ফুল এবং রত্নখচিত অলঙ্কারে নিজেকে সজ্জিত করে তুললেন।

মাক্কমকে চোখে কাজল পরতে, কপালে কুমকুম দিতে, চুলে ফুল গুঁজতে দেখে উন্নিআম্মার মনে নানা ধরনের সন্দেহ জাগে। তাঁর মনে হয়, মাক্কম বুঝি সেজেগুজে কোনো প্রেমিকের প্রতীক্ষায় রয়েছে। সেই মুসলমানটির সঙ্গে মাক্কমকে ফটকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে এমনিতেই উন্নিআম্মার মনে ঘৃণা ঢুকেছে। এই তো সেদিন মাক্কম কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় চলে গেল। আজ আবার কি কাণ্ড করে বংশের মুখে চুনকালি মাখাবে কে জানে!

উন্নিআম্মা ইক্কাট্টান নায়ারের বাড়িতে ছুটে গিয়ে তাঁকে সবকিছু জানান। ইক্কাট্টান নায়ার উন্নিআম্মাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'শোন, মাক্কম এবং তার প্রণয়ীকে হাতে নাতে ধরতে হবে। এই ভাবে ধরতে পারলে পর তখন তাকে কুলটা বলে বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া যাবে। চন্তুর কাছেও লোক পাঠানো হয়েছে। সেও এলো বলে।'

ইক্কাট্টানের বাড়ি থেকে ফেরার সময় উন্নিআম্মার মুখে বিরাজ করছিল অদ্ভুত এক নির্লিপ্ততার ভাব। মাক্কমকে তিনি কোনো কথাটি বললেন না, তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে মাথা ব্যথার ভান করে শোবার ঘরে চলে গেলেন।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিন রাত্রেও মাক্কম খাওয়া দাওয়া সেরে শোবার ঘরে ঢুকে কেরলবর্মা রচিত রামায়ণ নিয়ে সুর করে পড়তে বসলেন। আজ কিন্তু পড়ায় তাঁর মন আর তেমনভাবে বসছিল না। উৎকণ্ঠা আর উদ্বিগ্নতার ভিতর দিয়ে যেন তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত কাটতে লাগল। রাজার চিন্তাই তাঁর সমগ্র মনকে আচ্ছন্ন করে রইল। ঘুম বুঝি আজ আর কোনোক্রমেই আসবে না। অন্য দিকে উন্নিআম্মারও চোখে ঘুম নেই। তিনি আড়িপেতে বসে আছেন বাইরে কারো পদশব্দ শোনার জন্য, মাক্কমের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলেই সব ব্যবস্থা করবেন, এই আশায়। আজ আর মাক্কমকে হাতে নাতে না ধরে ছাড়বেন না।

প্রাসাদের বারান্দায় চাটাই পেতে কাম্মু গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। রাতের প্রথম প্রহর কেটে গেল। একজন মাত্র অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে রাজা ঘরের আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে তিনি মাক্কমের সুর করে রামায়ণ পড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। পদশব্দ শুনে মাক্কম পড়া বন্ধ করে কান পেতে শুনে বুঝতে পারলেন, রাজা এসেছেন। তাড়াতাড়ি তিনি দরজা খুললেন। বাইরে চটিজুতা খুলে রেখে রাজা সাহেব ভিতরে প্রবেশ করলেন।

বাইরের ঐ পদশব্দ এবং মাক্কমের দরজা খোলার আওয়াজ শুনে উন্নিআম্মা বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দরজা খুলে একটি চাকরকে ডাকলেন। তাকে দিয়ে ইক্কাট্টান নায়ারের কাছে এই বলে খবর পাঠালেন যে, প্রতীক্ষা সফল হয়েছে। চাকরটি ঐ খবর নিয়ে নায়ারের ঘরে ঢুকে দেখে, পয়য়ম পরিবারের চন্তুর উপস্থিতিতে সেখানে 'শক্তিপূজার' তোড়জোড় চলছে, কারণের

গন্ধে সারাটা ঘর ভরে গেছে। খবর শুনে তাঁরা বললেন, 'আচ্ছা আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি, তুই যা।' চাকরটাকে পাঠিয়ে দিয়ে তুজনে তুটো বোতল খুলে নিলেন।

মাক্কমের এই ব্যাপারটি চন্তুর পক্ষে বড় ধরনের একটি সুযোগ। এই ধরনের নীচু কাজে লিপ্ত মাক্কমকে হাতেনাতে ধরতে পারলে দেশবাসীর কাছে ছোটরানী এবং রাজাকে সহজেই হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে। তাছাড়া তাঁর মনে হলো যে এই অপরাধে মাক্কমকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি এক সঙ্গে তুই শত্রু আম্পু এবং রাজাকে. অপমান করতে পারবেন। অথচ অন্যান্যদের নিয়ে সেখানে যাওয়া কিন্তু ইক্কাট্টান নায়ারের ইচ্ছা নয়। এভাবে লোক জড়ো করার ব্যাপারে তিনি বাধা দিলেন। কারণ তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে এই ভাবে লোক জানাজানি হলে চিরকালের জন্য তাঁদের বংশ কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। কিন্তু চন্তু নায়ার এবং তাঁর স্ত্রীর মতের কাছে ইক্কাট্টান নায়ারের শেষ পর্যন্ত হার মানতে হলো। তারা এলে মশাল নিয়ে চন্তুর নেতৃত্বে তারা সব বেরুল। তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। রাজা সাহেব গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

'এঁদের সঙ্গে আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?' গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করল।

'চুপ করো। এক্ষুণি সব বুঝতে পারবে।' চন্তু জবাব দিলেন।

হঠাৎ কাম্মুর ঘুম ভেঙে যায়। লোকের ভিড় এবং মশাল দেখে সে রীতিমত ঘাবড়ে যায়। তার উপর আবার তাদের মধ্যে চন্তু এবং ইক্কাট্টান নায়ারকে দেখে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে রানীকে কোনো বিপদে ফেলার জন্যই তাঁরা এসেছেন। নিমেষে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে কাম্মু দৃঢ়তার সঙ্গে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চন্তু সবাইকে আঙিনায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। উন্নিআম্মা দরজা খুলে দিতে তিনি ভিতরে ঢুকে সঠিক খবর নিয়ে বেরিয়ে

এলেন। তারপর গ্রামবাসীদের সামনে এসে তাদের বুঝিয়ে বললেন যে, ছোটরানী ভ্রষ্টা রমণী। রাজা তো থাকেন সেই পাহাড়ে। অথচ সপ্তাহখানেক আগে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় বেরিয়ে যান। আজও আবার চুপি চুপি তার ঘরে এসে কে একজন যেন ঢুকেছে। এই ধরনের কেলেঙ্কারী গাঁয়ের সকলের পক্ষেই অপমান-জনক। বাড়িতে যখন পুরুষ মানুষ কেউ নেই তখন আত্মীয় হিসাবে তাঁর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, এই ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ মাক্কমকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। গাঁয়ের লোকেরা সবাই তাঁর কথায় সায় দিল। চন্তু তখন দালানে ঢুকে মাক্কমকে দরজা খুলতে আদেশ করবার জন্য এগুতেই সঙ্গে সঙ্গে কাম্মু তরবারি তুলে তাঁর পথ রোধ করে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় এগোচ্ছেন?'

'সরে যা, কুকুর কোথাকার। আমার পথ রোখার তুই কে?' এক অট্টহাসি হেসে চন্তু তাঁর তলোয়ার খুলে কাম্মুর তরবারি প্রতিরোধ করলেন।

বারান্দায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ সুবিধাজনক ছিল না। কাজেই দুজনে আঙিনায় এলেন। ইতিমধ্যে রাজার সঙ্গে আগত অনুচরটিও সরজমিনে পৌঁছে যায়। বাইরের কোলাহল শুনে রাজা ও ছোটরানী জেগে ওঠেন এবং মাক্কম হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। কণ্ঠস্বরে তিনি বুঝতে পারেন যে বাইরের ভীড়ের মধ্যে ইক্কাট্টান নায়ার এবং চন্তুও আছেন। তাঁর আশঙ্কা হলো নিশ্চয়ই রাজাকে হত্যা করার জন্যই ওঁরা লোকজন নিয়ে এসেছেন। বাইরে নিজের লোক বলতে কাম্মু এবং রাজার অনুচরটি ছাড়া আর কেউ যে নেই, সে কথা মনে পড়তেই ছোটরানীর মন আরো আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এমন দুর্বল মুহূর্তে রাজাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে তারা যে কোনো ক্রমেই তাঁকে ছাড়বেন না এ বিষয়ে ছোটরানী নিশ্চিত। এমন কি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতেও তাঁরা ইতস্তত করবেন না, তাও মাক্কম জানেন। প্রার্থনার মতো সকরুণ স্বরে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'হে ভগবতী

শ্রীপোর্কলী, রাজাকে বাঁচাও। আমার জন্যেই তিনি এসেছেন, তাঁর আজকের এই বিপদের জন্যে আমিই যে দায়ী।'

রাজা সাহেবের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তিনিও বুঝতে পারেন, শত্রুরা বাড়ি ঘেরাও করেছে। তাঁর ধারণা, এত লোক জমা হয়েছে তাঁকে বন্দী করার জন্যই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অবস্থায় ঘরের ভিতরে হাত গুটিয়ে বসে থাকাও কাপুরুষতার পরিচায়ক। তাই দেবীকে স্মরণ করে হাতে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে দরজা খুলে তিনি বেরিয়ে এলেন।

চন্তু এবং কাম্মুর মধ্যে লড়াই তখনো চলছে। তলোয়ার চালনায় চন্তুর দক্ষতা কারো অজানা নয়। অপর পক্ষে আখড়ার শিক্ষা সমাপ্ত হলেও বাস্তবক্ষেত্রে কাম্মুর অভিজ্ঞতা ছিল না। এ বিষয়ে ঐ ত্বজনের মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। তা সত্ত্বেও মৃত্যুর পরোয়া না করে সাহসে বুক বেঁধে লড়তে থাকে কাম্মু। তার সঙ্গে লড়াই করা চন্তুর কাছে যেন ছেলেখেলার সামিল। ঠিক এই রকম এক চরম মুহূর্তে রাজা সাহেব মাক্কমের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'কী ব্যাপার চন্তু ?' গম্ভীর স্বরে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন। রাজার ঐ সুপরিচিত কণ্ঠ শোনার সঙ্গে সঙ্গে চন্তুর মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এলো, 'যাই হুজুর।' পরক্ষণে চন্তু নিজের কথায় যেন নিজেই চমকে উঠলেন, দেখতে পেলেন রাজাকে। সাথে সাথে তাঁর কবজির জোরও যেন কমে এলো। ঠিক সেই মুহূর্তে কাম্মুর আক্রমণের ফলে তাঁর হাত থেকে তলোয়ার পড়ল ছিটকে।

'এ কি ! এ যে স্বয়ং রাজা সাহেব ?' সমবেত সকলে সমস্বরে বলে উঠল। যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা পিছিয়ে গেল। ইক্কাট্টান নায়ার বেগতিক অবস্থা দেখে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। তাঁর উপস্থিতির যেন এখন আর কোনো প্রয়োজন নেই।

একদিকে সমবেত লোকের শ্রদ্ধা আর অন্যদিকে চন্তুর বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থা দেখে রাজা সাহেবের সন্দেহ হলো, কোথায় যেন একটি ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আঙিনায় নেমে এলেন। সেই

মুহূর্তে ডাইনে বাঁয়ে এবং পেছনের দিকে দেখে নিয়ে চন্তু হঠাৎ সেখান থেকে ছুটে পালানোর চেষ্টা করতেই সমবেতদের মধ্যে একজন 'এই শয়তানটাকে যেতে দেবো না। লোকটা আমাদের ভুল বুঝিয়েছে!' বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠে মুহূর্তের মধ্যে চন্তুকে ধরে ফেলল।

গ্রামবাসীদের দিকে ঘুরে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রাত্রে সব মশাল নিয়ে বেরিয়েছ কেন?' গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে মোড়ল-গোছের একজন জবাব দিল, 'হুজুর এই লোকটা আমাদের ভুল বুঝিয়েছে।' লজ্জায় এবং সংকোচে সে আর কিছু বলতে পারল না।

'ব্যাপার কি, নিঃসংকোচে আমাকে খুলে বলো।'

'এই লোকটা হুজুর আমাদের কাছে গিয়ে বলে যে, ছোটরানী নাকি এমন সব কাজ করছেন যাতে আপনার, রাজবংশের, তথা দেশের অপমান হবে। হাতে নাতে আজ ছোটরানীকে ধরে আপনার কাছে খবর দিতে হবে বলে এই লোকটা আমাদের ডেকে এনেছে?'

রাজা সাহেব চন্তুর দিকে তাকালেন। চন্তুর তখনকার অবস্থা বর্ণনাতীত। স্বয়ং রাজাকেই মাক্কমের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা ছিল না। রাজা যে এই ভাবে নির্ভয়ে একাকী বেরুবেন, তা চন্তুর কাছে কল্পনারও অতীত। এই ঘটনার ফলে মাক্কমকে অপমান করা তো দূরের কথা এখন উলটে অবিচল রাজভক্ত প্রজাদের কাছে তাঁর নিজেরই জীবন বিপন্ন। অথচ এখন নিজেকে বাঁচানোর কোনো উপায়ও তিনি দেখতে পেলেন না। রাজার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে মানে মানে এখন সেখান থেকে সরে পড়বেন, না দৃঢতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হবেন— কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু এই কথাই ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ চন্তু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, যেন এখন তিনি পৃথিবীর কোনো শক্তিকে আর ভয় পান না। নির্ভীক সদর্প কণ্ঠে তিনি বললেন 'আমি পালাতে চাই না। মৃত্যুকেও আমি ভয় করি না। আজ হোক কাল হোক একদিন ফাঁসিকাঠে

ঝুলতে হবেই, হয় আমাকে, নয় অন্য কাউকে।' তাঁর কণ্ঠস্বরে ও ধৃষ্টতায় রাজার মন সাময়িকভাবে জ্বলে উঠল। কিন্তু চন্তুর কথায় তিনি গুরুত্ব দিলেন না।

লোকজনবেষ্টিত নিরস্ত্র এই রাজদ্রোহীর অহঙ্কার দেখে কাম্মু নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না। তৎক্ষণাৎ সে গিয়ে চন্তুর হাত ধরে সজোরে এক নাড়া দিল।

চন্তু আবার হেসে উঠে এক ধাক্কায় তাকে দূরে হটিয়ে দিতে কাম্মু অদূরে ছিটকে পড়ল।

চন্তু বুঝতে পারলেন যে তাঁব এই ধৃষ্টতায় রাজার মনে ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠেছে। তা না হলে তাঁব চোখের দৃষ্টি ঐ রকম ভয়াল হয়ে উঠত না।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে রাজা সাহেব বললেন, 'হীনের রক্তে আমি কখনো নিজের তলোয়ার অপবিত্র করি না। যে হাতে তোমাকে লালনপালন করেছি, সেই হাতেই আবার তোমাকে হত্যা করতে পারব না। সুতরাং তোমাকে মুক্তি দিলাম। পুনরায় আর কোনো দিন এখানে পা দিও না।'

উন্নিআম্মা এতক্ষণ আড়ি পেতে সব শুনছিলেন, এখন বেরিয়ে এসে বললেন, 'আমিও তাহলে চলে যাচ্ছি। ভিক্ষে করতে হয় তাও ভালো, তবুও আর এক মুহূর্তও আমি এ বাড়িতে থাকব না।'

'তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। আজ থেকে এ বাড়ির দেখা-শুনার ভার রইল গ্রামবাসীদের উপর। তারাই এর দায়িত্ব নেবে।'

এ কথা শুনে গাঁয়ের মাতব্বররা এগিয়ে এসে রাজার কাছে শপথ করল, জীবন দিয়েও তারা তাঁর নির্দেশ পালন করবে।

চন্তু নায়ার এবং উন্নিআম্মা সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইক্কাট্টান নায়ারের বাড়িতে উঠলেন।

একে একে অন্যান্যরাও যে যার বাড়িতে চলে গেল। রাজা মাক্কমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কালমাত্র বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে রওনা হলেন।

চৌদ্দ

তলশেরী থেকে চন্দ্রোত নাম্প্যারের সঙ্গে বেরিয়ে উন্নি যেন এক নতুন জীবন পেলো। আম্পু নায়ারের জন্য যে কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে সে প্রস্তুত থাকলেও এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের নানা দুশ্চিন্তা তাকে পীড়িত করছিল। এক অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটছিল তার দিনগুলো। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রোতবাবু নিজেই যখন তাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে এলেন তখন তার অতীতের সমস্ত দুঃখকষ্ট যেন স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

উন্নি সম্পর্কে চন্দ্রোত নাম্প্যার বেশী কিছু জানতেন না। পথে তাদের সঙ্গে আম্পুর কি ভাবে পরিচয় হয়, সে সম্পর্কে একটু-আধটু খবরই শুধু জানতেন। ফেরার পথে কয়েকটি প্রশ্ন করে উন্নি সম্পর্কে তিনি আরো কিছু জানতে পারেন। তারপর সস্নেহে বলেন, 'ইংরেজদের কবল থেকে আমি নই, আম্পু নায়ারই তোমাকে উদ্ধার করেছে। চিরুতাক্কুট্টি আম্পুর কথাতেই সুপারভাইসারকে তোমার মুক্তির জন্য নানাভাবে অনুরোধ করে। আম্পু আমার বন্ধু। সেই খাতিরেই কাজটাকে কিছুটা এগিয়ে দেওয়ার ভার নিয়েছি মাত্র। এতে আমার বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব নেই।'

উন্নি নম্রমুখে সমস্ত কিছু শুনল, বলল না কিছুই। তার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বিনয়ী শিষ্টাচারে চন্দ্রোত নাম্প্যার মুগ্ধ হলেন, বললেন, 'আমি লোক পাঠিয়ে আম্পুকে ডেকে পাঠিয়েছি। খবর পেলেই সে চলে আসবে এখানে। আর তোমাকে বলে রাখছি, আজ থেকে

তোমার জন্য এ বাড়ির দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে।' তারপর তিনি বাড়ির সকলের সঙ্গে উন্নির পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এ ছাড়া উন্নি নিজের মামা, মামিমা, অন্যান্য আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও খুব ভালো ব্যবহার পেলো।

ওদিকে মেজর হোম্‌সের সঙ্গে যুদ্ধের পর আম্পু নায়ার পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরছিলেন। সেই সময় আশঙ্কাজনক একটি কথা তার কানে আসে। তিনি শুনতে পান যে রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী কন্নবত শঙ্কর নাম্প্যার ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েছে। কন্নবত নাম্প্যার নাকি উত্তল কুরুক্কলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে কোজিক্কোড়ের নিকটবর্তী একটি গ্রামে তাঁকে রাত্রি অতিবাহিত করতে হয়। তাঁর এই অবস্থানের সংবাদ সাথে সাথে ইংরেজদের কানে পৌঁছে যায় গুপ্তচরের মাধ্যমে। তৎক্ষণাৎ তারা শঙ্কর নাম্প্যার ও তাঁর দুইজন ভাগনেকে ঘিরে ফেলে। ছোটখাট একটা খণ্ডযুদ্ধ হয় বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাম্প্যারকে পরাজয় বরণ করতে হয়। সংবাদটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার সত্যতা নিরূপণের জন্য আম্পু নায়ার কোজিক্কোড়ের দিকে রওনা হয়ে যান।

কন্নবত নাম্প্যারের পরাজয়ের কথা শুনে ওয়েলেসলির মন কিন্তু খুব আনন্দিত হয়ে ওঠে। রাজার অন্যতম প্রধান কর্মচারীর পরাজয় বরণ তাঁর কাছে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নাম্প্যারের এই পরাজয়ের মধ্যেই যেন তিনি তাঁর নিজের পরিকল্পনার সাফল্যের অঙ্কুর দেখতে পেলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল রাজার প্রধান প্রধান সহায়কদের দুর্বলতম মুহূর্তে আক্রমণ করা, প্রয়োজনবোধে তাদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো এবং সর্বোপরি তাদের সম্পত্তি হস্তগত করা। কিন্তু ওয়েলেসলি নায়ারদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি জানতেন যে নায়ারদের দেশপ্রেম প্রশ্নাতীত।

তাই তাদের মনে গভীর এক ভয়ের সঞ্চার করার জন্যই তিনি উপরোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

এরপর দোভাষী এবং চন্তুর সঙ্গে তাঁর যে আলাপ-আলোচনা হয়, সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ।

'দেশীয় সামন্ত প্রভৃতিদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো একটি নীতিবিরুদ্ধ কাজ।' দোভাষী বলেন, 'আমার নিশ্চিত ধারণা, এই ধরনের ঘটনার ফলে নায়াররা ভয় করা তো দূরের কথা, বরং বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসবে।'

'ঐ ধরনের কিছু হওয়ার আশঙ্কা নেই।' ওয়েলেসলি বলেন, 'সবাই বশে আসবে। দু-একজন পাণ্ডাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলালে অন্যরা ভয় পাবেই। শুধু সতর্ক থাকতে হবে যাতে ফাঁসি দেওয়ার আগে কোনোক্রমেই খবরটা ছড়িয়ে না পড়ে।'

'চুয়লি নাম্প্যারকে বন্দী করার ফলে অন্যরা বেশ কিছুটা ভয় পেয়েছে।' চন্তু নায়ার বলেন, 'তার উপর কন্নবত নাম্প্যারকে ফাঁসি দিয়ে তাঁর সম্পত্তি আমাদের সাহায্যকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে তার একটি ভালো প্রতিক্রিয়া হবে। তারা আর কোনোদিন রাজার সঙ্গে আঁতাত করবে না।'

কন্নবত নাম্প্যারের এবং চন্তুর মধ্যে বিরোধ দীর্ঘদিনের। কন্নবত চন্তুকে বিশেষ আমল দিতেন না। তাই দীর্ঘদিনের সেই অবজ্ঞার চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য চন্তু কন্নবতকে ফাঁসি দেওয়ার এবং তাঁর সম্পত্তি হস্তগত করার উপদেশ বা পরামর্শ দিলেন।

দোভাষীর মাধ্যমে ওয়েলেসলি চন্তুর বক্তব্য শুনে নিজের মনে ভালোমতো অনুধাবন করে বললেন, 'নাম্প্যারের সম্পত্তি আমাদের সাহায্যকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার প্রস্তাব পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে। এখন অবিলম্বে একটি সৈন্যদল গোপনে পাঠিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করতে হবে।'

জরুরী এই নির্দেশ নিয়ে তারা চলে গেলে ওয়েলেসলি গভীর

চিন্তামগ্ন অবস্থায় বহুক্ষণ ধরে বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলেন। সেদিনই তাঁর কাছে কলকাতা থেকে গভর্নর জেনারেলের দুটি চিঠি এলো। তার মধ্যে একটি কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল হিসাবে লেখা এবং অপরটি সহোদর হিসাবে। প্রথমটিতে গভর্নর হিসাবে তিনি ওয়েলেসলির যুদ্ধকৌশলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সেদিন পর্যন্ত ওয়েলেসলি যতরকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, চিঠিতে তার প্রত্যেকটিকে সমর্থন করে তাদের ভবিষ্যৎ সফলতা সম্পর্কে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় চিঠিটি ব্যক্তিগত। তাতে কিন্তু সুর অন্যরকমের। তার মূল ব্যক্তব্য হলো: দীর্ঘ চারমাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা গেল না। ফলে বোম্বাই এবং মাদ্রাজে গভর্নর জেনারেল বিরোধী পক্ষের লোকেরা সবাই যা-তা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া অধুনা লণ্ডন থেকে আসা বিভিন্ন নির্দেশের সুরও যাচ্ছে বদলে। অতএব দুই ভাইয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অবিলম্বে ইংরেজদের বিজয় ঘোষণা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যতে ইংরেজ এবং মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধের যে সম্ভাবনা আছে, তাতে সেনাপতিত্বের জন্য ওয়েলেসলির নাম সুপারিশ করে লণ্ডনস্থ কর্তাদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে কিন্তু সেখানেও ঐ সুপারিশের বিরোধিতা করার মতো লোকের অভাব নেই। সুতরাং অবিলম্বে পয়শীর রাজা কেরলবর্মার পরাজয় ঘোষণা হওয়া প্রয়োজন।

গভর্নর জেনারেল মার্কুইস ওয়েলেসলির দৃঢ়বদ্ধ ধারণা ছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হবে তাঁরই পরিবারের লোক। তিনি যে নিজের এই ধারণার সফল রূপায়ণের জন্য নিজের ভাই ও আত্মীয় স্বজনদের বড় বড় পদে নিয়োগ করতেন এবং তার জন্য প্রয়োজনবোধে যে কোনো অন্যায় অত্যাচার করতে দ্বিধা বোধ করতেন না, সে কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। তিনি আগে থেকেই স্থির করেছিলেন যে মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হলে তার সেনাপতিত্ব করবে নিজের ভাই কর্নেল ওয়েলেসলি। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে সিন্ধিয়া

এবং হোলকারের নীতির ফলে যুদ্ধ অনিবার্য এবং এই যুদ্ধের উপরই নির্ভর করছে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। অতীতে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইংরেজদের পরাজয় বরণ করতে হয়। এবারে জয় নিশ্চিত করে তোলার জন্য গভর্নর জেনারেল বিশেষ এক পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি পেশোয়াকে সিন্ধিয়া এবং হোলকারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমঝওতার মাধ্যমে নিজেদের পক্ষে আনলেন। মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্যতম শাসক গায়কওয়াড়কেও ভীতি প্রদর্শন করে এবং ধমক দিয়ে আনলেন নিজের পক্ষে। শুধু সিন্ধিয়া এবং হোলকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত রইল। তাঁদের দুজনের মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টির জন্য গভর্নর জেনারেল কূট-কচালের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

মার্কুইস ওয়েলেসলির দৃঢ় ধারণা ছিল যে শুধু সিন্ধিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করলে ইংরেজদের জয় অবশ্যম্ভাবী। এইভাবে একবার জয়লাভ করতে পারলে তিনি এবং তাঁর ভাই ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য হবেন।

কর্নেল ওয়েলেসলিরও মনোবাঞ্ছা ছিল তাই। কিন্তু এত অল্প দিনের মধ্যে পয়শীর রাজাকে পরাজিত করার কোনো পন্থা তিনি দেখতে পান নি। ঠিক এমনি এক বিশেষ মুহূর্তে পেলেন কন্নবত নাম্প্যারের গ্রেপ্তার-সংবাদ। রাজার একজন প্রধান কর্মচারীকে ধরতে পারা এই সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য মনে করে তিনি কালমাত্র বিলম্ব না করে ভায়ের কাছে পত্র মারফত সংবাদটি জানিয়ে দিলেন। কন্নবত জায়গাটি ছিল বিদ্রোহীদের এক আস্তানা। সেই খানেই রাজার এই কর্মচারীকে ফাঁসি দিলে রাজা সাহেব যে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, সে কথা প্রজারা সহজেই বিশ্বাস করবে। এতে রাজার খুব ক্ষতি হবে এবং জনতার মনে ভীষণ এক ভীতির সঞ্চার হবে।

ওয়েলেসলি এ কথা তলশেরীর অন্যান্যদের কাছে গোপন করে গেলেন। দুদিন পরে বন্দী নাম্প্যারকে খুব ঘটা করে তলশেরীতে

আনা হলো। তার আগে বেবরও সে কথা জানতেন না। মূসা মারাক্কারের এক বাংলোয় নাম্প্যারকে সাদরে রাখা হলো। দ্বিতীয় দিনে ওয়েলেসলি শত্রুপক্ষের ঐ সেনাপতিকে সাদরে স্বাগত জানালেন। কর্নেলের পরিধানে ছিল ইউনিফর্ম। বুকে চকচক করছিল কয়েকটি তকমা আর কোমরে ছিল কোম্পানীর পুরস্কৃত রত্ন-খচিত হাতলযুক্ত তরবারি। এইসব পরে এলেন তিনি নাম্প্যারকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে। অপরপক্ষে কন্নবত নাম্প্যারও তৎকালীন আচার অনুযায়ী ছিলেন সুসজ্জিত। ললাটে স্নানান্তে চন্দনের ফোঁটা, দু হাতে বীরের কঙ্কন, পরিধানে রেশমবস্ত্র। ওয়েলেসলির অভিবাদনের পর কন্নবতও তাঁকে প্রত্যভিবাদন জানান। তারপর মুখোমুখি বসে দুজনের মধ্যে নিম্নরূপ বাদানুবাদ চলে।

কর্নেল জিজ্ঞাসা করেন, 'কেরলবর্মা কুশলে আছেন তো ?'

'আমার মনে হয়, তিনি কুশলেই আছেন।' কন্নবত নাম্প্যার উত্তর দেন।

'আমার ধারণা তিনি খুব বুদ্ধিমান, সচেতন এবং বীরপুরুষ। অথচ এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি যে কেন কোম্পানীর বিরোধিতা করছেন আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তিনি কি কোম্পানীর শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন ?'

'নিশ্চয়ই ওয়াকিফহাল। শুধু তাই নয়, তিনি এও জানেন যে কোম্পানী রাজা এবং নবাবদের পরাজিত করে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। টিপুকে পরাজিত করার পেছনে আপনার নিজের কৌশল যে কতখানি ছিল তাও তিনি জানেন।'

'সবই যখন জানেন, তখন আর তিনি কেন অবিবেচকের মতো এমন অসম্ভব একটা কাজের মধ্যে প্রবেশ করছেন। এর ফলে দেশে সর্বনাশ হবে যে। দেশবাসীর সঙ্কট যাবে আরো বেড়ে।'

'হয়তো বাড়বে, কিন্তু তার জন্যে দায়ী কে ?'

'নিশ্চয় তিনিই দায়ী। কোম্পানী টিপুর সঙ্গে যুদ্ধ করে এই

দেশ জয় করে নিয়েছে। এখানকার সমস্ত সম্পদ এখন কোম্পানীর হাতে। এমতাবস্থায় রাজা কোম্পানীকে সাহায্য করলে কী আর দেশের উন্নতি হতো না?'

'কোম্পানীর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে তিনি প্রস্তুত, কিন্তু দেশের স্বাধীনতার সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। জীবন থাকতে তিনি তা করতে পারবেন না।'

কর্নেল ওয়েলেসলি চটে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু এর পরিণাম কি হবে জানেন? আজ না হোক কাল কোম্পানী রাজার সমস্ত শক্তিকে চুরমার করে দেবে। আমি ভবিষ্যতে বিদ্রোহীদের আর কোনোরকম দয়া না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। যাদের বন্দী করতে পারব, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ফাঁসি দেবো। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করব। ফলে তাদের স্ত্রী-পুত্রদের পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। আজ যারা পাহাড়ে আস্তানা গেড়ে আছে তাদেরও রসদের অভাবে মরতে হবে। তাই বলছি, এখনো সমগ্র ব্যাপারটা একবার বিবেচনা করে দেখা উচিত।'

'এতে বিবেচনা করে দেখার মতো কিছু নেই। মহামান্য রাজা সাহেব এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সচেতন। তিনি এবং তাঁর সহগামীরা এসব সহ্য করতে প্রস্তুত। জীবন থাকতে তিনি কেরলের স্বাধীনতা বিনষ্ট হতে দেবেন না। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আপনাদের সাথে তাঁর কোনো মতবিরোধ নেই। সুতরাং বন্দীদের ফাঁসি দিন, তাদের সম্পত্তি জব্দ করুন—আপনার যা খুশি করতে পারেন, আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও দেশের স্বাধীনতার জন্য সমস্ত কিছু সহ্য করব।'

দুঃসাহসিক কথা শুনে কর্নেলের মনে বিদ্রোহীর প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। তিনি কথার সুর বদলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রাজাকে বশে আনার কথা চিন্তা করেন। দু-এক মাসের মধ্যেই তাঁকে এখান থেকে ফিরে যেতে হবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে রাজাকে বলপ্রয়োগ করে

বশে আনা সম্ভব নয়। তাই তিনি ছল এবং কৌশলের পথ গ্রহণ করবার বিষয়ে চিন্তা করেন। এ বিষয়ে কন্নবত নাম্প্যারকে কাজে লাগিয়ে কোনোরকমে সামান্য একটু সাফল্য লাভ করতে পারলেই তিনি তৎক্ষণাৎ জয় ঘোষণা করে ফিরে যাবেন। এতে যদি নাম্প্যার রাজী না হন তাহলে তাকে ফাঁসি দিয়ে প্রচার করবেন যে শত্রুর মেরুদণ্ড তিনি ভেঙে দিয়েছেন।

এই সাহসী পুরুষটিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কবতে কর্নেলের মন ততখানি না চাইলেও নিজের ভবিষ্যতের সাফল্যের পথ সুগম করবার জন্য তিনি এই পন্থা অনিবার্য মনে করলেন।

তারপর উভয় সেনাপতি পরস্পরের কাছে বিদায় নিলেন।

কন্নবত নাম্প্যার বুঝলেন যে তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে আচরণে কোনোরকম বিমর্ষতার ভাব দেখা গেল না। অথচ ওয়েলেসলি তাঁকে নিয়ে যে কি করতে চান, তাও তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ পরের দিন ভোরের আগেই রাজার কাছে পৌঁছে যাবে এবং তখন রাজা সাহেব তাঁকে মুক্ত করার ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। ওয়েলেসলি খুব তাড়াতাড়ি কিছু করবেন না। কমপক্ষে চার-পাঁচ দিন তাঁকে আটক করে রাখা হবে। তারপর নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে হয় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে, নয়তো তাঁর সম্পর্কে অন্য কিছু করা হবে। তলশেরীর অন্যান্যদেরও মনে ছিল সেই ধারণা।

নাম্প্যারের জন্য সুসজ্জিত একটি ঘর ছেড়ে দেওয়া হলো। স্বয়ং ওয়েলেসলি তাঁকে সসম্মানে দেখাশোনা করতে লাগলেন। এইসব দেখেশুনে তলশেরীর সিভিল অফিসার এবং অন্যান্যদের মনে উপরোক্ত ধারণা হলো। সন্ধ্যার সময় নানা ধরনের ফল এবং সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে কন্নবত নাম্প্যারের কাছে যারা এলো, তাদের বন্দী করা হলো। ফলে নাম্প্যার মনে করলেন, বুঝি চিরতাক্কুট্টিই এসব পাঠিয়েছে।

নিজের কৌশল অন্যের কাছে দুর্বোধ্য করে তোলার জন্য ওয়েলেসলি স্বয়ং এই সব ব্যবস্থা করাতে লাগলেন। রাত্রের আহারান্তে নাম্প্যার পান খাচ্ছিলেন এমন সময় কর্নেলের নির্দেশে দোভাষী এসে তাঁকে বললেন, 'আপনাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? চলুন আমরা কন্নবতে যাই। ভয় নেই, আমাদের সঙ্গে অনুচররাও থাকবে।'

কথাটা নাম্প্যারের কাছে ভালো লাগল না। কিন্তু তবু তিনি কোনো কিছু না বলে দোভাষীকে অনুসরণ করলেন।

* * *

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকে একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখল। কন্নবত নাম্প্যারের বাড়ির আঙিনায় ফাঁসিকাঠে ঝুলছে তিনটি মানুষ—কন্নবত শঙ্কর নাম্প্যার এবং তাঁর দুজন ভাগনে। কোম্পানীর সৈনিকরা তখন বন্দুক হাতে শহরের প্রধান প্রধান রাজপথে টহল দিচ্ছিল।

পনর

কন্নবত নাম্প্যারের গ্রেপ্তার-সংবাদ নিয়ে তলশেরী থেকে পুরলী পাহাড়ে রাজার কাছে লোক এলো। রাজা ঠিক সেদিনিই কৈনেরী চলে গিয়েছিলেন, সংবাদদাতার উপর নির্দেশ ছিল কেবলমাত্র রাজাকেই ঐ খবর দেওয়ার। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে দূত কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ে। পরের দিন দুপুরে রাজা কৈনেরী থেকে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বড়রানী তাঁকে তলশেরী থেকে কন্নবত নাম্প্যারের লোকের আগমন সংবাদ জানালেন। দূতকে ডেকে তার সাথে দু-এক কথা বলবার পরেই রাজা সাহেব কেমন যেন পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে পড়লেন। এতখানি বিহ্বল-বিমূঢ় অবস্থায় বড়রানী তাঁকে আগে আর কোনোদিন দেখেন নি। তাই তিনি অনুমান করলেন ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ ঘটেছে বলে। তিনি স্বামীর হাত ধরে তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

'কি হলো, কি বিপদ ঘটল আবার?' বড়রানী জিজ্ঞাসা করেন।

রাজা কোনো কথা বললেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি এডচ্চেন কুংকন এবং তলক্কল চন্তুকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দুজনে এলে বড়রানীর উপস্থিতিতে তাঁদের কথাবার্তা শুরু হলো। যে কোনোভাবেই হোক নাম্প্যারকে মুক্ত করতে রাজা সাহেব দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু তা সফল করতে হলে কি করা উচিত, এখন তাই বিবেচ্য। কুংকন নায়ারের মত, সরাসরি ইংরেজদের উপর আক্রমণ চালিয়ে

নাম্প্যারকে তাদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনা। আর চন্তুর মত হলো, ভিলদের পাঠিয়ে উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করা।

'এসব করা ঠিক হবে না', রাজা বললেন, 'তলশেরীর উপর সরাসরি আক্রমণ করা বড় বড় সুলতানদের পক্ষেও সম্ভব হয় নি। অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে হবে। উন্নিমুপ্পন বা অন্য কাউকে দিয়ে কাজটা সম্পন্ন করতে হবে।'

'এ কি বলছেন, আমরা পারব না?' অনুযোগের সুরে কুংকন নায়ার বললেন, 'যে কাজ আমরাই পারব না, উন্নিমুপ্পন বা অন্য কাউকে দিয়ে তা সফল হবে না।'

'দেখ, আমরা ইংরেজদের বিপক্ষে, তলশেরীতে আমাদের প্রবেশও নিষেধ। তলশেরীর আশে পাশে যারা থাকে তাদের মাধ্যমে কাজ হাসিলের আমি পক্ষপাতী। আর সেইজন্মেই উন্নিমুপ্পনকে এক্ষুণি ডেকে পাঠানো দরকার।'

ঠিক সেই মুহূর্তে খবর এলো যে, কৈনেরী থেকে আম্পু নায়ার এসেছেন। অবিলম্বে তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান।

রাজা বললেন, 'কে, আম্পু? এক্ষুণি ডেকে নিয়ে এসো!'

সবাই আশা করেছিল, আম্পুর কাছ থেকে বহু সংবাদ পাওয়া যাবে, কারণ তিনি ছদ্মবেশে চারিদিকে ঘুরে বেড়ান; সুতরাং দেশের হালচাল তিনি ভালো জানেন। কিন্তু এভাবে হঠাৎ তাঁর চলে আসার কারণ কিছু তারা বুঝতে পারে না, ভাবে—নিশ্চয়ই কোনো বিপদ ঘটেছে।

আম্পু প্রণামান্তে নীরবে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ দেখে সকলে ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। এক সময় রাজা সাহেব সেই নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, 'বলই না কি হয়েছে? শোনার পর নিশ্চয়ই একটা উপায় উদ্ভাবন করা যাবে।'

রাজার নির্দেশ পেয়েও অনেকক্ষণ আম্পুর মুখ দিয়ে কোনো কথা

বের হলো না। তিনি যেন কি বলার চেষ্টা করেও বলতে পারছেন না। চোখে মুখে তখন তাঁর সুস্পষ্ট ব্যগ্রতা।

আম্পু হঠাৎ এক সময় নিম্নস্বরে বললেন, 'কন্নবত বাবুকে ইংরেজরা…'

'কি বললে ?' ব্যগ্রভাবে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওরা রাক্ষসের চেয়েও অধম। কী ভয়ঙ্কর কাজ যে তারা করেছে ·!'

'তার মানে ? তারা কি কন্নবত··

'তারা…তারা তাঁকে কন্নবতে ফাঁসি দিয়েছে।'

'কী, ফাঁসি দিয়েছে ?' শোকার্ত এডচ্চেন কুংকন বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করলেন ; তারপর বললেন, 'কেরলের গৌরব অস্তমিত হলো। কিন্তু সেখানে আমাদের লোক কি করছিল ?'

কুংকনের দিকে তাকিয়ে আম্পু বললেন, 'হয়তো আমিই অপরাধী। লোকের মুখে শুনেছিলাম, ইংরেজরা কন্নবতবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে। সংবাদের সত্যাসত্য জানার জন্য গেলাম তলশেরীতে। সেখানে গিয়ে শুনলাম, কর্নেল ওয়েলেসলি তাঁর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করেছেন এবং সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। তাদের মধ্যকার আলাপ আলোচনাও ছিল খুব শান্তিপূর্ণ। গণ্যমান্য একজন অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে গেলে যেমন আয়োজনের প্রয়োজন, ওয়েলেসলি তার কোনো কিছুরই ত্রুটি করেন নি। তা সত্ত্বেও আমি গতকাল রাত্রেই তাঁকে মুক্ত করার সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু চতুর ওয়েলেসলি রাত্রির অন্ধকারে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁকে কন্নবতে নিয়ে যান এবং সেখানে তাঁকে ফাঁসি দেন। সকাল পর্যন্ত আমি এবিষয়ে কোনো খবর পাই নি। তারপর খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছি এখানে।'

আম্পু নায়ারের বক্তব্য শুনে রাজা, কুংকন এবং চন্তু বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পক্ষ থেকে কোনো গাফিলতি হয় নি।

'তোমার দিক থেকে তুমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি কর নি। দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই।' রাজা সাহেব তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

কিন্তু অর্লাত নাম্প্যারের আম্পুর কথা বিশ্বাস হলো না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কন্নবত বাবুকে মুক্ত করে আনার কি কি ব্যবস্থা করেছিলে?'

আম্পু তাঁর কথায় ভ্রূক্ষেপই করলেন না। তাঁর প্রশ্ন যেন উত্তর পাওয়ার অনুপযুক্ত। তিনি সোজা রাজার দিকে তাকালেন। রাজা চক্ষু নিমীলিত করে তখন কি যেন ভাবছিলেন।

আম্পু নায়ার বললেন, 'কোম্পানীর লোকেরা বিশ্বাস করে, এমন একজনকে দিয়ে কাজ হাসিলের চেষ্টা করেছিলাম। সে লোকটা আমাকে কথাও দিয়েছিল। ইংরেজদের উপর তার প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। সুতরাং আচমকা ধরা পড়ারও কোনো আশঙ্কা ছিল না···। কিন্তু যা হলো, তা স্বপ্নেরও অতীত।'

'তা সত্ত্বেও কন্নবত নাম্প্যারকে যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানে কাউকে সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য মোতায়েন রাখা উচিত ছিল।' অর্লাত নাম্প্যার বললেন।

আম্পু নায়ার এ কথার উত্তর দিতে যাবেন ঠিক সেই মুহূর্তে রাজা সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

কন্নবত নাম্প্যারকে হত্যার সংবাদ পেয়ে জনসাধারণের মনে একাধারে সন্ত্রাস এবং বিক্ষোভ দেখা দেয়। চুয়লি নাম্প্যারকে আটক করাতে এমনিতেই অভিজাতরা ভয়ে গুটিয়ে ছিল। তার উপর এই প্রভাবশালী এবং ধনী রাজভক্তকে ফাঁসি দেওয়ার খবর পেয়ে তারা আরো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তাদের উপর কোম্পানীর সন্দেহ হলে তাদেরও যে এই রকম পরিণতি হবে, সে সম্পর্কে কারো মনে আর কোনো দ্বিধা থাকে না। আসলে কর্নেল ওয়েলেসলির পরিকল্পনাও ছিল এইভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা।

দেশের এক ব্যাপক অংশের মধ্যে বিরাট এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলেও এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ফলে রাজার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি যে কমে নি, একথা কর্নেল ওয়েলেসলি, অর্লাত নাম্প্যার প্রভৃতিরা ঠিক অনুভব করতে পারলেন না। আশ্চর্যের বিষয়, নাম্প্যার রাজার অন্যতম পার্শ্বচর হয়েও এ বিষয়ে সচেতন হতে পারলেন না।

সেদিন রাজা আর বেরুলেন না। এমন কি মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও করলেন না। পরের দিন সকালে তিনি আম্পুকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে আদেশ করলেন যথাস্থানে ফিরে যেতে। আর নির্দেশ দিলেন যে, ভবিষ্যতে তলশেরীতে অনুষ্ঠিত যে কোনো ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে যেন সাথে সাথে ওয়াকিফহাল করানো হয়। তাঁর বিনা অনুমতিতে কারো সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যাপৃত হতেও তিনি নিষেধ করে দিলেন।

রাজার শক্তি, সামর্থ, দূরদৃষ্টি ও সাহসিকতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও আম্পু নায়ারের কাছে তাঁর এই নির্দেশ আশ্চর্য লাগে। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে মনের দিক দিয়ে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি নীরবে বিদায় নিয়ে চলে যান। তিনি অনুভব করেন যে রাজা এখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ঠিক এই সময়ে তিনি অন্য কোনো বিষয়ে ব্যাপৃত হতে চাইবেন না। পুরলী পাহাড় থেকে অবতরণের পূর্বে আম্পু নায়ার একমাত্র এডচ্চেন কুংকনকে রাজার নির্দেশ জানান। কুংকন বলেন, 'এ বিষয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। ঠিক সময়ে জরুরী ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করবেন।'

কন্নবত নাম্প্যারকে ফাঁসি দেওয়া হলো। তাঁর সম্পত্তি ইংরেজরা জব্দ করল। এত সব ঘটনা সত্ত্বেও রাজাকে নিশ্চেষ্ট দেখে লোকের মন ব্যথিত হয়। অর্লাত নাম্প্যার প্রভৃতি কর্মচারীরা এবং কোট্টায়ামের নায়ার সামন্তরা রাজার এই নিষ্ক্রিয়তাকে তাঁর দুর্বলতার পরিচায়ক বলে মনে করেন। কিন্তু রাজার রোজনামচার কোনো পরিবর্তন ঘটল না। স্বাভাবিক অবস্থার মতোই সন্ধ্যার সময় তিনি

নাম্প্যারের সঙ্গে দাবা খেলেন। খেলবার সময় অবশ্য তাঁকে কিছুটা অন্যমনস্ক দেখায়। রাত্রে কথাকলির অনুষ্ঠানেও তিনি কিছুক্ষণ ব্যয় করেন।

নাম্প্যার সহজ সরল মানুষ। রাজার এই নির্বিকার ভাব তাঁর মনে নাড়া দেয়। তিনি ভাবেন, রাজার মনে বোধ হয় আর স্নেহ ভালোবাসার স্থান নেই। তা না হলে, শুধু অন্যতম প্রধান কর্মচারী নয়, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কন্নবত নাম্প্যারের এই নৃশংস মৃত্যুর সংবাদ পেয়েও এতখানি নিশ্চেষ্ট তিনি কি করে থাকতে পারেন।

রাজার লোকের মধ্যে আরো কতকগুলি কথার কানাঘুষা চলতে থাকে। পয়য়ম পরিবারের চন্ত নায়ারের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে রাজার নিজের লোকদের মনে আজকাল পরস্পরের প্রতি ছোটখাট ব্যাপারে সন্দেহ উঁকি দেয়। আম্পু এবং চন্ত নায়ারের মধ্যে আত্মীয়তা থাকায় আম্পুকেও তারা সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে রাজা সাহেব আছেন পাহাড়ে, অথচ আম্পু অকারণে কেন রয়েছেন নগরের প্রান্তরে—এই প্রশ্ন অনেকের মনে সন্দেহকে আরো দৃঢ়-বদ্ধ করে তোলে। তাঁকে যে রসদ সংগ্রহের কাজে সেখানে নিযুক্ত করা হয়েছিল, সেকথা সকলের জানা ছিল না। তাই তাদের ধারণা আম্পু কোনো কুমতলব নিয়েই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান—পুরলী পাহাড়ে যান না। এমন কি কন্নবত নাম্প্যারের মৃত্যুর পিছনেও আম্পুর হাত আছে বলে তারা সন্দেহ করে। তাদের ধারণা, আম্পু ঠিক থাকলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলে কন্নবতের বাসিন্দারা কোম্পানীর সৈন্যকে মেরে তাড়িয়ে দিতে পারতো। এমন কি নাম্প্যারকে তলশেরী থেকে কিংবা কন্নবতে নিয়ে যাওয়ার সময় পথ থেকেই ছিনিয়ে আনা যেতো। এক কথায় আম্পুকেই লোকে কন্নবত নাম্প্যারের মৃত্যু সংক্রান্ত সমস্ত কিছুর জন্য সন্দেহ করল। নাম্প্যার এবং চন্তুর মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল সেটা অনেকে জানতো। তরুণ

উদ্দাম ও স্বতঃস্ফূর্ত আম্পুর বহু কাজ রাজার কয়েকজন মন্ত্রী ও সেনাপতির অসহ্য লাগতো। রাজা সে কথা জানতেন। তাই তিনি আম্পুকে ঐ কাজেই নিযুক্ত করেছিলেন।

শুধু আম্পুর উপরেই নয়, কৈনেরীস্থিত রাজার প্রত্যেকটি পার্শ্বচরের উপব ধীরে ধীরে লোকের সন্দেহ দেখা দিতে থাকে। রাজা সাহেব কৈনেরীতে এলে সেদিন রাত্রিতে যে ঘটনাটি ঘটে, তা সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। লোকে বলাবলি করতে থাকে যে, রাজাকে ধরার জন্য চন্তু এবং কুরুং অঞ্চলের রাজার লোক তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল, কিন্তু তারা সফল হতে পারে নি রাজা সাহেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সাহসিকতার জন্য। লোকের ধারণা, ছোটরানী মাক্কমেরও হাত আছে এই ঘটনার পিছনে। তা না হলে তারা রাজার কৈনেরীতে আগমনের কথা জানল কি করে। আগে থেকে না জানলে তাদের পক্ষে এই গোপন প্রস্তুতি সম্ভব হতো না।

রাজার উপস্থিতিতেই অর্লাত নাম্প্যার আম্পুর নিশ্চেষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করে দু-একটি কথা বলেছিলেন। এর থেকেই বুঝা যায়, রাজার পার্শ্বচরদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ কী মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। আসলে ইক্কাট্টান নায়ার নিরবচ্ছিন্নভাবে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে এবং গোপনে লোকের মধ্যে এমন সব কথা প্রচার করছিলেন যার ফলে পরস্পরের প্রতি এই সন্দেহ এবং অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল আম্পু নায়ারের প্রভাব থেকে রাজভক্তদের সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা। চন্তু নায়ারও যখন দেখলেন যে, ইক্কাট্টান নায়ারের কৌশল তার নিজের পথকেও সুগম করছে, তখন তিনিও তাঁর সুরে সুর মেলালেন।

লোকে মাক্কমকেও রেহাই দিল না। নানা অপবাদ রটিয়ে তারা চেষ্টা করল তাঁর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করে তুলতে। তারা প্রচার করতে লাগল—মাক্কম চরিত্রহীনা। কিছু দিন আগে তিনি তিন চার

দিনের জন্য :কোথায় যে গিয়েছিলেন, কেউ জানে না। আমন্ত্রণ করে এনে মাকম চেয়েছিলেন ইংরেজদের হাতে রাজাকে তুলে দিতে।

আম্পু বুঝতে পারলেন, লোকে তাঁকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখছে। মুখের সামনে কেউ কিছু বলছে না বটে কিন্তু গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার চলছে খুব জোর। বিশেষ কোনো কাজে গাঁয়ের মাতব্বর বা মোড়ল গোছের কোনো লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হতাশ হতে হয়। তারা আজকাল তাঁকে এড়িয়ে চলে। অনেক ধরাধরি করে কোনো বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেও তারা তেমন আগ্রহ আর দেখায় না; রসদ চাইলে ইতস্তত করে। এসব দেখে শুনে আম্পু বুঝতে পারেন যে, পরিস্থিতিও বদলে গেছে।

এসবের মূল কারণ কি, তা তিনি জানতে পারেন চন্ত্রোতে গিয়ে। চন্তুর লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে কন্নবত নাম্প্যারকে মুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আম্পু পান্নুর গিয়েছিলেন। কর্তব্যের তাগিদে সেখানে তিনি বেশীক্ষণ থাকতে পারেন নি। এমন কি উন্নির দিকে মুগ্ধ নেত্রে তাকাবারও সময় হয় নি তাঁর।

চন্ত্রোতবাবু তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে খুশী হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে আম্পুর আলাপ আলোচনা হলো।

উন্নি জানতে পারে, আম্পু নায়ার চন্ত্রোতে এসেছেন। সংবাদটি পাওয়া অবধি সে আম্পুর সঙ্গে অন্তঃপুরে দেখা করার প্রতীক্ষায় থাকে ব্যগ্রভাবে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল, কিন্তু তবু তিনি এলেন না। উন্নি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। প্রেমাস্পদের আগমন-বার্তা পাওয়ার পর থেকে প্রতিটি মূহূর্ত যেন তার কাছে মনে হয় একটি যুগ!

আম্পুর রওনা হওয়ার উদ্‌যোগ দেখে চন্ত্রোতবাবু তাঁকে বললেন, 'ওহে, সেই মেয়েটি যে তোমার পথ চেয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার সঙ্গে দু-একটি কথা বলে যাও। যাও, ভিতরে গিয়ে দেখা করে এসো।'

এতকাল আম্পুর মনের অতলান্ত প্রদেশে উন্নির স্মৃতি জাগরুক থাকলেও দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দায়িত্বভারে তা যেন চাপা পড়ে ছিল।

এখন চন্দ্রোত নাম্প্যারের কাছে একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্মৃতিপটে সেই কেরলকন্যার রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মনে পড়ে তার দুঃসাহসিক কাজের কথা। চন্তু নায়ার সদলবলে যেদিন তাঁর পিছু নেন, সেদিন উন্নিই তাঁকে বাঁচিয়েছিল কৌশল করে। তার জন্য উন্নি নিজের জীবনের সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হয় নি। ঐ ঘটনাটির পর থেকে মাঝে মাঝে উন্নির স্মৃতি আম্পুর মনকে আচ্ছন্ন করত।

আম্পুর বাল্যবিবাহ একটা হয়েছিল বটে কিন্তু যৌবনে পদার্পণের আগেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই রাজার সঙ্গে সঙ্গে আম্পুর দিন কাটে। আজ অবধি গার্হস্থ্য জীবনের কথা তাঁর মনে আর স্থান পায় নি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দেশের কাজে সঁপে দেওয়ার আদর্শকে অন্য কিছুতে স্থানচ্যুত করতে পারে নি।

আম্পু অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন। উন্নি সলজ্জহাসিমুখে স্বাগত জানাল তাঁকে। 'ভালো আছ?' আম্পু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেদিন ইংরেজদের হাত থেকে তুমি যেভাবে আমাকে বাঁচিয়ে দিলে—সত্যি ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এর জন্য তোমাকে আমি কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব, ভেবে পাই না।'

'আপনিও তো নিরাশ্রয় আমাকে একটি আশ্রয় দিয়েছেন', উন্নি বলল, 'এর জন্য আমি সারা জীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

সে ঘরে আম্পু এবং উন্নি ছাড়া আর কেহ ছিল না। কিন্তু তবু তারা কেউই স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে পারছিল না। উন্নি পারল না মনের কথা প্রকাশ করতে; এমন কি হাবভাবেও তার আম্পুর প্রতি গভীর ভালোবাসা বুঝাতে পারল না। অপরপক্ষে, আম্পু যুদ্ধক্ষেত্রে নিপুণ যোদ্ধা হলেও এই সব ব্যাপারে কি করণীয়, সে সম্পর্কে ছিলেন অনভিজ্ঞ। দুজনে নীরবে মুখোমুখি বসে রইল। দুজনেরই বহুকথা ছিল বলার, শোনার; কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছিল না কেউ।

অনেকক্ষণ পরে আম্পু নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, 'কোনো চিন্তা নেই। যাতে মঙ্গল হয় তাই হবে।' এ কথা উন্নির কাছে শুধু আশীর্বাদই নয়, তার মনে হলো যেন আম্পু তার কাছে ভালোবাসারও শপথ করে গেলেন।

প্রত্যুত্তরে উন্নি বলল, 'ভগবতী শ্রীপোর্কলীর যেন কৃপা থাকে এর পেছনে।'

'এখন তাহলে আসি? আবার খুব শীগগিরই দেখা করার চেষ্টা করব।' আম্পু বিদায় নিলেন।

তাঁর বোন মাক্কম এবং তাঁর নিজের সম্পর্কে যে রটনা চলছে, আম্পু তার অনেক কথাই চন্দ্রোতবাবুর কাছ থেকে জানতে পারলেন। কিন্তু এসব গুজব বা কুৎসার উৎসকেন্দ্র যে তলশেরী, এওটা তিনি জানতেন না। চিরুতাক্কুট্টির কাছে চন্দ্রোতবাবু জানতে পারেন যে ইংরেজরাই রাজার লোকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এইসব চক্রান্ত করছে। ইক্কাট্রান নায়ার এবং চন্তু নায়ারেরও যে এর পেছনে হাত আছে, সে কথা আম্পুর অজানা ছিল না। যাই হোক, মিথ্যা কুৎসা যেই রটাক, লোকে তার কিছু-না-কিছু বিশ্বাস করেই।

সব কিছু শুনে আম্পুর মন খুব দমে যায়। এই সব মিথ্যা অপবাদের ফলে দলীয় ঐক্যে ফাটল ধরতে পারে ভেবে আম্পুর মন ব্যথায় ভরে যায়। এখন তিনি বুঝতে পারেন, কেন অর্লাত নাম্প্যার তাঁকে সন্দেহ করে দু-একটি প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল রাজার কথা—দেশের কথা। রাজা তাঁকে অবিশ্বাস করেন নি। সুতরাং এই সঙ্কটজনক অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তিত না হওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করলেন।

আম্পু এবং মাক্কম সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির জন্য অনেকে অনেক ভাবে চেষ্টা করেছিল। অর্লাত নাম্প্যার বড়রানীর সঙ্গে দু-একবার এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। সব শুনে বড়রানী বলেছিলেন,

'ওসব কথা বলবেন না। মাক্কম রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, এ আমার স্বপ্নেরও অতীত।'

নানারকমভাবে চেষ্টা করেও কোনো সুবিধা করতে না পেরে অর্লাত নাম্প্যার শেষে রাজাকে এ বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা করে দেখতে বললেন। নাম্প্যারের কথা মন দিয়ে শুনে রাজা বললেন, 'নাম্প্যার, তুমি সহজ সরল মানুষ, তুমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছ না, শত্রুরা আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য কি ভাবে জাল পাতছে। নানা রকম ফন্দি আঁটছে তারা। মনে রেখো, নিজের লোকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি করা, কূটনীতির একটা প্রধান অস্ত্র।'

রাজার এই কথা যেন নাম্প্যারের মনে ধরল।

ষোল

কন্নবত নাম্প্যারকে ফাঁস দেওয়ার পরও রাজার নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা দেখে কর্নেল ওয়েলেসলির আশ্চর্য লাগে। দীর্ঘ একমাস বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে নি, প্রায় সমগ্র দেশ জুড়ে বিরাজ করেছে নিরুপদ্রব শান্তি। কেবল বয়নাড়ুতে দু-একটি ঘটনা ঘটেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। কিন্তু মনন্তনা, মানঞ্চেরি প্রভৃতি স্থানে শান্তি বজায় ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরও রাজা সাহেব দাবা খেলা এবং কথাকলিতে সময় কাটাতে লাগলেন।

দীর্ঘদিনের এই শান্ত অবস্থা ওয়েলেসলিকে কিছুটা সন্দিহান করে তোলে। কন্নবতের ঐ নিষ্ঠুর ঘটনাটির পর রাজার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশোধমূলক আক্রমণ না আসায় কর্নেল মনে করলেন, রাজা ভীত হয়েছেন, দেশে আর কোনো অশান্তির আশঙ্কা নেই। তাই তিনি নিজের কলকাতার ফিরে যাওয়ার খবর ধীরে ধীরে প্রচার করে দিতে লাগলেন।

তিনি গভর্নর জেনারেলের কাছে খবর পাঠালেন দেশে শান্তি বিরাজ করছে বলে। তাঁর সাপ্তাহিক চিঠিগুলোর মূল বক্তব্য ছিল : রাজা প্রতিশোধমূলক কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেরলের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্গস্থাপন ও সৈন্য মোতায়েন করা উচিত। আমাদের অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে যে নায়ারদের হত্যা করা হবে না। সুতরাং কোনো নায়ার যেন অরণ্যচারী রাজার

কাছে কোনো প্রকার রসদ না পাঠায়। আমার মনে হয়, এই ঘোষণা শুনে শান্তিভঙ্গ করার জন্য কেরলের একটি কুকুরও আর ঘেউ ঘেউ করবে না। কলকাতা যাওয়ার আগে আমি এই ধরনের কয়েকটি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে যেতে চাই।

কলকাতা থেকে আহ্বানের প্রতীক্ষায় ওয়েলেসলির দিন কাটতে লাগল। ইতিমধ্যে দু-চারটে দুর্গ তৈরী হলো। কোজিকোডে এবং উত্তরাঞ্চলের কোনো কোনো জায়গায়ও কয়েকটি দুর্গ মাথা তুলল। প্রতিটি দুর্গ সৈন্য ও আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত করা হলো। ভবিষ্যতে রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন না হলেও এসবের পিছনে ওয়েলেসলির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর মনে ভীতির সঞ্চার করে রাজার কাছ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন যে নায়ারদের কাছে বন্দুক, তলোয়ার প্রভৃতি যে সব অস্ত্র আছে, ছ' মাসের মধ্যে তাদের সেসব কোম্পানীর কাছে সমর্পণ করতে হবে। এরই সঙ্গে আর একটি ঘোষণা জারী করলেন যে, রাজার কাছে কেউ যেন কোনো রসদ না পাঠায়।

অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে ওয়েলেসলি বড় ভাইয়ের কাছে খবর পাঠিয়ে জানালেন যে শুধু রাজাকেই তিনি পরাজিত করেন নি, সারা দেশে শান্তিও স্থাপিত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষের সেনাপতি হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মনে। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যবস্থা হয়েছিল। মার্কুইস ওয়েলেসলিরও মনোগত অভিপ্রায়, ভাইটিকে সমগ্র ভারতের ইংরেজ সৈন্যের সর্বাধিনায়ক করা।

কলকাতা থেকে তলশেরীতে চিঠি পৌঁছতে লাগে দু সপ্তাহেরও বেশী সময়। কর্নেল অনেক কষ্টে দিন কাটাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তিনি নিজের যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন।

তলশেরীতে যারা ছিল রাজার সাহায্যকারী, তাদের দমন করার চেষ্টা ধীরে ধীরে সফল হতে চলল। কিন্তু একটি বিষয় এখনো ঠিক জানা গেল না। সেটা হলো, রাজার পক্ষে যে দলটি তলশেরীতে কাজ

করছে, তাদের নেতা কে। তবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ রইল না যে, এসব কাজ চলছে বেবরের প্রিয়তমা চিরুতাক্কুট্টির মাধ্যমেই। একবার ওয়েলেসলি মনস্থ করলেন তাকে বন্দী করবেন। কিন্তু তাঁর যাওয়ার আগেই বিচার এবং শাস্তিপ্রয়োগ সম্ভব হবে কিনা, পরক্ষণেই সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ জাগে। এখান থেকে তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন-তেন-প্রকারেণ বেবর চিরুতাক্কুট্টিকে মুক্ত করবেন এবং সিভিল কর্তৃপক্ষও তাকে আর কোনো শাস্তি দিতে সাহস করবে না। এসব কথা ভেবে কোনো উপায় না দেখে ওয়েলেসলি দোভাষীকে ডেকে পাঠালেন। আলোচনা যা হলো. তা নিম্নরূপ ঃ

'তলশেরীতে কেরলবর্মার যেসব সাহায্যকারী রয়েছে, তাদের একেবারে নির্মূল না করে যদি আমি ফিরে যাই, তাহলে যে কোনো মুহূর্তে আবার বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। ব্যাপারটা তখন আমার পক্ষে খুবই অসম্মানজনক হবে। তোমার কি মনে হয়?'

'কথাটা ঠিক কিন্তু হাতে তো তার সময় নেই। এই অল্প সময়ের মধ্যে কি তা সম্ভব হবে?' সিক্কুবেরা বলল।

'কোনো কোনো লোক সম্পর্কে আমাদের হাতে প্রমাণ রয়েছে। প্রমাণগুলো যদি অকাট্য হয়, তাহলে সেগুলো বেবর মানুক বা না মানুক মিলিটারী আইন প্রয়োগ করে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি'

'সুপারভাইসারের দোভাষী লুঈ পেরেরা সম্পর্কে আবশ্যকীয় প্রমাণ আছে। রাজার অন্যতম প্রধান সাহায্যকারী উন্নিমুপ্পনের কাছে লেখা তার অনেকগুলো চিঠি আমাদের হাতে এসেছে। ময়য়ী থেকে রাজার কাছে বন্দুক বারুদ প্রভৃতি কিনে পাঠানো হয়েছে, এরও প্রমাণ আছে।'

'এখন সে পথ একেবারে বন্ধ। কেরলবর্মা যতই বন্দুক মজুত করুন না কেন, গুলি বারুদ আর তাঁকে পেতে হবে না।'

'যাই হোক, লুঈ পেরেরাকে বন্দী করার মতো সমস্ত প্রমাণ কিন্তু

আমাদের হাতে আছে। মিলিটারীর নিয়মানুসারে যুদ্ধের সময় শত্রুকে সাহায্য করার অপরাধে কঠিন শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।'

'তাহলে পেরেরাই কি এসবের নেতা?' কর্নেল প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে না। আমার মনে হয়, রাজারই কোনো পার্শ্বচর এই গোপন দলটির পরিচালক। এবং চিরুতাকুট্টি তার প্রধান সাহায্য-কারিণী। চন্তু নায়ারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে তিনি নাকি একদিন আম্পু নায়ারকে চিরুতার বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছেন।'

'আর কোনো প্রমাণ আছে? এসব যে ঐ মহিলাটির মাধ্যমেই হচ্ছে, আমারও তাই ধারণা। পেরেরা ওর এজেন্ট মাত্র। কিন্তু চিরুতা কোত্থেকে নির্দেশ পায়, রাজার সঙ্গে তার যোগাযোগ কি ভাবে রক্ষিত হচ্ছে, অবিলম্বে এ সব বিষয়ে জানা দরকার। আচ্ছা, পেরেরাকে ধরে ঠিকমতো জেরা করলে এ সবের উত্তর পাওয়া যাবে না?'

'স্বীকার যাতে করে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে সুপারভাইসারের দোভাষী, সৈন্যরা তো তাকে বন্দী করে আনতে পারে না। খবরটা পেয়ে হয়তো বোম্বাই সরকার অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে।'

কর্নেল ওয়েলেসলি সিক্কুবেরার কথার সত্যতা বুঝতে পারলেন। কিন্তু তবু তিনি একজন মহিলা এবং কোম্পানীর একজন কর্মচারীর জন্য নিজের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হতে দেবেন না স্থির করলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, 'নিয়মবিরুদ্ধ কোনো কাজ করতে চাই না। কিন্তু এমন মারাত্মক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন না করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সিক্কুবেরা ওয়েলেসলির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলল,—'কর্নেলের অনুমতি পেলে…'

মাঝপথেই তার কথা থামিয়ে কর্নেল বললেন, 'যে কোনো ভাবে

হোক, চিরুতাকুট্টির নামে একটি মামলা রুজু করতে হবে। তার জন্য আমাদের হাতে আরো প্রমাণ চাই।'

হঠাৎ একদিন তলশেরী থেকে লুঈ পেরেরা নিখোঁজ হলো। খবরটা তলশেরীবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটা হৈ চৈ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে এই নিখোঁজের ব্যাখ্যা করে। অনেকেরই ধারণা হয়, কন্নবত নাম্প্যারকে ফাঁসি দেওয়ায় রাজার লোকই পেরেরাকে গুম করেছে। কারণ সুপারভাইসারের ডানহাত লুঈ পেরেরাকে আর কেউ শাস্তি দিতে সাহস করতে পারে না। এমন কি বেবরেরও তাই বিশ্বাস। কিন্তু এ কথা রটাল বিশেষ করে সিক্কুবেরাই। সে যেখানে সেখানে বলে বেড়াতে লাগল, 'রাজার লোক শেষ পর্যন্ত এখানেও আক্রমণ চালাতে শুরু করেছে।'

কিন্তু আসল ব্যাপারটা জানত শুধু চিরুতাকুট্টি এবং রাজার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর। কন্নবত নাম্প্যারকে ফাঁসি দেওয়ার পর থেকেই চিরুতা কয়েকটি বিষয় আশঙ্কা করছিল। ইংরেজ পক্ষের পরবর্তী কার্যসূচী সম্পর্কে সে গোপনে খবরাখবর নিলো। কর্নেলের নির্দেশেই যে পেরেরাকে বন্দী করা হয়েছে, সেটা বুঝতে তার বাকি রইল না এবং তার উদ্দেশ্যও তার কাছে আর অজানা রইল না। লুঈ পেরেরা ব্যবসা বিষয়ে ছিল বিচক্ষণ। তাই বলে রাজকার্যে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ কার্যকরী করতেও সে কিছু মাত্র বিলম্ব করত না। কর্নেল ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন না। সুতরাং চিরুতার দৃঢ় ধারণা হলো যে এই বন্দী করার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক মতলব আছে, এবং কর্নেল এই তীর হয়তো অন্য কোনো লক্ষ্য বিদ্ধ করার জন্যই ছুঁড়েছেন।

চিরুতা ইতিমধ্যে খবর পায় যে দীর্ঘ একমাস যাবৎ রাজা সাহেব নির্লিপ্ত উদাসীন হয়ে আছেন। তিনি যে এখন গভীর চিন্তায় মগ্ন, সে কথা তার বুঝতে বাকি থাকে না। তবু তাঁর এই নিষ্ক্রিয়তা তার

কাছেও দুর্বলতার লক্ষণ বলে মনে হয়। এমন কি বেবরও বলেন, 'এতদিন রাজা ছিলেন বাঘের মতো। শীগগিরই দেখতে পাচ্ছি শেয়ালে পরিণত হবেন।'

অনেকদিন ধরে আম্পু নায়ারেরও কোনো খবর নেই। এটাও রাজার অক্ষমতার একটি দিক বলে চিরুতাকুট্টির আশঙ্কা হয়। সব দিক দিয়েই যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত দিনের পর দিন স্পষ্টতর হতে চলেছে। মাঝে মাঝে তার এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা মনে হয়।

পরক্ষণেই তার মনে পড়ে মাত্র দু সপ্তাহের মধ্যেই ওয়েলেসলির কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা। তাঁর অনুপস্থিতিতে চিরুতার ভয়ের কোনো কারণ থাকবে না। তখন রাজা সাহেবও নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং আম্পুর লোকও আর হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। এসব কথা চিন্তা করে চিরুতা মনে কিছুটা ভরসা পায়। কিন্তু আম্পু কোথায়। তার যে কোনোই পাত্তা নেই। অনন্যোপায় হয়ে সে চন্দ্রোত নাম্প্যারের কাছে খবর নিতে লোক পাঠায়।

লুঈ পেরেরাকে কর্নেল ওয়েলেসলির বাংলোয় এনে হাতকড়ি পরিয়ে রাখা হলো একটি ঘরে। সে ঘরের চাবির হদিস জানা ছিল শুধুমাত্র কর্নেল, সিকুবেরা ও দু-একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারীর। পুরো একদিন পেরেরাকে অভুক্ত রেখে পরদিন ক্রুদ্ধ কর্নেল তাকে প্রশ্ন করলেন, 'রাজার দলের কয়েকজন হোমরাচোমরা পরাজিত হয়ে এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। তাদের কাছ থেকে সব কিছু আমি জানতে পেরেছি। তাছাড়া উন্নিমুপ্পনকে তুমি যত চিঠি লিখেছ, তার প্রত্যেকটি এখন আমার হাতে। তোমার এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তোমায় ফাঁসি দেওয়া হবে। তিলে তিলে তোমায় মরতে হবে।' কিছুক্ষণ থেমে তিনি আবার বললেন, 'তোমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছি। শুধু এখানকার নয় কোচিন, বোম্বাই প্রভৃতি যেখানেই তোমার বিষয়

সম্পত্তি আছে, সেখানকার সব কিছু কোম্পানীর লোক দখল করে নেবে। তোমার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।'

লুঈ পেরেরা কর্নেলকে চেনে ভালো ভাবেই। তাই তাঁর এই কথাগুলোকে সে নিছক হুমকি বলে মনে করতে পারল না। কন্নবত নাম্প্যারের মতো প্রভাবশালী লোককে যখন কর্নেল ওয়েলেসলি ফাঁসি দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন নি, তখন তার মতন একজন সাধারণ কর্মচারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে তাঁর এক মুহূর্তও বিলম্ব হবে না। পরমুহূর্তে পেরেরার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে একটি দৃশ্য—ফাঁসি কাঠে ঝুলছে তার নিজের দেহটি এবং অসহ্য যন্ত্রণায় সেটা ছটফট করছে। কী করাল ভয়াবহ দৃশ্য! আজীবন পেরেরা অর্থলোলুপ। নানা রকমভাবে জীবনে প্রচুর অর্থ সে অর্জন করেছে। শুধু সেই অর্থের লোভেও আজ তার বাঁচতে ইচ্ছা করছে।

সিক্কুবেরা বুঝতে পারল, পেরেরাকে প্যাঁচে ফেলা সম্ভব হয়েছে। পর্তুগীজ ভাষায় পেরেরাকে সে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'সমস্ত অপরাধ এখন স্বীকার করে নেওয়া ভালো। কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-কারীদের নাম এবং পরিকল্পনা জানিয়ে দিলে তারপর আমি একবার তোমার জীবন রক্ষার চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমি কথা দিচ্ছি চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না।' পেরেরা তৎক্ষণাৎ কর্নেলকে বলল, 'হুজুর, অধীন স্বেচ্ছায় কোনো কিছু করে নি। যা কিছু করেছে ঐ ডাইনির খপ্পরে পড়ে। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি কোম্পানীর দাসানুদাস, কোম্পানীরই কাজে জীবন উৎসর্গ করেছি। আজীবন সেই কোম্পানীরই লোক হয়ে থাকব। অন্যের উসকানিতে একটি ভুল করে ফেলেছি হুজুর, এ যাত্রায় আমাকে রেহাই দিন।'

চিন্তিত ওয়েলেসলি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আবেদন শুনলাম। কিন্তু আগে তুমি সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে লিখে দেবে। তার ভিত্তিতে বিচার করে দেখবো, কি শাস্তি দেওয়া উচিত তোমাকে।'

পরবর্তী কাজের জন্য সিক্কুবেরার উপর দায়িত্ব দিয়ে কর্নেল চলে

গেলেন। লুঈ পেরেরা নিজের সাফাই গেয়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিল চিরুতাক্কুট্টির উপর। চিরুতা নাকি অত্যন্ত চতুর। নিজের অজানতেই সে তার ফাঁদে পা দিয়েছে। রাজা বন্দুক এবং রসদ পান মূসার মাধ্যমে।

পেরেরার কথা শুনে সিক্কুবেরা বলল, 'আমি না হয় বুঝলাম। কিন্তু জানি না কর্নেল এসব কথা বিশ্বাস করবেন কি না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মূসাকে চেনেন। আমরা শুনেছি চিরুতাই নাকি তোমার সাহায্যকারিণী।'

'একথা সত্য যে আমিই তার উন্নতির কারণ। একদিন সে আমার অধীন ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে সে সুপারভাইসারের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছে সে দিন থেকে আমাদের মধ্যে বনিবনাও নেই। আজকাল সে আমাকে চাকর মনে করে! খুব দেমাক হয়েছে তার।'

'কিন্তু কে তাকে এ সব কাজে প্রেরণা দেয় সেটা আমাদের জানা দরকার। নিজের বুদ্ধিতে সে এসব করে বলে বিশ্বাস হয় না।'

'আজ আমিও এরহস্য ঠিক বুঝতে পারি না। তবে আমার ধারণা, মূসাই এর পিছনে আছে। তাছাড়া আমার সঙ্গে চিরুতার আলাপ হবার আগে আম্পু নায়ারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। বহুবার এটা লক্ষ্য করেছি যে সুপারভাইসারের কাছে বাঘিনীর মতো, অথচ আম্পুর সামনে একেবারে যেন পোষা বিড়ালটি। আম্পু নায়ারের যে কোনো কাজ করতে সে যেন সর্বক্ষণের জন্যে তৈরী। একবার আমার কাছ থেকে চিরুতা পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছিল। তারপর বহু চেষ্টা করে তার মধ্যে চল্লিশ হাজার ফেরত পেয়েছিলাম। বাকি দশ হাজারের জন্য খুব লেগে ছিলাম বলে সম্প্রতি সে নিজের বহু অলঙ্কার বন্ধক রেখে সেটা শোধ করেছে। ঐ পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার সমস্তটাই সে আম্পুর হাতে তুলে দিয়েছিল, এটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

'আমাদের হাতে এর কোনো প্রমাণ আছে?' জিজ্ঞাসা করল সিক্কুবেরা।

'এর আবার প্রমাণ কি? এ তো আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা—কর্নেল সাহেবের আগমনের দু সপ্তাহ পরেই এটা ঘটেছিল। তখনো রাজার সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ শুরু হয় নি।'

'আম্পু এবং চিরুতার মধ্যে সম্পর্কটা কি ধরনের, তুমি জানো? তেমন কিছু না হলে নিশ্চয়ই কেউ হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারে না।'

'আমি এ বিষয়ে বহুবার তাকে প্রশ্ন করেছি। গোপনেও চেষ্টা করেছি জানবার। কিন্তু ফল হয় নি কিছুই—কোনো কথাই তার কাছ থেকে বের করতে পারি নি। নাছোড়বান্দা হয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করাতে সে শুধু উত্তরে বলেছিল, 'এ প্রশ্ন করছ কেন। তিনি আমার প্রাণাধিক। তাঁকে অদেয় আমার কিছুই নেই'।'

'চিরুতার পূর্ব পরিচয় কিছু জানো?' সিক্কুবেরা জিজ্ঞাসা করল।

'নানা ধরনের গুজব শুনতে পাই শুধু। অনেক চেষ্টা করেও তার একজনও আত্মীয়ের নাম জোগাড় করতে পারি নি। শোনা যায় সে নাকি কোনো এক ধনী পরিবারের মেয়ে ছিল। সে যখন তরুণী, তখন তাকে টিপুর লোকেরা দাসী বানিয়ে আনে। তাদের খপ্পর থেকে রেহাই পাওয়ার পর সে 'ভ্রষ্টা' আখ্যা পেয়ে আর পারিবারিক জীবনে ফিরে যেতে পারে নি। তারপর থেকে ঘুরে বেড়াত...'

'সেই সময় তোমার লোকের হাতে পড়েছে, এই তো? তাহলে বুঝা যাচ্ছে আম্পু নায়ারের সঙ্গে তারও আগে থেকেই তার পরিচয় ছিল। মেয়েটি তাহলে সাধারণ নয়।'

এমনি করে প্রয়োজনীয় কথাগুলি সিক্কুবেরা পেরেরার কাছ থেকে বের করে নিলো। তারপর আরো দু-একটি খবর সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হবার জন্য সে ঐ স্থান ত্যাগ করল।

সতর

সেদিন রাত্রে কৈনেরী-বাড়ি থেকে বেরিয়ে উন্নিআম্মা ও চন্তু গিয়ে উপস্থিত হলেন ইক্কাট্টান নায়ারের বাড়িতে। নায়ার সাগ্রহে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর ধারণা ছিল, কোম্পানীর শাসন শুরু হলে কৈনেরীর সম্পত্তি ফিরে পেতে বেগ পেতে হবে না। কারণ আম্পু আর তখন সেখানে ফিরে আসতে পারবেন না। সুতরাং তখন যে কোনো অজুহাতে মাক্কমকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করা যাবে এবং কৈনেরীর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হবেন উন্নিআম্মা। এইসব চিন্তা করে ইক্কাট্টানের কাছে ভবিষ্যৎ খুব অনুকূল মনে হয়।

ইক্কাট্টানের বাড়ির পরিবেশ চন্তু নায়ারের খুবই পছন্দ হলো। বিলিতী মদের আকর্ষণই যে এর একমাত্র কারণ তা নয়, উপরন্তু গৃহস্বামীর তরুণী ভার্যা চিন্নাম্মালুর প্রতি আকর্ষণটিও কম ছিল না তাঁর। ইক্কাট্টান নায়ার চালচলন এবং কথাবার্তায় বুঝতে দিতেন না যে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর তরুণী স্ত্রী তাঁকে বিশেষ মান্য করত না। এই বৃদ্ধকে বিয়ে করতে বাধ্য হওয়ায় চিন্নাম্মালুর মনে তার জন্যে ছিল একটি অনুতাপ। তবু ক্রমে ক্রমে সে-ও স্বামীর মদ্যপানে অংশ গ্রহণ করতে লাগল।

চন্তু এবং চিন্নাম্মালুর মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটি আকর্ষণ ছিল। ইক্কাট্টান নায়ার চন্তুর কাছে ইংরেজদের এবং কুরুং দেশের রাজার শক্তি সামর্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে যখন খুব বাড়িয়ে গল্প বলতেন, তখন

চিন্নাম্মালু তাঁদের কথার ফাঁকে ফাঁকে এসে চন্তুকে পান দিয়ে যেত। এই ভাবে বহুদিনের প্রচেষ্টায় ইক্কাট্টান নায়ারের পক্ষে চন্তুকে নিজের বশে আনা সম্ভব হয়। তারপর কোম্পানী এবং কুরুং দেশের রাজার পক্ষ থেকে চন্তু বহু পুরস্কার পান, কিন্তু সেগুলি একে একে প্রত্যেকটি গিয়েছে চিন্নাম্মালুর বাক্সে।

উন্নিআম্মাকে সেই বাড়িতে রেখে চন্তু এবং ইক্কাট্টান নায়ার পরদিন গেলেন তলশেরীতে। নিজেদের উচ্চাশা পূরণ হওয়া সম্পর্কে তাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কন্নবত নাম্প্যারের ফাঁসির খবর তাঁরা জানতে পারলেন সিক্কুবেরার কাছ থেকে। কথাটা শুনেই ইক্কাট্টান নায়ার তাঁর মনস্কামনাটি প্রকাশ করে ফেললেন, 'এরপর রাজার পালা।' চন্তু কর্নেলের কাছে গিয়ে আবেদন জানালেন, যাতে কন্নবতের সমস্ত সম্পত্তি তাঁকে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে তিনি সিক্কুবেরারও মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।

'কোম্পানী কোনোদিন সাহায্যকারীদের ভোলে না।' সিক্কুবেরা বললেন।

চন্তুকে সিক্কুবেরার প্রয়োজন ছিল। সাতদিনের মধ্যে চিরুতাক্কুট্টির পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে ফিরে আসার নির্দেশসহ চন্তু তলশেরী থেকে বিদায় নিলেন।

তারপর সিক্কুবেরা ইক্কাট্টান নায়ারকে নিযুক্ত করল অন্য একটি কাজে। তাঁর কাজ হলো, দেশবাসীর কাছে এই কথাটা ব্যাপকভাবে প্রচার করা যে রাজা কোম্পানীর আধিপত্য স্বীকার করে নেওয়ার এবং পেন্‌সন নিয়ে বাকি জীবনটা শ্রীরঙ্গপত্তনে কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন; এবং সেই মতো তিনি তাঁর প্রার্থনা পত্রের মাধ্যমে কর্নেলকে জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এটা ছিল কর্নেলের কূটনীতি। এই ধরনের প্রচারের প্রয়োজন ছিল দুটো কারণে। প্রথমটি হলো, এর ফলে রাজার সাহায্যকারীরা ক্রমশ কোম্পানীর ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করবে। পরিস্থিতি অনুকূল, সুতরাং এই প্রচারে

দেশবাসীও সন্দেহ করবে না। কারণ তারা এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছে যে, দীর্ঘ দেড়মাস যাবৎ সম্পূর্ণভাবে উদাসীন এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন।

দ্বিতীয় কারণটি হলো, ওয়েলেসলি অনেক আগেই গভর্নর জেনারেলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে দেশের অবস্থা শান্ত। কিন্তু এদিকে বেবর বোম্বাই সরকারের কাছে গোপনে যে কি লাগিয়েছেন, তা তিনি জানতেন না। তিনি ভাবলেন যে, এই ধরনের প্রচারের ফলে বেবর নিজেও মত বদলাবেন এবং বোম্বাই সরকারকে তার অনুকূলে যা হোক কিছু জানাবেন। ফলে এই বিষয়টি ওয়েলেসলির ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতির সহায়ক হবে।

সিক্কুবেরার নির্দেশ শুনে ইক্কাট্টান নায়ারের আনন্দের আর সীমা রইল না। তাঁর মনে হলো যেন সমগ্র দেশে রাজার আর কোনো অস্তিত্বই নেই। এবং এখন তাঁকে কিছু বলার মতো বুকের পাটাও কারো নেই।

সিক্কুবেরার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চন্তু এবং ইক্কাট্টান নায়ার কর্তব্য পালনের জন্য যে যার পথ ধরলেন। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে তাঁরা তৃতীয় দিনে কৈনেরীতে মিলিত হবেন মনস্থ করলেন।

কৈনেরী থেকে রাজার চলে যাওয়ার পর থেকে মাক্কমের অবস্থারও পরিবর্তন দেখা গেল। এই সেদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন কেমন যেন মনমরা হয়ে, কিন্তু আজকাল তাঁকে সর্বদাই প্রসন্ন দেখাতে লাগল। স্নানাহার ও প্রসাধনে তাঁকে পূর্বের মতো আর উদাসীন দেখা যায় না। কৈনেরীতে রাজার আগমনের পূর্বে তাঁর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি মাক্কমকে করে তুলেছিল বিরহে কাতর। এমন কি রাজা সাহেবের সঙ্গে ভবিষ্যতে আর দেখা হবে কিনা, এ বিষয়েও তাঁর মাঝে মাঝে সন্দেহ হতো। কিন্তু সেদিন পুরলী পাহাড়ের অভিজ্ঞতা তাঁকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিহান করেছে এবং এমন কি তারপর রাজা সাহেব নিজে এসেছিলেন কৈনেরীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

উন্নিআম্মার অনুপস্থিতি সর্বক্ষণ মাক্কমের মনে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। কিন্তু তাঁরা নিজেদেরই আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন জেনে মাঝে মাঝে তিনি কিছুটা স্বস্তি পান।

মাক্কমকে সাহায্য করার জন্য ছিল নীলুক্কুট্টি। তার বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর। অস্ত্র শিক্ষার দিকে খুব ঝোঁক তার। কিন্তু বয়স হওয়ায় ব্যাটাছেলেদের সাথে এক সঙ্গে তাকে অস্ত্র শিক্ষার্থে পাঠাতে ছোটরানীর মন চায় না। কিন্তু কাম্মুর উপর তাঁর নিজের অগাধ বিশ্বাসের ফলে এবং অস্ত্র শিক্ষার প্রতি নীলুক্কুট্টির আগ্রহ দেখে তিনি আর নিষেধ করতে পারেন না।

মাতৃহীনা নীলুক্কুট্টি সবে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে, সেকালের রীতি অনুসারে যাকে বিয়ের বয়স বলা চলে। এ ব্যাপারে আজকাল মাক্কমের চিন্তা হয়। তার উপর বেশ কিছুদিন হলো আম্পু নায়ারও আর এদিকে আসে না যে, তাঁর সাথে এ বিষয়ে আলাপ করবেন। কাম্মু এই বাড়িতেই থাকে এবং নীলুক্কুট্টির অস্ত্রগুরু সে-ই। অনেক দিন থেকেই মাক্কমের কেমন যেন একটা সন্দেহ যে তারা বোধ হয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত। প্রকৃত ঘটনাও কিন্তু তাই। ঘনিষ্ঠ সাহচর্য এবং শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে ক্রমে তারা নিবিড় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থায় এখনই তাদের বিয়ে দেওয়া যায় না, বিশেষত আম্পুর অনুমতি ব্যাতিরেকে।

মাক্কম সম্পর্কে চারিদিকে যে অপবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল, লোকের মুখে মুখে অবশেষে তা একদিন সেই গাঁয়েও এসে পৌঁছল। উন্নিআম্মাও নিঃসঙ্কোচে চারিদিকে মাক্কম সম্পর্কে নানা ধরনের মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে বেড়াতে লাগলেন। নীলুক্কুট্টি একদিন পুকুরে স্নান করতে গিয়ে মহিলাদের মুখে মাক্কম সম্পর্কে নানা ধরনের কুৎসিত কথা শুনে ম্লান মুখে ফিরে এলো।

বাড়ি ফিরে প্রথমেই সে সমস্ত কথা কাম্মুর কাছে জানাল।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে কাম্মুর রক্ত যেন টগবগ করে ফুটে উঠল। গম্ভীর স্বরে সে বলল, 'এসব নিশ্চয়ই ঐ চন্তুর কাজ। একবার তাকে হাতের কাছে পেলে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতাম।' কিন্তু এতেও শান্ত হলো না নীলুক্কুট্টি। তাই সেখান থেকে সে ছোটরানীর কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে সব কথা জানাল।

মাক্কম বুঝতে পারলেন যে, তাঁর এবং তাঁর ভায়ের নামে শত্রুরা যে মিথ্যা অপবাদ রটাচ্ছে, দেশবাসী তাতে বিভ্রান্ত হয়েছে। রাজার প্রতি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ শুনে ছোটরানী শুধু নীরবে হাসলেন; কিন্তু পরক্ষণেই এই ধরনের প্রচারের ফলে রাজার প্রতি দেশবাসীর যে বিরূপ মনোভাব দেখা দিচ্ছে তার পরিণতির কথা ভেবে তিনি আশঙ্কিত হলেন।

অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু চন্তু নায়ার চিরুতাক্কুট্টির পূর্ব পরিচয় সংগ্রহ করতে পারলেন না। এমন কি চিরুতার কোনো আত্মীয়ের নামও খোঁজ করে বের করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। কেবলমাত্র উড়ো-উড়ো ভাবে তিনি যা শুনলেন তা হলো, সে নাকি পূর্বে লুঈ পেরেরার ক্রীতদাসী ছিল। তাছাড়া এও জানতে পারলেন যে, টিপুর আক্রমণে চিরুতাদের পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সংবাদটি শুনে চন্তু প্রসন্ন চিত্তে ফিরে এলেন।

পূর্ব কথামত তৃতীয় দিনে চন্তু ইক্কাট্টান নায়ারের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। এসে দেখেন, ইক্কাট্টান তখনো ফেরেন নি। চিন্নাম্মালুর কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন যে রাত্রে মদ্যপানের জন্য তিনি অবশ্যই একবার আসবেন। চিন্নাম্মালু চন্তুকে আপ্যায়ন করে বসাল, তারপর বলল, 'কি রকম শুনছেন? চারিদিকে গাঁয়ের সকলের মুখেই যে শুনি এক কথা। যেখানেই যাই, শুনি সেই একই বিষয়ের আলোচনা চলছে।'

'কি রকম?'

'মাক্কমের কথা গো, মাক্কমের কথা।'

'তাই নাকি ?' চন্তু এমন ভাবে বিস্ময়ের ভান করলেন, যেন কথাটা তিনি এই প্রথম শুনলেন। 'আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, সবাই বলছে, আম্পু নায়ারই নাকি কন্নবত নাম্প্যারকে হত্যা করিয়েছে। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের মুখেই এই এক কথা। এবার দেখা যাবে, ওদের অহঙ্কার কোথায় থাকে।'

'মাক্কমের কথা ছেড়ে দাও। ও তো এখন পথিকের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।'

'থাক, এখানে বসে বসে আর রাজা-উজীর মারতে হবে না। মাক্কমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তো দেখি হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, হাঁটু কাঁপে ঠকঠক করে। এমন কি সে কেউকেটা যে তাকে ভয় করতে হবে এমনি করে ?'

চন্তুর পৌরুষে লাগল। সাথে সাথে তাঁর এ কথাও স্মরণে এলো যে মাক্কমের এই উন্নতির মূলে তিনিই। উন্নিআম্মার সঙ্গে তার বিয়ের পরেই তাঁরই সুপারিশ অনুসারে রাজার সঙ্গে মাক্কমের বিয়ে হয়। কিন্তু তার জন্যে মাক্কম কোনোদিন চন্তুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি। মাক্কমের এই অহঙ্কার এখন চন্তুর কাছে অসহ্য লাগে। মনে মনে তিনি অবিলম্বে এর একটা প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করেন।

'কি, মাক্কমকে শায়েস্তা করতে হবে ভাবছ নাকি ? এতখানি বুকের পাটা তোমার নেই। মনে রেখো, রাজার সে ছোটরানী।'

'ছোটরানী ! আচ্ছা দেখা যাবে, কি রকম ছোটরানী সে ! পৌরুষ আমার মধ্যে এখনো আছে, এখনো তা মরে যায় নি। মনে রেখো, ধমনীতে এখনো আমার বয়ে চলেছে রক্তের প্রবাহ।—আমি যদি···'

'যাক', চিন্নাম্মালু চন্তুকে খুব উত্তেজিত দেখে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলো, 'ওঁর আসতে হয়তো একটু দেরি হবে। কিছু খেয়ে নাও।'

'দিলে নিশ্চয়ই খাবো, কিন্তু একটি শর্তে। তোমাকেও খেতে হবে আমার সঙ্গে।'

চিন্নাম্মালুর আমন্ত্রণ রক্ষার পর চন্তু ভিতরে গিয়ে উন্নিআম্মার সঙ্গে দেখা করলেন। প্রথমেই তাঁকে জানালেন একটি সুখবর—কোম্পানী নাকি তাঁকে বিরাট এক সম্পত্তির মালিকানা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছে। তাছাড়া, রাজাকেও আর বেশীদিন এই মর্ত ভূমিতে থাকতে হবে না।

কথাগুলো উন্নিআম্মা শুনলেন বটে কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ করলেন না। চিন্নাম্মালুর সঙ্গে এতটা সময় কাটিয়ে আসায় চন্তুর প্রতি তাঁর সন্দেহ। তাই তিনি এখন চন্তুকে অপ্রসাঙ্গিক ভাবে দু-এক কথা শুনিয়ে দিলেন।

চন্তু সেখান থেকে আবার ফিরে এলেন চিন্নাম্মালুর কাছে।

মাক্কম সম্পর্কে চিন্নাম্মালু তাঁর মনে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করেছিল, সুরাপানের ফলে তা যেন অতি সত্বর অঙ্কুরিত হয়ে বহু শাখায়িত ও পল্লবিত হয়ে পড়ল। যেন-তেন-প্রকারেণ মাক্কমের দর্পচূর্ণ করতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন তিনি।

রাত্রে ইক্কাট্টান নায়ার অনেক নতুন খবর নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু চন্তুকে অপ্রকৃতিস্থ এবং অমনযোগী দেখে তিনি তখন তাঁকে সব কথা জানালেন না।

সে রাত্রে উন্নিআম্মার প্রতি রোগের ভান করে চন্তু বাইরেই বিছানা করে শুয়ে পড়লেন। বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে কোমরে তলোয়ার ও হাতে মশাল নিয়ে তিনি সোজা কৈনেরী-বাড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। চারিধারে তখন গভীর নিস্তব্ধতা। বাড়ির ভিতরে মাক্কম এবং নীলুকুট্টি গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। বাইরে থেকেই চন্তু কাম্মুর নাকের ডাক শুনতে পেলেন। অনন্তর তিনি আর মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করে এক লাফে পাঁচিল টপকে আঙিনায় প্রবেশ করলেন। তাঁর গতি তখন যেন অপ্রতিরোধ্য দুর্বার।

—দর্পিণী ভ্রষ্টা মাক্কমকে আজ তিনি সমুচিত শিক্ষা দেবেনই। তাঁর মনে হলো, এর পরবর্তী কাজগুলি নির্বিঘ্নে নিষ্কণ্টকে সম্পন্ন হবে। সমগ্র কেরলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে খ্যাত। প্রথমে

তিনি তলোয়ারের এক আঘাতে ঘুমন্ত কাম্মুকে শেষ করে দেবেন। তারপর মাক্কমকে দু-একবার ডাকবেন। তাতে যদি তিনি স্বেচ্ছায় দরজা খোলেন তো ভালই, আর না খোলেন তো দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবেন। এইভাবে মনে মনে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে নিয়ে পা টিপে টিপে তিনি বারান্দায় উঠলেন। তারপর তরবারি কোষমুক্ত করে তুলে ধরতেই হঠাৎ কোথা থেকে একটি তীর এসে তাঁর কাছে পড়ল।

চন্তু বুঝতে পারলেন, কৈনেরী-বাড়িতে ভিলরা নিশ্চয়ই পাহারায় রয়েছে। মুহূর্তমাত্র পূবে পর্যন্ত একথা চন্তুর অজানা ছিল। এখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভিলরা তাঁর প্রত্যেকটি কাজ অনুসরণ করছে। কিন্তু এই অবস্থায় কি যে করণীয় বুঝে উঠতে পারলেন না। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা দূরে থাক, এখন সেখান থেকে জীবন নিয়ে পালাবেন কি করে, সেটাই তাঁর প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়াল। তক্ষুণি অন্তত তাঁর হাতের মশালটি নিবিয়ে ফেলা উচিত ভাবলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটি শুকনো নারকেল পাতায় আচ্ছাদিত ঐ বাড়ির চালের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

প্রহরী ভিলরা প্রথমে এই ব্যাপারটি ধরতে পারে নি। দেখতে দেখতে বাড়িতে আগুন লেগে গেল। লেলিহান বহ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ভিতরে ঘুমন্ত মাক্কম এবং বারান্দায় নিদ্রিত কাম্মু অনেকক্ষণ কিছু টের পেলো না। বড় বড় জ্বলন্ত কাঠ নীচে পড়ার আওয়াজে তাদের ঘুম ভাঙল এক সময়। চোখ খুলেই চারিদিকে আগুন দেখে এবং তার উত্তাপ ও ধুঁয়ায় মাক্কম এবং নীলুকুট্টি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

আগুন লেগেছে দেখে গ্রামবাসীরা এক জায়গায় এসে জড়ো হলো বটে কিন্তু এগুলো না কেউ। হাত গুটিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে তারা মজা দেখতে লাগল। কেউ বলল, 'রাজার সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাদের এই হয় পরিণতি। মরুক, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাক।'

দু-চারজন এগুতে চাইলে অন্তরা বলল, 'যেও না, রাজা সাহেব রাগ করবেন।'

কাম্মু বাড়ির ভিতর থেকে মাক্কম এবং নীলুক্কুট্টিকে উদ্ধার করে আনার চেষ্টা করতে লাগল। চালে আগুন লেগেছে, দরজাগুলো জ্বলছে। অনেক কষ্টে একবার দরজা খুলে মাক্কম নিজে নিজেই বের হবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেন নি, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে পড়ে যেতে দেখে নীলুক্কুট্টি আর্তনাদ শুরু করে। তার আর্তকণ্ঠ কাম্মুকে মরিয়া করে তুলল। নিমেষের মধ্যে সে ভিতরে ঢুকে ভূলুণ্ঠিত মাক্কমকে কাঁধে ফেলে বাইরে বেরিয়ে এলো। নীলুক্কুট্টিও তার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলো। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ফোস্কা পড়ায় নীলুক্কুট্টি তার যন্ত্রণায় বেশীক্ষণ সজ্ঞানে থাকতে পারল না। কাম্মু বুঝতে পারল, গ্রামবাসীরা তাকে সাহায্য করবে না। ইতিমধ্যে কিছু ভিল এসে পৌঁছানোতে তাদের সাহায্যে কাম্মু আগুন নেবানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে অবশেষে সফল হলো।

তারপর দেখা দিল এক সমস্যা। বাড়ি তো গেল পুড়ে, এখন ছোটরানী, নীলুক্কুট্টি এবং কাম্মু থাকবে কোথায়।

আঠার

তখনকার দিনে কেরলের বড় বড় ব্যবসায়ী ও বিত্তশালীদের মধ্যে আলীমূসা মারাক্কার ছিলেন শ্রেষ্ঠ। কোলচ্চল থেকে মঙ্গলাপুরম পর্যন্ত গুজরাটী কিংবা অন্য যে কোনো দেশী ব্যবসায়ীর সঙ্গে আর্থিক বিষয়ে পাল্লা দেওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল তাঁর। ব্যবসায়ীরা অনেক বিষয়ে তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করতো। বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা প্রভৃতি প্রধান বন্দরগুলোতে ছিল মূসার ব্যবসা-কেন্দ্র। শুধু দেশেই নয়, সাগর-পারেও তাঁর ব্যবসার পসার ছিল। তাঁর জাহাজ যেত মিশর, আরব প্রভৃতি দূর দেশে। ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্কে মূসা ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ফরাসীদের সঙ্গে গোয়ায় এবং মারাঠাদের সঙ্গে পুণায়ও তাঁর ব্যবসা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক কথায় তিনি ছিলেন সমগ্র দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ধনী।

ইংরেজ কোম্পানীর সতর্ক পাহারায় মূসার বাণিজ্য-তরীর গতায়াত ছিল সাত সমুদ্র তের নদীর পারেও। কোম্পানীর সাহায্যেই ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে তাঁর ব্যবসা প্রসার লাভ করে। কোম্পানীর যে কোনো পণ্যের প্রয়োজন হলে তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তা সরবরাহ করতেন। ফলে বারে বারে তিনি ইংরেজদের নেকনজরে পড়েছিলেন।

আলীমূসার ব্যবসায়ী দৃষ্টি ছিল সর্ব বিষয়েই। তলশেরীর বহু ইমারত এবং দোকানপাটের তিনি ছিলেন মালিক, কিন্তু নিজের বাসভবন তৈরি করেছিলেন শহরের বাইরে। তাঁর বাড়িটি কেরলের

অন্যান্য ধনীদের বাড়ির মতো ছিল না, ছিল মাদ্রাজ ও শ্রীরঙ্গপত্তনের ধনী মুসলমানদের বাড়ির মতো। কেরলের অভিজাতদের মহল-গুলির তুলনায় তাঁর মহলটি ছিল অনেক বেশী উন্নত স্তরের। বাড়ির সামনে বিরাট এক সুসজ্জিত মনোরম উদ্যান। দেশবিদেশেব নানা রকমের ফুলগাছ শোভা পেতো সেই উদ্যানে। তাঁর বাড়ি এবং উদ্যান দেখে পাওয়া যেত তাঁর পরিচ্ছন্ন রুচিজ্ঞানের পরিচয়।

উদ্যানটির মাঝখানে ছিল ছোট একটি বাড়ি। মেঝেতে তার পাতা থাকত গালিচা এবং তার চারিধারে শোভা পেতো ইউরোপীয় দীপাধার। এ ছাড়া বহু লোভনীয় এবং সুন্দর আসবাবে সজ্জিত ছিল সেই মহলটি। এটি ছিল অতিথিদের বসার ঘর।

কথিত আছে, হায়দারের আক্রমণের ফলে ধনী এবং অভিজাত পরিবারের যে সব তরুণী নিখোঁজ হয়েছিল, তারা নাকি ছিল ঐ অট্টালিকাতেই। তারা নাকি মূসার সেই মতিমহলের শোভা বর্ধন করতো।

তলশেরীতে কর্নেল ওয়েলেসলির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে খুব ঘটা করে একটি প্রীতি ভোজের আয়োজন করে মূসা তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কেরলে যত ইউরোপীয় ছিল, সবাই এই ভোজে আমন্ত্রিত হয়। আনুষঙ্গিক হিসাবে নাচ, গান, আতসবাজি পোড়ানো প্রভৃতি যুক্ত হয়ে সেদিনের সেই ভোজসভা একটি উৎসবের রূপ গ্রহণ করে।

ইংরেজদের প্রতি এতখানি আনুগত্য প্রদর্শনের পর স্বাভাবিক ভাবেই মূসার উপর ইংরেজদের কারো কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ ছিল না। মূসার সাহায্যেই যে আম্পু নায়ার তলশেরীতে যাতায়াত করে, এটা ইংরেজদের স্বপ্নেরও অতীত। একটা গুজব ইংরেজদের কানে যায়, মূসা নাকি যুবতীদের নিয়েও ব্যবসা করেন। কিন্তু এই ধরনের ছোটখাট ব্যাপারে তাঁকে চটাতে তারা সাহস করে নি। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে বহু লোকের আনাগোনা হয়। তাঁর বাড়ি

সশস্ত্র পাহারায় থাকে সুরক্ষিত। তাই তাঁর বিনা অনুমতিতে কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

সুপারভাইসারের নির্দেশ অনুসারে মূসার কাছ থেকে আগত যে কোনো লোক তলশেরীতে প্রবেশ করতে পারে। কোম্পানীর পাহারাদাররা আইনত তাদের আটকাতে পারে না। এই সুযোগে আম্পু নায়ার মূসার আত্মীয় হিসাবে তলশেরীতে যাতায়াত করেন।

মূসার সঙ্গে চিরুতাকুট্টির যে যোগাযোগ আছে, সে কথা কোম্পানীর লোকের কাছে অজ্ঞাত না হলেও তারা এ বিষয়ে মাথা ঘামায় না।

কেরলের ধনী এবং সামন্তরা তলশেরীতে এলে তাদের অভ্যর্থনার জন্য আলীমূসার আগ্রহ দেখা যায় সীমাহীন। চন্দ্রোত নাম্প্যার আসেন সপ্তাহে একবার করে এবং মূসার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণের আলাপ আলোচনার পর ফিরে যান। এঁরা দুজনই বন্ধু বলে লোকের ধারণা থাকায় এ বিষয়েও কেউ কোনো সন্দেহ করে না।

রমজানের সময় মূসা একমাস বাড়ি থেকে কোথাও বেরোন না, নিষ্ঠার সঙ্গে রোজা পালন করেন। এবারের রমজানের সময় তিনি জানতে পারেন যে কন্নবত নাম্প্যারকে তলশেরীতে আনা হয়েছে। নাম্প্যারকে আটক করার সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু তার পরেই যখন ওয়েলেসলি তাঁরই বাড়ির একটি ঘরে কন্নবত নাম্প্যারকে রাখার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হন। সেদিনই অপর পক্ষ থেকে গোপনে নির্দেশ আসে যে, নাম্প্যারকে সন্ধ্যার মধ্যেই উদ্ধার করা দরকার। কিন্তু ওয়েলেসলির কাজের পরিকল্পনা দেখে তিনি তখনই কিছু করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। কিন্তু পরের দিন ভোরেই তাঁকে মুক্ত করার একটি পরিকল্পনা নিয়ে তিনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করলেন।

পরদিন ভোরে আলিমূসা বাগানে পায়চারী করছেন। এমন সময় তাঁর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছুটে এসে তাঁকে জানাল যে,

কন্নবত নাম্প্যারকে চক্রান্ত করে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছে। মূসার কাছে এ খবর যেন বিনামেঘে বজ্রপাত। তাঁর মনে হতে লাগল যেন তাঁর পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে তিনি সমগ্র বিষয়টির চারিদিক চিন্তা করে একদিকে যেমন ওয়েলেসলির চক্রান্ত ও চাতুর্যের মনে মনে প্রশংসা না করে পারলেন না, অপরদিকে তেমনি কন্নবত নাম্প্যারকে ঐ চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করতে না পারায় নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগলেন। অনুতাপ ও অনুশোচনায় তাঁর মন অভিভূত হয়ে পড়ল।

পরক্ষণেই তার মনে সন্দেহ জাগল, কন্নবত নাম্প্যারকে মুক্ত করার জন্য তিনি নিজে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা ওয়েলেসলির কানে পৌঁছে গেছে কিনা। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, সে রকম কিছু ঘটনার কোনো কারণ নেই।

পরক্ষণেই আর একটি সংবাদ এলো যে, চিরুতাক্কুট্টির কাছে কিছু জিনিস পাঠানোর জন্যে তিনি যে লোক পাঠিয়েছিলেন, কোম্পানীর লোক তাদের আটক করেছে। তারপরই আরো একটি খবর পেলেন যে, লুঈ পেরেরাকে শহরের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পর পর এই ধরনের খবর পেয়ে মূসা কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। গোপনে খোঁজ খবর নিয়েও তিনি পেরেরার কোনো হদিস পেলেন না।

আলিমূসা কর্নেল ওয়েলেসলিকে ভালোভাবেই চেনেন। তাই তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন না কখনো। রাজনৈতিক বিষয়ে চরমতম নিষ্ঠুরতার পথ গ্রহণ করতেও যে মুহূর্তের জন্য দ্বিধা বোধ করেন না, এ কথা তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়। সুতরাং একবার যদি তিনি কোনোরকমে মূসার কার্যকলাপ—রাজার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন, তাহলে আর ইহজগতে থাকতে হবে না। এ সব কথা ভালো করে চিন্তা করেই

তিনি এতকাল খুব গোপনে সব কাজ করেছেন। মূসার এখনো দৃঢ় ধারণা যে, তাঁর এইসব গোপন কাজের কোনো প্রমাণপত্র লুঈ পেরেরার হাতে নেই। সুতরাং ওয়েলেসলি সঠিক কোনো প্রমাণ ছাড়া তাঁর মতো লোককে যে শাস্তি দিতে সাহস করবেন না, একথা তিনি ভালোভাবেই জানেন।

লুঈ পেরেরার জবানবন্দিতে আলিমূসার নাম দেখে ওয়েলেসলির কিছুতেই বিশ্বাস হলো না। কোম্পানী যেমন তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছে, কোম্পানীকেও তেমনি আলীমূসা কম সাহায্য করেন নি। এই অবস্থায় তাঁকে সন্দেহ করা ওয়েলেসলির পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। এটা সম্ভবত পেরেরার চালাকি বলেই কর্নেল মনে করলেন। তিনি ভাবলেন, পেরেরা হয়তো চিরুতা এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য আলীমূসাকে সামনে এনে ন: জদর আড়াল করতে চায়। একমাত্র তার মুখের কথা ছাড়া নির্ভরযোগ্য অন্য কোনো প্রমাণও নেই। সুতরাং সমগ্র ব্যাপারটা চিন্তা করে ওয়েলেসলি নিজেই মূসাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করবেন বলে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সংবাদবাহকের মাধ্যমে আলীমূসা ওয়েলেসলিকে জানালেন যে, রোজার সময় তিনি সাধারণত বাড়ি থেকে বেরোন না। তবে কর্নেলের জরুরী আহ্বানের গুরুত্বের কথা ভেবে তিনি সন্ধ্যার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

বড় বড় ধনী এবং প্রভাবশালী লোকের সঙ্গে জীবনে বহুবার আলীমূসা সাক্ষাৎ ও আলাপ করেছেন। সুতরাং ওয়েলেসলির সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁর কিছুমাত্র ভীতির কারণ ছিল না। তাছাড়া এমনিতেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী পুরুষ। যা হোক, সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া সেরে আলীমূসা চার পাঁচজন অনুচব নিয়ে ওয়েলেসলির বাংলোয় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ওয়েলেসলি তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সংবর্ধনার আড়ম্বর দেখে মনে হলো, ইংরেজরা তখনো তাঁর উপর খুবই

খুশী। তাঁদের মধ্যে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার পর কর্নেল বললেন, 'এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, আপনি আমাদেরই লোক। নানারকমভাবে আপনি কোম্পানীকে সাহায্য করে থাকেন। সেই কারণে এক জরুরী বিষয়ে আলোচনার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।'

'আল্লার মেহেরবাণী এবং আপনাদের দোয়াতেই আমার দিন কাটে। আপনি এ কথা নিশ্চয়ই জানেন যে, কোম্পানীকে যে কোনো ভাবেই হোক সাহায্য করার জন্য আমি সর্বক্ষণ সাগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি।'

'জানি বৈ কি। তবে দেখুন, অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও কেরলে ঠিক শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। এই অশান্তির কারণ যে কেরলবর্মা ছাড়া অন্য কেউ নয়, তা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। অথচ আশ্চর্য যে, ঐ লোকটি এই তলশেরী থেকেই দিনের পর দিন সাহায্য পাচ্ছেন। এতদিন আমি এ সম্পর্কে উড়ো উড়ো সব খবর শুনতাম। কিন্তু বর্তমানে আমার হাতে সঠিক প্রমাণ আছে।'

'তাহলে আর অকারণে গড়িমসি করছেন কেন? যারা অপরাধী অবিলম্বে তাদের শাস্তি দিন।'

'না, আমি এখনো তাদের সকলের নাম ঠিক সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি। একবার জানতে পারলে, সে যেই হোক তাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাবই।'

'এ বিষয়ে কোনোক্রমেই দ্বিধা থাকা উচিত নয়। তবে এখন কর্তব্য হচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের নাম খুঁজে বের করা। প্রয়োজন হলে আমিও এবিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আচ্ছা বলতে পারেন, তারা কী ধরনের সাহায্য করছে?'

'একটা কথা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণে আছে যে, আমার নির্দেশ ছিল কেরলবর্মাকে কেউ রসদ জোগাতে পারবে না। যারা এই নির্দেশ অমান্য করবে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। জানেন, আমার এই

আদেশ সত্ত্বেও এক হাজার বস্তা চাল কেরলবর্মার শিবিরে পৌঁছে গেছে। এখন আমাকে জানতে হবে, কে এত চাল জোগাল ?'

'এক হাজার বস্তা চাল ! আমার অজ্ঞাতে এ দেশে এত চাল আসতেই পারে না। এত চাল পাবে কোথায় ? হয়তো কয়েকজন দালাল অল্প অল্প করে জোগাড় করে রাজার কাছে পাঠিয়েছে।'

ওয়েলেসলি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমি তাদের কোনোক্রমেই ক্ষমা করব না।'

'না করাই উচিত। আমিও খোঁজ করে দেখব, এতখানি বুকের পাটা কার হলো। এবিষয়ে আমিও চেষ্টার ত্রুটি করব না।'

এরপর আলিমূসা সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

তাঁর কথা শুনে কর্নেল ওয়েলেসলি সমগ্র ঘটনাটির ঠিক রহস্য ভেদ করতে পারলেন না। তবে তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন যে, ঐ এক হাজার বস্তা চাল মূসা সরাসরি রাজার কাছে পাঠান নি। অন্য কেউ হয়তো তাঁর কাছ থেকে কিনে নিয়ে রাজার কাছে পাচার করেছে।

কর্নেল ওয়েলেসলির ওখান থেকে ফিরেই আলিমূসা নিজের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি জাহাজ-বোঝাই করে অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকের সতর্ক পাহারায় আলপুষা প্রভৃতি বন্দরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। এবং পরদিন ভোরেই আসবাবপত্র প্রভৃতি নিয়ে যাওয়ার জন্য আরো একটি জাহাজ যাতে প্রস্তুত থাকে, তারও ব্যবস্থা করলেন।

উনিশ

আজও পর্যন্ত রাজার সেই নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য কাটে নি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর শিবিরে যে কিছু একটা প্রস্তুতি চলছে, সেটা অর্লাত নাম্প্যার বেশ বুঝতে পারেন। সেখানে কাব্যচর্চা, গান, দাবা, এবং মাঝে মাঝে কথাকলিও চলে বটে কিন্তু সাথে সাথে শিবিরে বহুলোকের আনাগোনাও গেছে বেড়ে। এডচ্চেন কুংকনের সঙ্গে রাজা আগেও নিয়মিত আলোচনা করতেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁদের আলোচনা চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। এডচ্চেন কুংকনের নেতৃত্বে নায়ার সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ যে বিভিন্ন গোপন কাজে লিপ্ত, এ কথা নাম্প্যার অজানা নয়। তিনি বুঝতে পারেন যে, রাজা ও এডচ্চেনের এই নিভৃত আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারিত হচ্ছে; প্রস্তুতিপর্ব নিজে তদারক করার জন্য মাঝে দুই তিন বার রাজা বেরিয়েছিলেন। যা হোক, রাজার নীরবতার অর্থ আজকাল যেন নাম্প্যার মোটামুটি আচ করতে পারেন।

আজ সপ্তাহ খানেক হলো, তলক্কল চন্তু পুরলী পাহাড়ে অনুপস্থিত। সেখানে আছেন শুধু এমন নায়ার, এডচ্চেন কুংকন, নাম্প্যার এবং স্বয়ং রাজা সাহেব।

কর্নেল ওয়েলেসলি পৌষ মাসের ষোল তারিখে তলশেরী থেকে চলে যাচ্ছেন। দিন দুই আগে গভর্নর জেনারেলের একটি আদেশপত্র তলশেরীতে এসে পৌঁছেছে। তাতে লেখা আছে মারাঠাদের সঙ্গে শীঘ্রই যে যুদ্ধ শুরু হবে তার সেনাপতিত্বের পদে কর্নেল ওয়েলেসলিকে নিযুক্ত করা হলো।

আদেশপত্রটি রাজার হাতে এসেছে চন্দ্রোত নাম্প্যার প্রেরিত লোকের মাধ্যমে।

এমনি এক পরিস্থিতির মধ্যে দোসরা পৌষ সকালে চোক্করায় ও তলক্কল চন্তু ফিরে এলেন রাজার শিবিরে। চোক্করায় শিবির থেকে বেরিয়ে ছিলেন খালি হাতে, ফিরলেন বহু ধনসম্পদ নিয়ে। রাজা তাঁকে সাদরে আলিঙ্গন করলেন এবং নিজের পাশে নিয়ে বসালেন। অন্যান্যদের উপস্থিতির জন্যে রাজা সাহেব বেশী কিছু না বলে শুধু বললেন, 'যে উদ্দেশে তুমি গিয়েছিলে তা সফল হলো কিনা সে সম্বন্ধে এখন নয় পরে ধীরে সুস্থে সব শোনা যাবে।'

চোক্করায় বললেন, 'আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে সবকিছু হয়তো করে উঠতে পারি নি, তবে ব্যবস্থা একটা করে এসেছি।'

রাজার ইঙ্গিতে তারপর আর তিনি কোনো কথা বললেন না। অভীষ্ট কাজে চোক্করায় কতদূর সাফল্য লাভ করেছেন, তা জানার জন্যে রাজার মন ব্যগ্র হলেও তখনকার মতো তিনি সেই প্রসঙ্গ চাপা রেখে অন্য প্রসঙ্গ তুললেন।

'তুমি হয়তো শুনেছ, কর্নেল ওয়েলেসলি দু সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা যাচ্ছেন। তোমার কথাই শেষ পর্যন্ত ফলল। ওয়েলেসলিকে মারাঠা যুদ্ধের সেনাপতি করার সংবাদ সেখানে থাকতেই পেয়েছি, কিন্তু তিনি কবে যাচ্ছেন সেই তারিখটি এখনো ঠিক জানতে পারি নি।'

'ওয়েলেসলি চলে যাওয়ার পরও তোমাকে এখানে থাকতে হবে। তোমার মর্যাদা একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না। উপযুক্ত মর্যাদাসহকারেই এখানে থাকতে পারবে।'

'আপনার মতো মহান নৃপতির সেবক হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। ওয়েলেসলি চলে যাওয়ার পর আমারও এখানে থাকার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে হলেও না জানিয়ে পারছি না যে এখন তা একেবারে অসম্ভব।'

'কেন?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রাজা সাহেব তাকালেন চোক্করায়ের

চোখের দিকে। কিছুটা অন্যমনস্কের মতো চোক্করায় বললেন, 'মহীশূরের রানী এবং আমার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ রক্ষা করতে বিবেকের দিক থেকে আমি বাধ্য। তাই এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেখানকার পরিস্থিতিও ভালো নয়। কোম্পানীর লোক রাজাধিকারের মূলোচ্ছেদ করেছে। প্রধানমন্ত্রী পূর্ণায়া ইংরেজদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছেন। প্রজাশক্তি নিষ্ক্রিয়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার মতো সাহস কারো নেই। এই অবস্থায় অবিলম্বে ফিরে যাবো, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি।'

'অত্যন্ত খুশী হলাম তোমার কর্তব্যবোধ দেখে, চোক্করায়। যারা আপনজনের সেবায় লাগে না তারা পরের সেবাও করতে পারে না। কিন্তু যাওয়ার আগে তোমাকে একটি কাজ করে যেতে হবে।'

'কি কাজ বলুন?' চোক্করায় জিজ্ঞাসা করলেন। 'বলছি।' ইঙ্গিতে রাজা সাহেব অন্যান্যদের সে-স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে চোক্করায়কে বললেন, 'এবার বল তো, তুমি কতদূর কি করলে।'

'আগে ব্যর্থতার দিকটাই বলি। পূর্ণায়া আমাদের আর সাহায্য করবেন না। কারণ এখন তিনি ইংরেজদের খপ্পরে। অন্যান্য কয়েকজন মন্ত্রীও তাঁর কথামত ওঠে বসে। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। রানী আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু চারিদিকের অবস্থা সে-বিষয়ে বিশেষ অনুকূল নয়।'

চোক্করায়ের কথার মাঝে অন্য কোনো প্রসঙ্গ না তুলে রাজা সাহেব একাগ্র মনে সব কথা শুনতে লাগলেন। চোক্করায় বললেন, 'আমি রসদ এবং যুদ্ধসামগ্রী যথাসময়ে বয়নাড়ুতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। গৌড়বাসীদের সঙ্গে যে শর্তে ব্যবস্থা হয়েছে, তা এই কাগজে লেখা আছে; আমার জিম্মায় তারা বয়নাড়ুর সীমা পর্যন্ত সবকিছু পৌঁছে দেবে ঠিক হয়েছে।'

'ভগবতী শ্রীপোর্কলী এ যাত্রায় আমাদের রক্ষা করলেন।' রাজারমণ সানন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'এখন ইংরেজরা যা খুশি করুক, যাঁকে ইচ্ছা আটকাক, একবার আমরা বয়নাড়ুতে ঢুকতে পারলে দেখা যাক তারা কি করতে পারে।' তারপর আবেগে চোক্করায়কে কাছে টেনে এনে বললেন, 'বন্ধু, আজ থেকে তুমি কোট্টায়ামের কেরলবর্মার ভাই। বিরাট এক বিপদ থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ। তোমার এই উপকাবের কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।'

'কিন্তু মনে আমার খেদ রয়ে গেল। কারণ যতটা আশা করেছিলাম, তার তুলনায় কিছুই করতে পারি নি।'

'এর বেশী আর কি চাই ভাই? ভবিষ্যতের রসদ সম্পর্কে আমাদের আর কোনো দুশ্চিন্তা রইল না। তোমার এই উপকার কি কম হলো! শুধু তাই নয়, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিরাট সাহায্য।'

'যদি আপনি আমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়েই থাকেন তবে অনুমতি দিন, আমি গিয়ে শর্তানুসারে গৌড়বাসীদের সঙ্গে কাজগুলো সেরে আসি।'

'নিশ্চয়ই যাবে, তবে একেবারে নয়। একেবারে যেতে হলে দু সপ্তাহ পরে। আগামী সপ্তাহে ভাবছি কোট্টায়াম গিয়ে রাজমহলে কিছুদিন থাকব। তখন তোমার সাহচর্য আমাকে খুব আনন্দ দেবে।'

চোক্করায়ের আশ্চর্যের সীমাপরিসীমা রইল না রাজার কথা শুনে। রাজমহলের কাছে যে ইংরেজরা দুর্গ নির্মাণ করেছে, সে-কথা তিনি নিজে যেমন জানেন, তেমনি রাজারও অজ্ঞাত নয়। তা সত্ত্বেও কি শান্ত অচঞ্চল দৃঢ়তার সাথে রাজা সাহেব তাঁকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন! অথচ সেখানেই যে থাকেন ইংরেজদের এক শক্তিশালী সেনানায়ক, একথা তো রাজার অজানা নেই।

'কি বললেন? কোট্টায়ামে···? সেখানে তো···'

'হ্যাঁ সেখানেই যাবো, ঠিক করেছি। প্রথমে কোট্টায়ামে না গিয়ে যদি বয়নাড়ুতে যাই তাহলে লোকের ধারণা হবে যে আমি সত্যিসত্যি ইংরেজদের ভয়ে ভয়ে পুরলী পাহাড়ে গিয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছি। সুতরাং আগে সেখানে একমাস থাকব। এইভাবে আমার প্রজাদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে।'

রাজার কথাগুলো চোক্করায় ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। কোট্টায়ামে ইংরেজদের দুর্গ রয়েছে এবং সে দুর্গে সৈনিক আছে প্রচুর। ঐ ধরনের জায়গায় যাবো বললেই আর যাওয়া যায় না। কিন্তু রাজার প্রতিজ্ঞাদৃঢ় কণ্ঠের সিদ্ধান্তও তিনি অবিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই অজানা এক সম্ভাব্য আশঙ্কায় চোক্করায়ের ললাটে চিন্তার রেখা দেখা দিল।

রাজা সাহেব চোক্করাযের আশঙ্কার কারণ বুঝতে পেরে বললেন, 'বন্ধু, আমি জানি, কোট্টায়ামে যাওয়া অত সহজ কাজ নয়। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার সাহায্য পেলে তা সম্ভব হতে পারে।'

এরপর তাদেব মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে গোপন আলোচনা হলো। রাজা তাঁর সমগ্র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা চোক্করায়ের সামনে পরিষ্কার-ভাবে উপস্থাপিত করলেন।

শুনে চোক্করায় বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি সব কিছু করবো। আপনার এই পরিকল্পনা কি আর কাউকে জানিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, শুধু এডচ্চেন কুংকনকে। অন্যদের জানাব সময় মতো।'

চোক্করায়ের সঙ্গে কথাবার্তার পর রাজা এমন নায়ার, অর্লাত নাম্প্যার প্রভৃতি চার পাঁচজন নেতৃস্থানীয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের কাছে একটি গোপন কথা জানাবার আছে। শীগগিরই মঘরব্রত পালনের সময় আসছে। এই ব্রত পালনে ভগবতী শ্রীপোর্কলী খুব সন্তুষ্ট হন। আমি কোট্টায়ামেই

এই উৎসব পালন করব ভাবছি। আমি গিয়ে পৌঁছলে তারপর একে একে তোমরা সেখানে গিয়ে বিভিন্ন সামন্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জমায়েত করার চেষ্টা করবে।'

রাজার কথায় সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। তাঁদের অবস্থা দেখে রাজা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হলো এমন নায়ার ? নীরব কেন ?'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য, তার উপর আমাদের বলার কিছু নেই। এখন কবে রওনা হবেন, তাই জানতে চাই।'

'কি ব্যাপার নাম্প্যার, তোমাকে কেমন যেন ভীত মনে হচ্ছে ?'

'না, ভীত হবার কি আছে। তবে ব্যাপারটা কি রকম যেন অস্পষ্ট ঠেকছে। এ সময়ে কোট্টায়ামে যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। সেখানে বহু ইংরেজ সৈন্য সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে। তাই খুব বিচার বিবেচনা না করে কাজে অগ্রসর হলে হয়তো আশঙ্কার কারণ ঘটতে পারে। তবে ভগবতী শ্রীপোর্কলীর পূজা উপলক্ষে যখন যাচ্ছি তখন আর ভয় কিসের। তাছাড়া আমারও আর চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগছে না।'

রাজা সহাস্যে বললেন, 'নাঃ, নাম্প্যারকে দেখছি আর খুশী করতে পারবো না। আমি চুপ করে থাকলে নাম্পি ভাবে আমার মধ্যে বুঝিবা সেই তেজ নেই, আবার কাছে অগ্রসর হলে বাড়াবাড়ি করছি ভেবে আশঙ্কিত হয়।···ভাণ্ডারী জানিয়েছে রসদ আর নেই। শীগগিরই আমাদের লোকের খাওয়ার খুব অসুবিধা দেখা দেবে। কোট্টায়ামে যেতে পারলে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হবে। সে জন্যেও সেখানে যাওয়া একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে।'

'রসদ যে ফুরিযে এসেছে তা জানি। দেশবাসীর কাছ থেকেও আর সংগ্রহ করে আনা সম্ভব হচ্ছে না। ইংরেজদের একটি দলের রসদ লুঠ করে উন্নিমুপ্পন যা এনেছিলেন তাই দিয়ে চললো এ কয়দিন।'

'হ্যাঁ, দেখো—আমি যে যাচ্ছি একথা যেন কেউ জানতে না পারে। মঘরব্রত উৎসবের একচল্লিশ দিনের দিন আমি কোট্টায়ামের রাজমহলে পৌঁছব। দেশের লোককে বিশেষ করে এইদিন আমি উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করছি বলে বলবে। তবে রাজমহলে আমার থাকার কথা কেউ যেন না জানতে পারে।'

ঠিক সেই সময় জানা গেল কৈনেরী থেকে একজন সংবাদ নিয়ে এসেছে। রাজা এমন নায়ারকে পাঠালেন খবর জানতে। এমন সেই ভিল সংবাদবাহকটির কাছ থেকে খবরটি জেনে এসে রাজাকে জানালেন। সংবাদটি হচ্ছে, কৈনেরী-বাড়ি পুড়ে গেছে এবং গায়ে ফোস্কা পড়াতে ছোটরানী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

এরকম একটি চাঞ্চল্যকর খবর পেয়েও রাজা মোটেই বিচলিত হলেন না। উপস্থিতদের বললেন, 'আচ্ছা এখন তাহলে তোমরা যাও; কোট্টায়ামে আবার সকলের সাথে দেখা হবে।' তাঁদের বিদায় দিয়ে তিনি তলক্কল চন্তুকে ডেকে পাঠালেন।

চন্তু এলে রাজা সাহেব বললেন, 'কৈনেরীর সংবাদ নিশ্চয়ই শুনেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ শুনেছি।'

'আমি এখনই রওনা হবো। যতদিন না আমি ফিরে আসি, ততদিন এখানকাব সবকিছু দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রইল চোক্করায়, কুংকন এবং তোমার উপর। ওখান থেকে আমি এখানকার কোনো কিছু দেখাশোনা করতে পারব না। তারপর আমাদের সকলের সাক্ষাৎ হবে কোট্টায়ামের রাজমহলে।'

'আপনার নির্দেশ মতই সবকিছু চলবে।'

চন্তুকে বিদায় দিয়ে রাজা কুংকন এবং চোক্করায়কে নিজের পরিকল্পনা এবং তা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে তাঁদের দুজনের দায়িত্ব কতখানি তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,

'আমার এখান থেকে যাবার পর বড়রানীকে গোপনে সুরক্ষিতভাবে পাঠিয়ে দিও। আমার সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।'

সৌভাগ্যক্রমে মাক্কম মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেও তাঁর এতবড় দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে বড়রানী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। রাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি অবিলম্বে তাঁকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করলেন। রাজা বললেন, 'আমি নিজেই সেখানে যাচ্ছি। কিছুদিন থাকবো সেখানে। ভগবতী শ্রীপোর্কলীকে দর্শন করতে তুমিও কালকে এখান থেকে রওনা দিও। তোমার যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে গেলাম।'

'আচ্ছা। মাক্কম বড় ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে, এই সময়ে তোমাকে দেখতে পেলে খুব খুশী হবে। আর শোন।' ছোট্ট একটি পুঁটলির ভিতর থেকে এক টুকরো তালপাতা বের করে রাজার হাতে দিয়ে বড়রানী বললেন, 'এতে সব রোগ সারে, তুমি নিজে এটা মাক্কমের হাতে দেবে।'

'আচ্ছা', বলে রাজা বড়রানীর হাত থেকে তালপাতাটি নিলেন।

কুড়ি

কৈনেরীর বাড়ি পুড়ে যাওয়ার পর কাম্মু, মাক্কম এবং নীলুক্কুট্টিকে ভিলদের পাহারায় নিকটবর্তী একটি চণ্ডালবাড়িতে নিয়ে রাখল এবং রাত্রিটা কাটিয়ে খুব ভোরে সেখান থেকে রওনা হয়ে যাবে মনস্থ করল। সেখানে বেশীদিন থাকা ঠিক নয়। তাছাড়া এতদঞ্চলের গ্রামবাসীরাও এখন তাদের বিপক্ষে। কিন্তু তারপরই বা তারা কোথায় যাবে। রাজার কাছে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। অথচ অন্য কোথাও নিয়ে গেলে আম্পু নায়ার হয়তো কি মনে করবেন। আবার গেলে এমন জায়গায় যাওয়া উচিত, যেখানে শত্রুদের শ্যেনদৃষ্টি না পৌঁছতে পারে। নয়তো তারা রাজার উপর তাদের যে আক্রোশ, তা নিশ্চয়ই চরিতার্থ করবে ছোটরানীর উপর দিয়ে। এমন কি তাঁর উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করতেও তারা বিমুখ হবে না। এইসব ভেবেচিন্তে কাম্মু ঠিক করল, ছোটরানী এবং নীলুকে দিন কয়েকের জন্য চন্দ্রোত নাম্প্যারের বাড়িতে নিয়ে রাখবে।

পাহারারত ভিলদেরও সেই ইচ্ছা। তারা পালকিতে করে মাক্কম ও নীলুক্কুট্টিকে নিয়ে খুব ভোরে গাঁ থেকে বেরিয়ে পড়ল। দুপুর নাগাদ তারা পৌঁছল পান্নুর। পালকিটা খেতের এক ধারে রেখে কাম্মু আগে গেল চন্দ্রোতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। খাওয়া-দাওয়া সেরে চন্দ্রোতবাবু তখন আরামকেদারায় বিশ্রাম করছিলেন। ছোটখাট ব্যাপারে এই সময়ে চাকররা তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস করে না। কিন্তু কৈনেরী থেকে তাঁরা এসেছেন শোনায় তাদের আর

কোনো বাধা রইল না তাঁকে এ খবর জানাতে। খবর পেয়ে চন্ত্রোত নাম্প্যার নিজেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

চাকররা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর কাম্মু নিভৃতে তাঁর কাছে সমগ্র ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করল।

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করে চন্ত্রোত নাম্প্যার বললেন, 'এটা যে চন্তু নায়ারের কাজ, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। আর গ্রামবাসী যে কেন ছোটরানীর বিপক্ষে তাও আমার অজানা নয়। যাক, তাড়াতাড়ি ওদের নিয়ে এসো, আমি ওদিকে সব ব্যবস্থা করছি।'

'পালকিবাহকরা সব ভিল। তাই ভাবছি···'

পালকি করে মাক্কমদের নিয়ে আসার জন্য চন্ত্রোতবাবু তাঁর নিজের কয়েকজন চাকরকে পাঠালেন। তারপর অসুস্থ ছোটরানীকে রাখার উপযোগী একটি ঘর গুছিয়ে রাখলেন। ছোটরানীর আগমন বা তাঁর অসুখ সম্পর্কে বাইরে যাতে কোনো আলোচনা না হয়, তার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন। তাঁর শুশ্রূষার ভার দেওয়া হলো উন্নির উপর। উন্নি সানন্দে এই সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করল।

ছোটরানীকে পর্যঙ্কে শোয়ান হলো। তাঁর শরীরের কয়েকটি জায়গা ঝলসে গেছে। বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখাচ্ছে তাঁকে, জ্বরও হয়েছে। তাঁর এই অবস্থা দেখে চন্ত্রোত নাম্প্যার বললেন, 'এখন কোনোরকম নড়াচড়া করা একেবারে অনুচিত, সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। এমন সময়ে তাঁর নজর পড়ল নীলুক্কুট্টির উপর। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এই মেয়েটি কে?'

'আম্পুবাবুর ভাগনী।'

'আর তুমি?'

'আমি··· '

উন্নিকে দেখিয়ে কাম্মু বলল, 'ও আমার দিদি।'

চন্ত্রোত নাম্প্যারের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান ছিল।

ছোটরানীর ওষুধ-পথ্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে তিনি আম্পু নায়ারের কাছে লোক পাঠালেন এই সংবাদ দেবার জন্যে।

নিজের ভায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন পর দেখা হওয়ায় উন্নি আনন্দিত হলো। এই সাক্ষাৎকার তার কাছে ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। তাছাড়া ছোটরানীকে সেবা করার যে সুযোগ সে আজ পেলো, তাতে তার মন আরো খুশীতে ভরে গেল। রাজার অন্যতম প্রিয় সহধর্মিণী মাক্কমের সঙ্গে তার এই সাক্ষাৎকার তার কাছে একটা সৌভাগ্যের বিষয় বলেই মনে হয়। শুধু তাই নয়, মাক্কম আবার তারই প্রেমাস্পদ আম্পু নায়ারের বোন। সুতরাং তাকে সেবা করার সুযোগ পেয়ে উন্নি নিজেকে ধন্য মনে করে। সেবাকার্যে সামান্যতম ত্রুটিও যাতে না ঘটে, সেদিকে সর্বক্ষণ সে সজাগ থাকে। মুহূর্তের জন্যও সে মাক্কমের কাছছাড়া হয় না। এই সুযোগে নীলুক্কুট্টির সঙ্গেও তার আলাপ পরিচয় হয়। তার কাছ থেকে উন্নি জানতে পারে যে তাকে দেখাশোনা করতে জগতে মাক্কম ছাড়া তার আর আপনজন কেউ নেই। এ ছাড়া কাম্মুর সম্পর্কেও তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। এক সময়ে নীলু সগর্বে বলে, 'ইতিমধ্যে একদিন রাত্রে রাজা কৈনেরী গিয়েছিলেন। সেদিন কাম্মু চন্তু নায়ারের মতো বীরকেও প্রতিরোধ করতে পিছপা হয় নি। রাজা সেদিন সন্তুষ্ট হয়ে কাম্মুকে খুব প্রশংসা করেছিলেন।'

কাম্মুর প্রতি মেয়েটির আকর্ষণ ও গভীর ভালোবাসা তার কথার সুরেই উন্নি বুঝতে পারল।

ছোটরানীর চন্ত্রোতে আগমনের পরদিন সন্ধ্যায় এক বিখ্যাত কথাকলির দল সেখানে আসে। কথাকলির প্রতি চন্ত্রোতবাবুর তেমন কোনো আকর্ষণ না থাকলেও তৎকালীন সম্ভ্রান্তদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি এই দলকে সেখানে কথাকলি প্রদর্শনের অনুমতি দিলেন। 'কেলিক্কোট্টার' (কথাকলি শুরু হওয়ার আগে প্রারম্ভিক বাদ্যানুষ্ঠান। সন্ধ্যায় সময় এই কেলিক্কোট্টা শুনে দূরদূরান্তের লোকে

জানতে পারে, কোথায় কথাকলির অনুষ্ঠান হবে। তিন চার ঘণ্টা ধরে এই বাজনা চলে, এবং তার ফলে দর্শক সমাগমও হয় প্রচুর।) পরে তাদের অধিকারীকে ডেকে চন্দ্রোত্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্ পালা হবে?'

'তিরুবনন্তপুরমের একজন নায়ারের রচিত চার খণ্ডে সম্পূর্ণ 'নলচরিতের' তৃতীয় খণ্ড দেখান হবে। অভিশপ্ত নলের ভূমিকায় অভিনয় করবে আমাদেরই সঙ্ঘের একজন সুনিপুণ অভিনেতা। অনুগ্রহ করে তার অভিনয় নৈপুণ্য দেখবেন এই আমার বিনীত নিবেদন।'

'আচ্ছা, তা দেখবো, কিন্তু একটি কথা। সারারাত জাগিয়ে রাখার ব্যবস্থা করো না। রাত জাগা আমার সহ্য হয় না।'

'না, সে কষ্ট আপনাকে পোহাতে হবে না।'

এর পর কথাকলি শুরু হলো। চন্দ্রোত নাম্প্যার নিজের আসন গ্রহণ করলেন। শুরুতে নলের ভূমিকায় যে অভিনয় করেছিল তার অভিনয় চন্দ্রোত নাম্প্যারকে ততখানি নাড়া দিতে পারে নি, কিন্তু কিছুক্ষণ পর রঙ্গমঞ্চে অভিশপ্ত নলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন হলো, সাগ্রহে পাষাণমূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে তিনি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন অভিশপ্ত নলের অভিনয়।

হঠাৎ তাঁর মনে একটি সন্দেহ দেখা দিল। কিছুক্ষণ তিনি সেই অভিনেতাটির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সেখান থেকে উঠে অন্দরমহলে গিয়ে ঐ অভিনেতাটিকে ভিতরে ডেকে আনার জন্যে লোক পাঠালেন।

কৃতাঞ্জলিপুটে শিল্পীকে নমস্কার করে চন্দ্রোত নাম্প্যার বললেন, 'আগে থেকে কোনো খবর না দিয়ে আপনি হঠাৎ এভাবে এসে পড়ায় আমি বড় ব্যথা পেয়েছি।' নাম্প্যারের কথার মধ্যে অনুযোগের সুরও যেন ছিল।

অভিশপ্ত নলের ভূমিকা থেকে রাজা তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায়

ফিরে এলেন। ইঙ্গিতে পার্শ্বচরকে সে স্থান ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়ে চন্ত্রোত নাম্প্যারকে তিনি নিভৃতে বললেন, 'ওসব কথা পরে হবে। তার আগে শুনি, মাক্কমের অবস্থা কি রকম।'

'ভগবতী শ্রীপোর্কলীর কৃপায় ছোটরানীর এক বিরাট ফাঁড়া কেটে গেছে। শরীরে কয়েকটি জায়গায় ফোসকা পড়েছে, ওষুধ লাগান হয়েছে। জ্বর ছিল, তবে এখন আর নেই।'

'তাকে কোথায় রাখা হয়েছে?'

'ভিতরে একটি ঘরে।'

'যাই, দেখে আসি।'

'কিন্তু এই পোশাকে?'

'ঠিক কথা মনে করেছ,' রাজা সাহেব বললেন।

'হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে পোশাক বদলে যেতে পারেন। এখানে সব ব্যবস্থা আছে।'

রাজা সাহেব মনে মনে চন্ত্রোত নাম্প্যারের প্রশংসা করলেন। কিছুক্ষণ পর নাম্প্যার ছোটরানী যে ঘরে আছেন সেই ঘরটি রাজাকে দেখিয়ে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাজা সাহেব ঘরে ঢুকলেন।

একটি প্রদীপ জ্বলছে সে ঘরে। ঘরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে তার আলো। মাক্কম গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। রাজা দেখেন, একটি যুবতী ছোটরানীকে বাতাস করছে। অপরিচিত পুরুষকে ঘরে ঢুকতে দেখে রাগত কণ্ঠে উন্নি বলল, 'এক্ষুণি বেরিয়ে যান এ ঘর থেকে। এটা ছোটরানীর শয়নকক্ষ।'

'আস্তে কথা বল, ঘুম ভেঙে যাবে যে। ভয় পাবার কিছু নেই, আমি শুধু একটি বার দেখে চলে যাবো।'

উন্নি তৎক্ষনাৎ মেঝেতে ঘুমন্ত নীলুক্কুট্টিকে জাগিয়ে তুলল। চোখ খুলেই নীলু দেখে, সামনেই রাজা দণ্ডায়মান। তৎক্ষনাৎ সে হকচকিয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং রাজাকে প্রণাম করে। অপরিচিত এই

ভদ্রলোকটি যে কে, উন্নি এতক্ষণে তা বুঝতে পারল। তখন দুজনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

রাজা সাহেব তখন তক্তাপোশের এক কোণে বসে ছোটরানীর গায়ে হাত দিয়ে দেখেন, তখনো কিছুটা জ্বর আছে। গায়ে হাত পড়তেই মাক্কমের ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো তিনি নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলেন। ঠোঁটের কোণে তাঁর ফুটে উঠল শুধু স্নিগ্ধ হাসি। মনে হলো, স্বপ্নে যেন সম্ভোগ সুখ উপভোগ করছেন তিনি। অপরপক্ষে রাজার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল তাঁর অন্তরের মমতা, ভালোবাসা ও সহানুভূতির ছায়া।

মাক্কম কিন্তু এক অনির্বচনীয় আনন্দে বিভোর হয়ে রইলেন। তন্দ্রার ঘোরে আস্তে আস্তে তার ঠোঁট নড়তে লাগল—অস্ফুট শব্দের চলতে লাগল গ্রন্থনা। রাজার ইচ্ছা করল কান পেতে শুনতে। অনেক চেষ্টা করে ছোটরানীর মৃদু কণ্ঠ শুনতে পেলেন, 'আমি এখন তোমার কাছে নেই, কিন্তু তোমার মনে তো আমার স্থান আছে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। লোকে আমার নামে যা ইচ্ছা রটাক, তাদের সে সব কথা আমি কানে তুলি না। মৃত্যুর আগে একটিবারও যদি তোমার দেখা পেতাম, তবে আমার আর কোনো দুঃখ থাকতো না।'

রাজা বুঝতে পারলেন ছোটরানী কার সম্পর্কে এ সব কথা বলছেন। তিনি বললেন, 'মাক্কম, তোমাকে লোকে যা খুশি বলুক, আমি তোমাকে চিনি। আমি জানি, তুমি আমার, একান্তভাবেই আমার।'

মাক্কম চোখ খুলে দেখেন, রাজা তাঁর সামনে। কেমন যেন স্বপ্ন বলে মনে হলো তাঁর। তারপর 'এসেছ' বলে ব্যস্তসমস্তভাবে বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা করলেন।

'না না তুমি শুয়ে থাক।' রাজা তাঁকে উঠতে দিলেন না। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মাক্কম এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হলেন,—তাহলে তিনি স্বপ্ন দেখছেন না, রাজা সত্যিই তাঁর পাশে উপবিষ্ট। তিনি বললেন, 'আবার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এলে? মনে নেই; সেবার কতবড় এক

বিপদ গেল! কিন্তু আজ আমি নিজেকে বড় ধন্য মনে করছি, কারণ ভগবতীর কৃপায় তোমার দেখা পেলাম।'

'তোমার ডাকে আমি যে কোনো বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সাড়া দেবো চিরকাল। তবে আমাদের এ দুর্দিন আর বেশী কাল স্থায়ী হবে না। দিন কয়েক পর থেকেই আমরা সবাই আবার একসঙ্গে থাকতে পারবো।'

রাজা সাহেবের কথায় মাক্কম এমনই অভিভূত হলেন যে, তিনি এর পর কোনো কথা বলতে পারলেন না।

রাজা পুনরায় বললেন, 'সেরে উঠলেই তোমাকে কোট্টায়ামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি।'

'তাহলে এখন রাজধানীতে ফিরে যেতে পারবে। এতদিন তোমার সম্পর্কে লোকের মুখে যা শুনেছি, বিন্দুবিসর্গও তার বিশ্বাস করতে পারি নি। ও সব কথা ভুলেও কোনোদিন মনে স্থান দিইনি। কিন্তু এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে শেষ পর্যন্ত কিনা ঐ নীচ ইংরেজদের কাছে পরাজিত হতে হলো?'

'পরাজিত হয়েছি তোমাকে কে বলল? এটা জেনে রেখো, কেরলবর্মা কখনো ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে কোট্টায়ামে থাকবে না।'

'তাহলে আমার মনে আর কোনো খেদ নেই। বাড়ি পুড়ে গেছে, যাক; তুমি আছ, অমন বাড়ি অনেক হবে। আমার এই ক্ষত, তাও একদিন সেরে যাবে। কিন্তু একবার রাজ্য খুইয়ে ঐ নীচদের কাছে মাথা নত করলে কোনোদিন আর সে মাথা তোলা যাবে না।'

'তোমার কথা শুনে সত্যিই আজ আমি গর্ব বোধ করছি। কৈনেরীর বাড়ি পুড়ে যাওয়ার খবরটা আমার কাছে এলো বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। তারপর থেকে কতবার তোমার নীরব আহ্বান শুনেছি অন্তরের মাঝে। তাই আজ সে ডাকে আর সাড়া না দিয়ে

পারলাম না, ছুটে এলাম তোমার কাছে। এখন বিশ্রাম করো, কামনা করি, সেরে ওঠ। এখন তাহলে আসি।'

'চলে যাচ্ছ?' করুণ কণ্ঠে মাক্কম বললেন।

'ভালো কথা, বড়রানী তোমার জন্যে সন্ন্যাসীর দেয়া একটি মন্ত্র পাঠিয়ে দিয়েছে, বলেছে—তালপাতাটি সব সময়ে তোমার কাছে রাখতে। এর জোরে নাকি সব রোগ সেরে যায়।'

'আমার উপর দিদির খুব টান। এত টান বোধ হয় তোমারও নেই। কোথায় সেই তালপাতা, দাও।'

রাজা তালপাতার টুকরোটি মাক্কমের হাতে দিলেন। সেটি দেখে মাক্কম হাসতে হাসতে বললেন, 'এটি হাতে নিয়ে মনে হচ্ছে সত্যিই আমার রোগ সেরে যাবে।'

'এমন কী মন্ত্র আছে ওতে দেখি?'

'আমি পড়ছি।'

'না, এই অসুস্থ শরীরে তোমাকে পড়তে হবে না। দাও আমার হাতে।'

'নিতে চাও নাও, তবে ও-শ্লোক আমার মুখস্থ আছে।'

কথাটি বলেই ছোটরানী তাঁকে উদ্দেশ্য করে রাজার রচিত সেই শ্লোকটি পাঠ করেন।

'হয়েছে, হয়েছে। বুঝেছি। কুজ্ঞানী শেষ পর্যন্ত এই মন্ত্রই তোমার জন্যে পাঠিয়েছে! নাও এবার শুয়ে পড়ো।' তারপর অদূরে দণ্ডায়মান নীলুক্কুট্টির দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, 'ভালোভাবে দেখা-শোনা করো, কেমন?' নীলুক্কুট্টি দূর থেকে কাছে এসে বিনম্র স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'নিশ্চয়ই করবো। তবে আমি আর কতটুকু করছি, সবই তো করছেন ঐ উন্নিদি। এক মুহূর্তের জন্যও উন্নিদি ছোটরানীর কাছ ছাড়া হন না। ঘুম নেই খাওয়া নেই, ঠায় এখানে বসে ওঁর শুশ্রূষা করছেন।'

মাক্কম বললেন, 'উন্নি আমার ছোট বোন, নিষ্কলঙ্ক একটি পদ্ম ফুলের মতো মেয়েটি।'

উন্নি আনত মস্তকে সলজ্জভাবে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল।

'ও, এরই নাম উন্নি? আমি আম্পুর কাছে শুনেছি, কি ভাবে তুমি তাকে নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছ। তার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

উন্নি আনন্দে বিহ্বল হয়ে নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল অদূরে। কোনো কিছু বলার মতো ভাষা খুঁজে পেলো না সে।

মাক্কম বললেন, 'সেকি? উন্নি আম্পুকেও বাঁচিয়েছে বিপদের থেকে?'

'এখন এসব থাক। তুমি এখন বিশ্রাম করো। তারপর সেরে উঠে বিস্তারিতভাবে সব কিছু জেনে নিতে পারবে। আর ভালো কথা, তুমি যখন কোট্টায়ামে যাবে, তখন উন্নিকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলো না। সেখানেই কোনো এক নির্দিষ্ট শুভ দিনে তার কাজের মধ্যে দিয়ে কেরলবর্মা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা।'

মাক্কমের ঘর থেকে বেরিয়ে রাজা দেখেন, চন্দ্রোত নাম্প্যার এবং আম্পু নায়ার সেখানে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আম্পু, কতক্ষণ এসেছ?'

'এই মাত্র এসেছি। চন্দ্রোতবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আশা করি, আর কোনো আশঙ্কার কারণ নেই।'

আম্পুর শেষ কথাটি মাক্কম সম্পর্কে অনুমান করে রাজা সাহেব বললেন, 'না, আশঙ্কার কিছু নেই। এখন সামান্য একটু জ্বর আছে বটে, আশা করি, দু-তিন দিনের মধ্যেই সেরে উঠবে। যাক, এখন তুমি এলে কোত্থেকে?'

'তলশেরী থেকে।'

'ওখানকার নতুন কোনো খবর আছে? কর্নেল ওয়েলেসলির যাওয়ার তারিখের কোনো রদবদল হয় নি তো?'

'আজ্ঞে না। যাত্রার তোড়জোড় চলেছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাদের কাছে তিনি নাকি ভালোভাবে নিজের নীতি ব্যাখ্যা করে জানাবেন, পরিচালনার কায়দা-কানুন বুঝিয়ে দেবেন। শুনলাম দেশের প্রভাবশালী নাগরিকেরাও সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছে।"

'তাদের এই সম্মেলন কবে হচ্ছে ?'

'বার তারিখে। সৈন্যবাহিনীর বড় বড় অফিসারদের এগার তারিখের মধ্যেই তলশেরীতে উপস্থিত হতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।'

'এ সংবাদ সঠিকভাবে জেনে এসেছ তো ? এ সম্পর্কে, নাম্প্যার তুমি কিছু জানো নাকি ?'

'জানি। ওরা যে আমাকেও আমন্ত্রন জানিয়েছে।'

'সেকি ? তাহলে আর আমাকেই বা বাদ দিল কেন ওরা ? না, এবিষয়ে দেখছি গভর্নর জেনারেলের কাছে অভিযোগ করে পত্র লিখতে হবে।'

আম্পু বললেন, 'আর একটি মারাত্মক খবর আছে। আমাদের সাহায্য করে বলে তারা যার নাম পাচ্ছে তাকেই আটক করে জেলে পুরছে। চিরুতাক্কুট্টির সম্পর্কেও জোর তদন্ত চলছে। কর্নেল যাওয়ার আগেই নাকি তাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে যাবেন।'

কথাটা শুনেই বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে রাজা বললেন, 'সে কি ? ওরা কি মেয়েদেরও বাদ দেবে না ? এই দেশে বসে এই দেশেরই মেয়েদের ফাঁসি কাঠে ঝোলাবে ? স্পর্ধা তো কম নয় !'

চন্ত্রোত নাম্প্যার বললেন, 'চিরুতাক্কুট্টিকে ফাঁসি দেওয়ার কথা শুনতেও গা শিউরে উঠছে। বেচারী আমাদের কত সাহায্য করেছে। সেবারে উন্নিকে মুক্ত করার ব্যাপারে…'

'আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি একটি জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। এখন আমার যাওয়ার সময় হলো। নাম্প্যার তোমাকে একটা কথা বলার আছে।'

চন্দ্রোত নাম্প্যার রাজার নির্দেশ শোনার জন্য এগিয়ে এলেন। রাজা সাহেব বললেন, 'আম্পু, কথাটা তোমাকেও বলছি। উৎসবের একচল্লিশ দিনের দিন পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কোট্টায়ামে আমাকে পৌঁছতে হবেই। আমি চাই, সেদিনের সেই উৎসবে দেশের যত প্রভাবশালী লোক, সবাই উপস্থিত থাকুক। তাছাড়া, সর্বসাধারণের কাছে আবেদন জানাবে এই উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্য। নাম্প্যার, তোমাকেও সেখানে সদলবলে উপস্থিত হতে হবে। অতীতের যে কোনো উৎসবের চেয়ে এবারকার উৎসবকে আরো জাঁকজমকের সঙ্গে সফল করে তুলতে হবে।'

প্রত্যুত্তরে চন্দ্রোত নাম্প্যার এবং আম্পু নায়ার 'যে আজ্ঞে' ছাড়া আর কিছুই বললেন না।

একুশ

কর্নেলকে বিদায়দানের আয়োজন চলতে থাকে পূর্ণোদ্যমে। যাওয়ার সংবাদে সেনানায়করা যেমন দুঃখিত, তেমনি সিভিল অফিসাররা হয়েছেন উল্লসিত। সুপারভাইসারের আনন্দও কম নয়। তাঁর ধারণা, যতদিন কর্নেল ওয়েলেসলির মতো লোক তলশেরীতে থাকবেন, ততদিন তাঁর নিজেকে থাকতে হবে সূর্যালোকের মাঝে প্রদীপ-শিখার মতো। তাই কর্নেলের উপর তাঁর ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ছিল খুবই বেশী। ইতিমধ্যে তিনি কর্নেলকে এখান থেকে সরিয়ে নেবার জন্য বোম্বাই সরকারের কাছে গোপনে নানা ভাবে সুপারিশও করেছেন। এখন ওয়েলেসলির সেই ফিরে যাওয়ার বিষয়টি পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গেছে। এমন কি দিনও নির্দিষ্ট হয়েছে। তাই বেবর কর্নেলের এই বিদায়কালে তাঁকে একটু খুশী করা নিজের ভবিষ্যতের পক্ষে লাভজনক ভেবে তাঁর বিদায় উৎসবের ব্যাপক আয়োজনের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

লুঈ পেরেরার হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ার পিছনে কর্নেলের কোনো চক্রান্ত ছিল বলে বেবরের ধারণা। এ বিষয়ে চিরুতাকুট্টি সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। বার বার তার খোঁজ নেওয়ার জন্য বেবরকে সে উত্যক্ত করে তুলতো। বেবর বলতেন, 'অত দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। দু-চার দিনের মধ্যেই ওয়েলেসলি তো চলে যাচ্ছে। তখন সব ব্যবস্থা হবে।' ইতিমধ্যে নিজের গুপ্তচরের মাধ্যমে বেবর জানতে পারেন যে, কর্নেলের নির্দেশে সিক্কুবেরা

চিরুতাক্কুট্টি সম্পর্কে গোপনে তদন্ত করছে। চিরুতাকে কোনো চক্রান্তে জড়িত দেখানোই যে ওয়েলেসলির উদ্দেশ্য, সেটা বেবরের বুঝতে বাকি থাকে না। এবং তিনি এও বুঝতে পারেন যে, কিছু সাক্ষী-প্রমাণ সাজিয়ে চিরুতাকে শাস্তি দেওয়াই এই তদন্তের উদ্দেশ্য। তাই এমতাবস্থায় লুঈ পেরেরা সম্পর্কে আর কোনো খোঁজখবর না নেওয়াই তিনি যথার্থ কর্তব্য বলে মনে করেন।

সিক্কুবেরার তদন্ত সমাপ্ত হলো। চিরুতা সম্পর্কে সে প্রয়োজন মতো প্রমাণ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। চিরুতা যে তলশেরীর ইংরেজ পক্ষের সমস্ত গোপন খবর অন্য একজন লোকের মাধ্যমে গোপনে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়, সে সম্পর্কে সে প্রমাণ পেয়েছে। কিন্তু এই 'অন্য' লোকটি যে কে, তার কোনো হদিস সে পায় নি। সেই লোকটিই নাকি তলশেরীতে এসে চিরুতার কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়। চন্তু নায়ার সিক্কুবেরার কাছে শপথ করে বলেন, 'চিরুতাক্কুট্টির হাতে আমি কেরলবর্মার নিজের আংটি পর্যন্ত দেখেছি।'

শুধু চিরুতা সম্পর্কেই নয়। আলীমূসা মারাক্কার সম্পর্কেও তদন্ত করেছিল সিক্কুবেরা। কিন্তু সে বিষয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। চিরুতার সঙ্গে মূসার ব্যবসাগত প্রমাণ পেলেও অন্য কোনো সম্পর্কের প্রমাণ পায় নি।

প্রমাণপত্রসহ সমস্ত কিছু সিক্কুবেরা কর্নেল ওয়েলেসলির কাছে উপস্থাপিত করল। কর্নেল সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করে বললেন, 'তাহলে আর দেরি করা উচিত নয়। এই মুহূর্তে চিরুতাকে গ্রেপ্তার করে আনতে হবে।'

'একটু অসুবিধা আছে। আমরা যে গোপনে তদন্ত করছি সেটা চিরুতা টের পেয়েছে বলে আমার ধারণা। সে থাকে বেবরের নিজস্ব বাংলোয়। আমাদের সৈন্যদের বেবর নিজের বাংলোর ত্রিসীমানায় পা দিতে দেবেন না। এর সঙ্গে অবশ্য আলীমূসার কেস্‌টাও

জড়িয়ে ফেলতে পারলে খুব ভালো হতো। তাহলে কেস্‌টা জোরদার হতো।'

'কথাটা শোনাচ্ছে ভালো কিন্তু ধোপে টিকবে না। কারণ মূসার বিরুদ্ধে এ জাতীয় কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তাছাড়া তার কাছ থেকে আমাদের প্রায়ই সাহায্য নিতে হয়। তাই এরকম অবস্থায় সরাসরি তার সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করা অনুচিত।'

'তাহলে চিরুতাকে গোপনে প্রয়োজন হলে জোর করে সুপার-ভাইসারের বাংলো থেকে আনা ছাড়া উপায় নেই—ঠিক যেভাবে পেরেরাকে এনেছিলাম।'

'সুপারভাইসারের বাংলোয় ওসব করা সম্ভব হবে না। আমার কাছে সেটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা এক কাজ করো, তুমি এক্ষুণি বেবরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। বলো, তার সঙ্গে আমার একটা জরুরী বিষয় আলোচনা আছে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুপারভাইসার বেবর এলেন ওয়েলেসলির সঙ্গে দেখা করতে। এবং নমস্কার বিনিময়ের পর উভয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

কর্নেল বললেন, 'বেবর, আপনি এ সময় যে? নতুন কোনো খবর আছে? আপনার ওদিকের সব কুশল তো? যাক, এটা আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের বিষয় যে এখান থেকে আমার চলে যাওয়ার আগেই আমি পয়শীর রাজাকে দমন করে যেতে পারছি। তাকে যে পরাস্ত করে যেতে পারছি, এটা সত্যিই আমার পক্ষে গর্বের বিষয়।'

'আপনি এখান থেকে ফিরে গিয়ে উচ্চতর পদে উন্নীত হবেন এটা আমাদের কাছে সত্যিই খুব আনন্দের সংবাদ। আমার মতো সাধারণ একজন লোকের পক্ষে এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, অদূর ভবিষ্যতে মারাঠা যুদ্ধে যিনি আমাদের সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কপদে উন্নীত

হতে যাচ্ছেন, তিনি আমার পরিচিত। কিন্তু এখানে আমাদের সমস্ত বিরোধীদের দমনে সাফল্য লাভের ব্যাপারে আপনার যে সিদ্ধান্ত সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।'

'কিন্তু সে সন্দেহ প্রমাণসহ নয়। এখানকার সামন্ত প্রভৃতি প্রভাবশালীরা সবাই আমাকে কথা দিয়েছে যে, রাজার সঙ্গে তারা কোনো যোগাযোগ রাখবে না, কোনো বিদ্রোহীকেও তারা সাহায্য করবে না। অপর পক্ষে রাজার শিবিরে রসদ সরবরাহ বন্ধ হয়েছে, এমন কি স্বয়ং কেরলবর্মারও কোনো দিকে কোনো গতায়াত সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। এক কথায় বলতে গেলে, কোথাও কোনো বিদ্রোহের চিহ্নই আর আমার নজরে পড়ছে না।'

বেবর কর্নেলের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'আমার মনে হয়, আপনার বক্তব্য বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য নয়। পয়শীর রাজা কেরলবর্মা যে দীর্ঘকাল যাবৎ নিশ্চেষ্ট রয়েছেন, এ কথা সত্য, কিন্তু এই আপাত নিশ্চেষ্টতার পিছনে তাঁর কি উদ্দেশ্য আছে, সে সম্পর্কে আপনি বোধ হয় সচেতন নন। অবশ্য আপনার সম্পর্কে এ কথা ভাবতেও আমার কুণ্ঠা বোধ হয়। আপনার সিদ্ধান্ত যদি সত্যই হয়, তাহলে এত বেশী গুপ্তচর নিযুক্ত করার কী প্রয়োজন থাকতে পারে?'

বেবরের শেষের কথায় যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে তা কর্নেলকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। কিন্তু যথাসম্ভব সংযতভাবে তিনি বললেন, 'আপনি কি শুনেছেন বলুন তো? রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিপজ্জনক হলে অবিলম্বে সেটা আপনার জানানো উচিত।'

বেবর মুরুব্বীর হাসি হেসে বললেন, 'গত সারাটা মাস ধরে রাজা প্রকাশ্যে কিছু করেন নি বটে, কিন্তু গোপনে যা করেছেন তা ধারণাতীত। সারাটা বয়নাড়ু এখন তাঁর মুঠোর মধ্যে। এই এক মাসের মধ্যে তিনি সেখানে স্থায়িভাবে ঘাঁটি গেড়েছেন। মহীশূর, কয়ম্বতুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও রসদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছেন।

এখন ঐ বয়নাড়ু থেকে আমাদের এই অঞ্চলের উপর আক্রমণ চালানো কি খুব কঠিন কাজ ?'

বেবরের কথায় ওয়েলেসলি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি কল্পনাই করতে পারেন নি যে রাজা গোপনে এভাবে প্রস্তুতি চালিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরই উপর এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করবেন। কর্নেল জানতেন যে, বয়নাড়ুর পাহাড়ে জঙ্গলে গুহায় যুদ্ধ করা ইংরেজ সৈন্যের সাধ্যাতীত। ঐ গভীর ভয়ঙ্কর অরণ্য বাইরের লোকের পক্ষে যেন যমপুরীর দিকে সোজা সড়ক। ঐ অঞ্চল থেকে রাজা যাতে কোনোরূপ সাহায্য না পান তার জন্য এক সময় এমন নায়ারকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। সেই বয়নাড়ুতে রাজার আগমনের কথা কর্নেল এখনো যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। আর এলেও যে তারা রসদ পাবে না—এ বিষয়ে যেন তিনি নিঃসন্দেহ। তিনি বললেন, 'আপনি হয়তো শুনেছেন এক, বলছেন আর এক। কেরলবর্মা বয়নাড়ুতে থাকলে তাকে জালে পড়া মাছের মতো ছটফট করে মরতে হবে। আমি সেখানে রসদ এবং হাতিয়ার যেতে দেবো না।'

'আপনি সেই আশায় থাকুন আমার আপত্তি নেই। আমি যা শুনেছি তাই বলেছি। তবে একটি কথা বলে রাখি, কেরলবর্মা শুধু রসদই নয়, যা কিছু তাঁর দরকার তার সমস্ত কিছুরই তিনি ব্যবস্থা করেছেন। যে কোনো মুহূর্তে তিনি সেখান থেকে আমাদের উপর অভিযান চালাতে পারেন।'

'আমি যতদিন এখানে আছি, ততদিন ঐ ধরনের কিছু হবে না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারেন। তবে আমার বিদায়ের পর ভবিষ্যতে যদি কিছু হয়, তার জন্য আমি দায়ী হবো না, হবে—তার পরে যারা এখানে থাকবে—তারা।'

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক স্বরে তৎক্ষণাৎ বেবর বললেন, 'ও, এখন বুঝেছি আপনাব উদ্দেশ্য। আপনি শুধু একটা মিথ্যা জয় ঘোষণা করে

কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পেতে চান। অনেক দিন আগেই আমার এ বিষয়ে মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু আজ আপনার এই কথার পরে আমার সেই সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে।'

কর্নেল এইমাত্র যা বলে ফেললেন, সেটা ঐ রকম খোলাখুলিভাবে না বলাই উচিত ছিল। ভেবে তিনি অনুতপ্ত হলেন। তাঁর ঐ কথার পর বেবর তাঁর প্রতি যে উপেক্ষার মনোভাব দেখালেন, তাতে তাঁর সমগ্র অন্তর অসহ্য ক্রোধে ফুঁসে উঠল। তিনি বললেন, 'ব্যস্, আসুন, খুব হয়েছে। আর নয়। আপনার মনে রাখা উচিত কার সঙ্গে কথা বলছেন।'

বেবর বুঝতে পারলেন, তাঁর কথা কর্নেলের মনের একেবারে মর্মস্থলে গিয়ে আঘাত করেছে। তবু তিনি বললেন, 'খুব জানি। না জেনে উপায় আছে! আমি কথা বলছি মাননীয় গভর্নর জেনারেলের ভাইয়ের সঙ্গে। আর সত্যি কথা বলতে কি, ঐ জোরেই তো আপনি এত মেজাজ দেখাচ্ছেন।'

আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন সামনাসামনি ওয়েলেসলিকে এতখানি তাচ্ছিল্য করে নি। তেজস্বী এবং নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে অটল বিশ্বাসী ওয়েলেসলির মনে বেবরের কথাগুলি যেন এক একটি স্ফুলিঙ্গের মতো গিয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই ওয়েলেসলির মনে হলো যে, বেবরের মতো লোকের সঙ্গে এই জাতীয় বাদপ্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া নিজের সম্মান ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে হানিকর। তাই ক্ষণকাল পরেই তিনি শান্ত ও সংযত কণ্ঠে বললেন, 'সুপারভাইসার মশাই, আমি আপনার এই ধৃষ্টতাপূর্ণ কথার উত্তর দিতে এখন অনিচ্ছুক। যাক, কেরলবর্মা সম্পর্কে যে কথা হচ্ছিল, সে বিষয়ে ফিরে যাওয়া যাক। আপনি যা বলছেন, তদনুযায়ী পয়শীর রাজা যদি সবকিছুর ব্যবস্থা করেই থাকেন তবে তার জন্য দায়ী তলশেরীস্থিত আমাদের কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক লোক। আমি

বিশ্বাস করি, রাজার দলের সঙ্গে আপনার কোনো যোগাযোগ নেই ; কিন্তু আপনার সঙ্গে নিকট সম্পর্কিত কেউ কেউ তলে তলে কেরলবর্মার দলের লোককে সাহায্য করছে। এ কথা প্রমাণ করার নথিপত্রও আমার হাতে আছে। এবং এই বিষয় নিয়েই আলাপ আলোচনা করবার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।'

'আপনার কথার অর্থ টা ঠিক বুঝতে পারছি না। রাজার সাহায্যকারীরা আমার নিকট সম্পর্কিত লোক!' আপনার এই ধরনের জঘণ্য কূটনৈতিক চাল আমার বুঝতে বাকি নেই। তবে একটা কথা, আপনার হাতে যে প্রমাণ আছে, তদনুসারে কে দোষী জানতে পারি কি ?'

'মেজাজটা একটু সংযত রাখার চেষ্টা করুন। প্রমাণগুলো দেখালেই বুঝতে পারবেন কারা দোষী। কেরলবর্মার কাছে এখানকার সমস্ত গোপন খবর পাঠায় লুঈ পেরেরা এবং আপনার ঐ সঙ্গিনীটি—কি যেন সেই ডাইনীটির নাম ?'

বেবর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার মতো কূটনীতিজ্ঞের পক্ষে মিথ্যা প্রমাণ সাজানো আদৌ অসম্ভব কিছু নয়। নানারকম মিথ্যা তথ্য সাজিয়েই আপনি গভর্নর জেনারেলের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে কেরলবর্মা আজ পরাজিত। এতখানি মিথ্যার আশ্রয় যারা গ্রহণ করতে পারে, তাদের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। আজ আপনি চান আমাকে গভর্নর জেনারেলের সামনে রাজদ্রোহী হিসাবে খাড়া করতে। তবে আপনিও জেনে রাখুন, আপনার এই সমস্ত কূটনৈতিক চালের মুখোশ খুলে দিয়ে আমিও ইতিমধ্যেই বোম্বাই সরকারের কাছে চিঠি লিখে পাঠিয়েছি। সুতরাং এখন আমাকে নাজেহাল করার যে কোনো চেষ্টা ব্যর্থ হবে।'

কর্নেল স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারেন নি যে বেবর তাঁর প্রতি এই ধরনের ব্যবহার করতে সাহসী হবেন। তাই এখন তিনি যে কি

উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তারপর বললেন, 'বন্ধু, আমি তো আপনাকে নাজেহাল করতে বা আপনার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাই না। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আপনার সঙ্গে রাজার দলের কোনো গোপন যোগাযোগ নেই। তাই আপনাকে একটি কাজের ভার নিতে হবে। এটাকে আপনি আমার অনুরোধও মনে করতে পারেন। আমি চাই আপনি এই মুহূর্তে লুঈ পেরেরা এবং ঐ ডাইনীটিকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করুন।'

'আমার দোভাষীকে জোরজুলুম করে নিয়ে এসে তাকে নাজেহাল করা হয়েছে। আমার জিজ্ঞাস্য, সিভিল অফিসারদের উপর এই ধরনের জুলুম করার অধিকার আপনি পেলেন কোথা থেকে?'

'কথাগুলো শোনাচ্ছে বেশ, তবে একটি কথা আপনিও জেনে রাখুন যে সে নিজের হাতে সমস্ত গোপন ব্যাপার বিস্তারিতভাবে লিখে দিয়েছে এবং তার নীচে স্বাক্ষরও করেছে। সেটা পড়বার পর মনে মনে আপনিই বিচার করে দেখবেন, আমার ন্যায় হয়েছে না অন্যায় হয়েছে। আমি নিজে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে চাই না, কারণ তাতে হয়তো আপনার আপত্তি থাকবে। তাই আমার প্রস্তাব হলো, আমাদের দুজনের মধ্যে যখন এই মতভেদ দেখা দিয়েছে তখন প্রমাণগুলো যাচাই করবার জন্য আমরা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে সেগুলো উপস্থিত করি।' কর্নেল মনে করলেন, এইবার বেবরকে প্যাঁচে ফেলা সম্ভব হবে।

বেবর কিন্তু তাঁর এই অভিসন্ধি বুঝতে পেরে ইটের বদলে পাটকেল ছুড়লেন, বললেন, 'যারা সৈন্যবাহিনীর লোক নয়, তাদের বিচারের অধিকার সম্পূর্ণভাবে আমার। অন্য কারো এ ব্যাপারের মধ্যে নাক গলানোর অধিকার নেই, এ বিষয়ে কেউ অনধিকার চর্চা করতে এলে শাস্তি পেতে হবে তাকে।'

'বেশ, তাহলে আমরা তৃতীয় পক্ষের হাতে ছেড়ে দিই এসবের

বিচারের ভার। অন্তত আমার হাতে যেসব প্রমাণ আছে, তা দেখে তারাই বলুক অবিলম্বে এদের গ্রেপ্তার করা উচিত কিনা।'

'প্রস্তাবটি ভালো, কিন্তু এখানে তৃতীয় পক্ষ কে আছে?'

'এই ধরুন একজন আছেন এ্যাসিস্টাণ্ট সুপারভাইসার। আর একজনকে পরশুদিন এখানে যে অফিসাররা আসছেন তাঁদের মধ্যে থেকে ঠিক করে নেওয়া যাবে। কি, রাজী আছেন?'

'নিশ্চয়ই; এবং সাথে সাথে এও বলে রাখছি যে তাঁদের দুজনার মতে যদি প্রমাণগুলো সত্য হয় তাহলে আমিও নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।'

ওয়েলেসলির সাথে এইসব কথাবার্তার পর বেবর নিজের বাংলোয় ফিরে এলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, চিরুতাক্কুট্টি কোনোক্রমেই ঐ জাতীয় ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে না। চিরুতা তাঁকে ভালোবাসে। গত চার বছরের অভিজ্ঞতায় বেবর বুঝেছেন যে চিরুতার ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই; তাই তিনিও ভালোবেসেছেন তাকে নিবিড়-ভাবে। বাংলোয় ফিরে বেবর কিন্তু ওয়েলেসলির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার সম্বন্ধে কিছুই জানালেন না চিরুতাকে—জানালে কর্নেলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে বলে তিনি মনে করলেন।

ওয়েলেসলি যে চিরুতাকে একটা কঠোর শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর, সে বিষয়ে গত এক সপ্তাহ যাবৎ তলশেরীর বিভিন্ন মহলে জল্পনা-কল্পনা চলছিল। এক সময় চিরুতার কানেও সংবাদটি পৌঁছল। চিরুতা জানতো, ওয়েলেসলি এবং বেবরের মধ্যে মোটেই সদভাব নেই। এবং দিনের পর দিন সেই বিরোধ ক্রমশ বাড়ছে। তাই সে ভেবেছিল, ওয়েলেসলির বিরুদ্ধে কিছু করার অর্থ নিজের প্রিয়তমের স্বপক্ষে কিছু করা। তাছাড়া রাজা তথা দেশের প্রতি তার টানও কম ছিল না। কর্নেল রাজাকে দমন করতে এসেছেন শুনে এমনিতেই চিরুতার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ছিল, তার উপর বেবরের প্রতি কর্নেলের দুর্ব্যবহারের কথা শুনে সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল।

দু-তিনদিন আগে আম্পু নায়ার ছদ্মবেশে তলশেরীতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে চিরুতাব মন কেমন যেন অস্বস্তির মধ্যে আছে। আম্পু নায়ার জানিয়ে গেছেন যে কর্নেল চিরুতাকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার তোড়জোড় করছেন। এই অবস্থায় তার আর তলশেরীতে থাকা অনুচিত।

কিন্তু প্রিয়তম বেবরকে ছেড়ে কোথাও পালাতে চিরুতা রাজী হয় নি। যে কোনো শাস্তি মাথা পেতে নিতে তার দুঃখ নেই, কিন্তু তবুও সে বেবরকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। প্রত্যুত্তরে আম্পু নায়ার বলেছিলেন যে, তলশেরীতে তার উপস্থিতি এমন কি তার প্রিয়তম সুপারভাইসারের পক্ষেও ক্ষতিকারক। কথাটাকে চিরুতা গুরুত্ব দেয় নি।

আম্পুর কাছ থেকে সে আরো জানতে পারে যে আলীমূসা মারাক্কার নাকি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জাহাজ বোঝাই করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তলশেরী থেকে চলে গেছেন।

আম্পু নায়ার যাওয়ার পর থেকে সমস্ত বিষয়টি চিন্তা করে চিরুতা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মনে তার প্রশ্ন জাগল: সত্যিই কি তার উপস্থিতি সুপারভাইসারের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে? আম্পুর কথাই কি ফলবে তাহলে? এটা ঠিক যে ওয়েলেসলির পিছনে জোর আছে। স্বয়ং গভর্নর জেনারেল তাঁর ভাই। বিলেতেও তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। এসব কথা আগেই সে সুপারভাইসারের কাছে শুনেছে। এখন নিজের মনের কাছে সে নিজেই প্রশ্ন করে, কর্নেল কি তাঁর জন্যে তার প্রিয়তমের উপর কোনো শাস্তি প্রয়োগ করবেন? চিরুতার আশঙ্কা বেড়ে যায়, স্নান খাওয়া ঘুম যেন বন্ধ হয়ে আসে। নানারকমের আশঙ্কা সর্বক্ষণ তার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে। তার জন্যই যদি তার প্রিয়তমের শাস্তি হয়, তাহলে তার জন্য সে বেঁচে থাকবে?

বেবর অনুভব করলেন, কোনো কারণে চিরুতার মন উদ্‌ভ্রান্ত

হয়েছে। হঠাৎ এক সময় চিরুতা বলে ফেলল, 'জানি, আমার জন্যই তোমাকে কষ্টভোগ করতে হচ্ছে। আমি আর এখানে থাকবো না।'

সান্ত্বনা দিয়ে বেবর বললেন, 'ওদের অভিযোগ টিকবে না। আমি তো তোমাকে জানি, তুমি নির্দোষ। ওয়েলেসলি চান আমাকে একটু শাসিয়ে দিয়ে যেতে। বিনা বাধায় এখন তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চান। যাওয়ার আগে যাতে কোনো দিকে কোনোরকম গোলমাল না হয় সেটাই তাঁর কাম্য। কিন্তু তিনি চলে গেলে এ অবস্থাও বদলে যাবে।'

'আচ্ছা, সে কি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পাবে? তুমি তো সুপারভাইসার।'

'পাগলী কোথাকার।' বেবরের কণ্ঠস্বরে যেন যুগপৎ ব্যর্থতা ও নিবিড় ভালোবাসার সুর ফুটে উঠল। 'তিনি যদি চান তবে আমার সর্বনাশ নিশ্চয়ই করতে পারেন। তবে আমারও পিছনে লোক আছে। বিপদে পড়লে বোম্বাই সরকার নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে। তারা আমাকে অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আসল কথা কি জানো, সব কিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে একমাত্র গভর্নর জেনারেলের। একটি মাত্র কলমের খোঁচায় তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।'

'গভর্নর জেনারেলের এত ক্ষমতা!' শিশুর মতো প্রশ্ন করল চিরুতা, 'তোমাকে, মানে একজন সুপারভাইসারকেও শাস্তি দিতে পারেন? এত ক্ষমতা তাঁর?' এতটা আশ্চর্যান্বিত হয়ে চিরুতা কথাটা জিজ্ঞাসা করল যে মনে হলো, সে এতদিন ভেবেছিল সুপার-ভাইসারই বুঝি বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি। তার চেয়ে ক্ষমতাবান পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

চিরুতার এই সরল প্রশ্ন বেবরের মনে সহানুভূতিসূচক হাসির উদ্রেক করল। তিনি বললেন, 'গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা সকলের চেয়ে বেশী। তাঁর স্থান বড় বড় রাজা মহারাজাদেরও উপরে।'

কথাটা শুনেই চিরুতা কেমন যেন দমে গেল। মুখ তার সাদা হয়ে গেল মড়ার মতো। একফোঁটা রক্তও যেন সেখানে আর অবশিষ্ট নেই। চোখের সামনে যেন তার নেমে এলো গাঢ অন্ধকার। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু কপোল বেয়ে টপ্ টপ্ করে পড়তে লাগল বুকের উপর। আকুল কণ্ঠে হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ওগো, আমি তো এতসব জানতাম না! তাহলে তো কর্নেল···'

আর কোনো কথা সে বলতে পারল না, মূর্ছিত হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

বাইশ

কোট্টায়াম শহরের ইংরেজ সৈন্যদলের সেনাপতি ক্যাপ্টেন স্মিথ বেশ বুঝতে পারেন যে, সারা শহরে কিসের যেন একটা উদ্যোগ আয়োজন চলেছে, ঘরে ঘরে যেন অনুভূত হচ্ছে কিসের এক প্রাণ চঞ্চলতা। চারিদিকে উৎসবের পরিবেশ। প্রতি গৃহে অন্দর থেকে আঙিনা পর্যন্ত সমস্ত কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলার চলেছে কর্মব্যস্ততা। আশে পাশের অঞ্চল থেকে বিভিন্ন পরিবারের আত্মীয়-স্বজনরা এসেছে কোট্টায়ামে। শহরের যত্রতত্র তোরণ, আলপনা প্রভৃতি চোখে পড়ে। এসব লক্ষ্য করে ক্যাপ্টেন স্মিথ একদিন কয়েকজন মাতব্বর নায়ারকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাদের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, আজকার এই দিনটি হচ্ছে বছরের প্রথম পার্বণের শেষ দিন। পূর্বে রাজা মহারাজাদের শাসনকালে এই দিনটি নাকি খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হতো। আজও লোকের ইচ্ছা এই দিনটিকে আগের মতোই উৎসবমুখর করে তোলার। ক্যাপ্টেন স্মিথ শুধু তাদের কাছ থেকেই এই খবর নিয়ে ক্ষান্ত হলেন না। কুরুম অঞ্চলের রাজা ইংরেজদলভুক্ত। স্মিথ তার কাছ থেকেও ঐ একই সংবাদ পেলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর করণীয় কিছু নেই মনে করে নিশ্চিন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

ওয়েলেসলির আমন্ত্রণ অনুসারে সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর তলশেরী যাওয়ার কথা। সেখানে সেই আলোচনা বৈঠকে অন্যান্য সেনা-পতিদের সঙ্গে তাঁকেও অংশ গ্রহণ করতে হবে। স্মিথের একান্ত

অনুগামী পার্শ্বচরদের মধ্যে সৌন্দররাজ নায়ডু নামে জনৈক এদেশী কর্মচারীও ছিল। কোট্টায়াম শহর দেখাশোনার ভার সাময়িকভাবে তার উপর দিয়ে স্মিথ তলশেরীর দিকে রওনা হতে মনস্থ করলেন।

তাঁর রওনা হবার কয়েক মুহূর্ত পূর্বে একজন সৈনিক এসে খবর দিল, 'তলশেরী থেকে আমাদের সৈন্যদল এদিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখন তারা চার মাইল দূরে আছে।'

'আমাদের সৈন্যদল? এইদিকে আসছে? কুত্তুপরম্পের দিকে যাচ্ছে না তো? এখানে সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজনীয়তাটা কি? কই, এ সম্পর্কে আমার কাছে তো কোনো চিঠি আসে নি।'

'তারা কোম্পানীরই সৈন্য, তবে বাইরের কাউকে তাদের আস্তানার কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। কড়া পাহারায় রয়েছে শিবিরটা। কোথায় যে তারা যাবে তাও ঠিক জানা যাচ্ছে না। তবে আমাদের গুপ্তচরদের মারফত জানতে পেরেছি যে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকেই নাকি তারা চলেছে।'

ক্যাপ্টেন স্মিথ সৌন্দররাজ নায়ডুকে ডেকে বললেন, 'আমি এখন চললাম। কোম্পানীর একদল সৈন্য যেন কোথায় যাচ্ছে। প্রয়োজন হলে তাদের সাহায্য করতে হবে। যদি তারা কোট্টায়ামে আসে, তাদের সঙ্গে যেন আমাদের লড়াই না বাধে। তাই বলে তাদের সেনাপতির সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করতেও বলছি না।'

তারপর নির্দিষ্ট সময়ে ক্যাপ্টেন স্মিথ তলশেরীর দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

সুবাদার সৌন্দররাজ নায়ডু চতুর এবং যুদ্ধনিপুণ। সে ঐ সেনাদলের ভিতর থেকে আসল খবর সংগ্রহ করে আনার জন্য দুজন দূতকে পাঠাল। সৈন্যরা কোথায় যাবে, কোট্টায়ামের ইংরেজ সৈন্যের কাছ থেকে তারা কোনো সাহায্য চায় কিনা, এই সব খবরও তারা জেনে আসবে।

কোট্টায়ামের ইংরেজ-দুর্গ থেকে কেরলবর্মার রাজপ্রাসাদ মাইল

চারেক দূরে। নবাগত সৈন্যদল সেখানেই আস্তানা গেড়েছে। অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত প্রহরীরা প্রাসাদের চারিদিকে সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত। বাইরের কারো পক্ষে তার ভিতরে প্রবেশ করা এক দুঃসাহসিক কাজ। নবাগত সৈন্যদলের আগমন-সংবাদ পেয়ে সেখানকার সন্ত্রস্ত এবং শশব্যস্ত অধিবাসীরা ঘরদোর ছেড়ে পলায়ন করেছে।

এমনি অবস্থায় ভরা সন্ধ্যায় সুবেদার প্রেরিত সেই দুজন দূত এসে সেখানে হাজির হয়। পাহারারত সৈনিক তাদের পথরোধ করে। তারা কোত্থেকে আসছে, কি তাদের উদ্দেশ্য প্রভৃতি জানানোর পর তারা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পায়। ভিতরে প্রবেশ করে দেখে, কানাড়ী সৈনিকদের বেশভূষা পরা দুই শতাধিক বন্দুকধারী সৈন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এবং আরো কিছুটা ভিতরে প্রবেশ করে তারা দেখে, চোক্করায়ও সেখানে বসে আছেন।

'শুনলাম আমার বন্ধু সৌন্দররাজ নায়ডুর কাছ থেকে তোমরা এসেছ। বর্তমানে তিনি ভালো আছেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সুবাদারসাহেব ভালোই আছেন। আপনারা কোনো সাহায্য চান কিনা তিনি জানতে চেয়েছেন।'

'এক্ষুণি আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তবে আমি নিজে গিয়ে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।'

'তাহলে এই সৈন্যদল কি কোট্টায়ামে যাবে না?' একজন দূত জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে গোপন রাখার নির্দেশ আছে। এ বিষয়ে আমি সরাসরি সৌন্দররাজের সঙ্গেই কথা বলবো। ভালো কথা, স্মিথ সাহেব কি কোট্টায়াম থেকে তলশেরীর দিকে রওনা হয়ে গেছেন?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'আচ্ছা তোমরা একটু বসো, আমি এক্ষুণি আসছি।' চোক্করায় ভিতরে গিয়ে রাজাকে বললেন, 'স্মিথ তলশেরীর দিকে রওনা হয়ে গেছেন। আমাদের উপর কোট্টায়ামের ইংরেজ সেনাদলের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই! সুতরাং এখন আমাদের আর এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত নয়। যত শীঘ্র সম্ভব কোট্টায়ামের দিকে অভিযান শুরু করা উচিত।'

রাজার কাছে কথাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ তাতে সম্মতি দিলেন।

দূতদের কাছে ফিরে এসে চোক্করায় সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি সত্যিই খুশী হয়েছি। শ্রীরঙ্গপত্তনের রণাঙ্গনে আমি এবং সৌন্দররাজ নায়ডু দুজনে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছি। তোমরা তাঁরই কাছ থেকে এসেছ। সুতরাং তোমাদের যথোচিত আদর আপ্যায়ন না করে ফিরে যেতে দিতে পারি না। তাই তোমাদের রাত্রের আহার এখানেই করতে হবে। কাল সকালে আমরা একসঙ্গে সৌন্দররাজের কাছে যাবো।'

'আপনার এই সাদর অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আপনার আমন্ত্রণ আমরা রাখতে পারছি না। কেননা, আমাদের উপর কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খবরটা নিয়েই সাথে সাথে ফিরে যেতে।'

'আরে, তোমরা অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সৌন্দররাজ জানতেন না যে এই সৈন্যদলের সেনাপতি আমি। জানলে তিনি কখনই এই ধরনের হুকুম দিতেন না। সে যাই হোক, রাত্রের খাওয়া-দাওয়া না সেরে কিন্তু তোমরা কোনোক্রমে যেতে পারবে না। তাছাড়া রাতও তো অনেক হয়েছে।'

অগত্যা তারা রাত্রের আহার সেরেই ফিরে যেতে সম্মত হলো। চোক্করায় তারপর তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। ইতিমধ্যে রাজার সৈন্যদল কোট্টায়ামের দিকে অভিযান

শুরু করল। সুবাদারের দূত দুজনকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল, তার দোরগোড়ায় মাত্র দুজন সৈনিককে পাহারায় রাখা হলো। এসবই ঐ দুজন সংবাদবাহকের অজানতে অনুষ্ঠিত হলো।

দূতদের পাঠাবার পর সৌন্দররাজ নায়ডু নিজে দুর্গের চারিদিকে ঘুরে ভালো করে দেখে নিলো সব ঠিক আছে কিনা। তারপর নিশ্চিন্ত মনে প্রবেশ করল নিজের ঘরে। রাত্রে খাওয়ার সময় মন্দিরে বাজনা শুনে তার খুব ইচ্ছা হলো সেখানে যাওয়ার। দেবীর পরম ভক্ত সে। কিন্তু ক্যাপ্টেন স্মিথের অনুপস্থিতিতে তার উপর যে গুরুভার দায়িত্ব রয়েছে, সে দায়িত্ব ত্যাগ করে দুর্গের বাইরে যাওয়া অনুচিত ভেবে সে গেল না। এদিকে মনও তার খুব অচঞ্চল নয়। যে দুজন দূতকে খবর আনবার জন্য পাঠানো হয়েছে, তারা এখনো ফেরে নি। অথচ তাদের এই বিলম্বের কারণও অজানা। এবং আজানা বলেই তা আশঙ্কাজনক। নায়ডু এই সব সাত পাঁচ ভাবছে, ঠিক সেই সময় একজন সৈনিক এসে খবর দিল, পয়য়ম বাড়ির চন্তু নায়ার তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

সুবাদার জানে, চন্তু নায়ার কোম্পানীর একজন বিশ্বাসী এবং আপন লোক। তিনি বহুবার কর্নেল ওয়েলেসলির সঙ্গেও যে সরাসরি গিয়ে দেখা করেছেন সে খবরও নায়ডুর কাছে আজানা নয়। তাছাড়া ক্যাপ্টেন স্মিথের সঙ্গেও তিনি প্রায়ই দেখা করতে আসেন। সুতরাং নায়ডু তৎক্ষণাৎ চন্তু নায়ারকে ভিতরে নিয়ে আসতে অনুমতি দিল।

চন্তু নায়ার ভিতরে প্রবেশ করে পারস্পরিক অভিবাদন বিনিময়ের পর বললেন, 'খবর পেলাম, রাজা সাহেব নিকটবর্তী কোথাও আছেন। তিন দিন আগে তিনি চন্ত্রোতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে তিনি আর পুরলী পাহাড়ে ফিরে যান নি। জন পঞ্চাশেক সৈন্য যদি আমার সঙ্গে দেন, তাহলে রাজার ফিরবার পথ চিরদিনের মতো বন্ধ করে দিতে পারি।'

একথা শুনে সুবাদার নায়ডু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার ঐ ছোট্ট সৈন্যদল থেকে পঞ্চাশজনকে অন্যত্র পাঠাতে তার সাহস হলো না। নায়ডু বলল, 'ক্যাপ্টেন সাহেবের অনুপস্থিতিতে সৈন্যদের আর কোথাও পাঠানোর কারো ক্ষমতা নেই। আর তাছাড়া হঠাৎ যদি রাজা এদিকে আক্রমণ করে বসেন?'

'যতদূর জানি, রাজার সঙ্গে আর কেউ নেই, সুতরাং এ জায়গার উপর তাঁর আক্রমণ চালানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া তার বর্তমান অবস্থায় সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়। সুতরাং সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে। আমার মনে হয়, আমাদের পক্ষ থেকে আক্রমণ চালানোর এমন সুবর্ণসুযোগ ভবিষ্যতে আর কোনোদিন আসবে কিনা সন্দেহ। এই মুহূর্তে ছোট একটি সৈন্যদল পেলেই রাজার অবস্থা সঙিন করে তুলতে পারতাম।'

'এক কাজ করা যেতে পারে। কোম্পানীর একটি সৈন্যদল এখান থেকে মাত্র চার মাইল দূরে আস্তানা গেড়েছে। তারা কোথায় যাবে, তা আমাদের জানা নেই। তবে তারা যদি এখানে আসে, তাহলে তখন আপনার যত সৈন্য প্রয়োজন দিতে পারবো।'

'কী! কোম্পানীর বাহিনী এখান থেকে চার মাইল দূরে আছে? কই তলশেরী থেকে তো এরকম কোনো নির্দেশ প্রচারিত হয় নি। আমি গতকালও কর্নেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি—এসম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে তো কিছুই শুনতে পেলাম না।'

এমন সময় হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো বন্দুকের গর্জন।

চন্তু নায়ার তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন, এটা রাজার এক বিরাট কৌশল। তিনি চীৎকার করে বললেন, 'সুবাদার, আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি। যে কোনোভাবে হোক আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিন।'

সুবাদার সৌন্দররাজ নায়ডু চন্তু নায়ারের কথায় কান দিল না। বন্দুকের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে

চীৎকার করে সৈন্য সাজাতে এবং দুর্গ সুরক্ষিত রাখতে নির্দেশ দিল। ওদিকে বন্দুকের আওয়াজও ক্রমেই নিকটতর হতে লাগল।

ইতিমধ্যে দুর্গের দ্বারে পাহারারত সৈনিকটি গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সুবাদার বাইরে বেরিয়ে কোনো ব্যবস্থা করার আগেই রাজা সৈন্যদল সমেত দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন, কোম্পানীর সৈন্যদলের কোনোরকম প্রস্তুতির আগেই তাদের উপর আক্রমণ শুরু হলো।

এমনিতেই ক্যাপ্টেন স্মিথের অনুপস্থিতির ফলে কিছু সৈন্য মন্দিরে গিয়েছিল উৎসবানুষ্ঠান দেখতে। যারা শিবিরে ছিল তারা বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে শুধু এই কথাটাই ভাবতে লাগল যে, কোম্পানীর সৈন্য তাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে কেন? রাজার সৈন্যদের পোশাক ছিল ইংরেজ পক্ষের কানাড়ী সৈনিকদের মতো, এবং তাদের যুদ্ধের কৌশলও ছিল ইংরেজদের মতোই। মাঝে মাঝে বন্দুকের গর্জনকে হার মানিয়ে শোনা যেতে লাগল সুবাদার নায়ডুর বলিষ্ঠ কণ্ঠের নির্দেশ। বারবার সে আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য এবং প্রতিআক্রমণ চালানোর জন্য সৈন্যদের পরিচালনা করতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। অনেক পরিশ্রম করেও কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হলো না। ইংরেজ সৈন্যরা তাদের ক্ষমতার পূর্ণ সদব্যবহার করে লড়তে পারল না।

হঠাৎ একসময় সৌন্দররাজ নায়ডু গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজার সৈন্যদল সম্পূর্ণ দুর্গটাকে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলল। দুর্গ এলো রাজার হাতে। কোম্পানীর বহু সৈন্য বিচ্ছিন্ন খণ্ড যুদ্ধে প্রাণ হারাল। অবশিষ্ট সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ করে স্বীকার করল পরাজয়।

ওদিকে চন্তু নায়ার বন্দুকের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই ফাঁদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন। রাজার যুদ্ধ নৈপুণ্যের কথা তাঁর অজানা নয়, সে সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। তিনি মারাত্মক

এক বিপদের মধ্যে পড়েছেন বুঝতে পারলেন। তিনি জানতেন যে, রাজার অভিযানের পিছনে থাকে ভিলরা। অন্য সৈন্যদের হাত থেকে নিস্তার পেলেও ভিলদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। আবার, এখন সুবাদার নায়ডুর সঙ্গে একযোগে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও ঐ একই পরিণতি হবে। তাছাড়া দুর্গের কোনো এক গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকাও নিরাপদ নয়। কারণ কিছুক্ষণ পরেই রাজা তন্নতন্ন করে দুর্গের আনাচে-কানাচে কিছু আছে কিনা খুঁজে দেখবেন। সেই সময়ে ধরা পড়লেও মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য।

সুড়ঙ্গ পথ একটা আছে বটে, কিন্তু এই অন্ধকারে সেটা খুঁজে বের করাও কঠিন। চন্তু নায়ার এসেছিলেন রাজাকে ফাঁদে ফেলতে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটল তার বিপরীত।—নিজেকেই জালে জড়িয়ে পড়তে হলো। আর এক মুহূর্তও ভিতরে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে তিনি বাইরে বেরিয়ে পড়লেন, এবং সেই অন্ধকারে প্রাচীরের গা ঘেঁষে ঘেঁষে অগ্রসর হতে লাগলেন। দুর্গে তখনো যুদ্ধ চলছিল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বন্দুকের আওয়াজ কমে এলো। তিনি বুঝতে পারলেন, যুদ্ধের ফলাফল যা হওয়ার হয়ে গেছে।

চন্তু নায়ার তখন নীরবে সেখানে দাঁড়িয়ে কি করা উচিত ভাবতে লাগলেন অগত্যা তিনি ঠিক করলেন প্রাচীর টপকে বেরিয়ে পড়বেন। সাহসী যোদ্ধা তিনি। তাই পরিকল্পনানুযায়ী তৎক্ষণাৎ সুপারিগাছে উঠে পাঁচিলের উপর দাঁড়ালেন এবং সেখান থেকে দুর্গের বাইরে লাফিয়ে পড়লেন। ঠিক তার নীচেই ছিল একটি গভীর খাল। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না চন্তু নায়ার, সাহসে বুক বেঁধে ঐ খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে পার হয়ে গেলেন। রাজার সৈন্যরা দুর্গ ঘিরে রেখেছিল। তাদের মধ্যে একজন জলে কিছু পড়ার শব্দ শুনতে পেলো। অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো সৈনিকটি তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। কিন্তু চন্তু নায়ারের গায়ে তা লাগল না। গুলিবিদ্ধ না হলেও তিনি বুঝতে

পারলেন যে শত্রুরা তাঁর পিছু নেবে। তাই তিনি খাল পেরিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন।

দেবীর মন্দিরে তখন বাদ্যানুষ্ঠান চলছিল। অসংখ্য মানুষের ভিড় সেখানে। চন্তু নায়ার ছুটে গিয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। মন্দিরের বাজনাকে ছাপিয়ে দুর্গের গোলাগুলির আওয়াজ কিংবা সেখানকার কোনো গোলমাল চীৎকার তখনো মন্দিরে সমবেতদের কানে পৌছায় নি। তরুণীরা সব তখন অর্ঘ্যথালায় নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবী প্রদক্ষিণ করছিল। তাছাড়া একদিকে চলছিল নৃত্যানুষ্ঠান, অপরদিকে কথকতা প্রভৃতি। আর কিছু ভক্ত একাগ্রমনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল দেবীর সামনে।

চন্তু নায়ার নিজেকে ভীড়ের মধ্যে মিশিয়ে দিতে চেষ্টা করলেও উজ্জ্বল আলোকে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারলেন না।

হঠাৎ একটি যুবকের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ধর, পেয়েছি! ভগবতী শ্রীপোর্কলীর সামনে আজকে একেই বলি দেবো।' বলেই ভীড় ঠেলে একজন যুবক এগিয়ে এসে চন্তু নায়ারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুবকটি আর কেউ নয়, স্বয়ং আম্পু নায়ার।

দুর্গ আক্রমণের জন্য রাজা সাহেব যখন অভিযান শুরু করেন, তখন তাঁরই নির্দেশে গ্রামবাসী মোড়লদের মন্দিরে জড়ো করে রাখবার জন্য এবং প্রয়োজন মতো ডাক দিলে তাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আম্পু নায়ার ছিলেন সেখানে। তিনি এমন স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেখান থেকে প্রত্যেকটি লোকের মন্দিরে আগমন চোখে পড়ে। অবশ্য তিনি নিজে ছিলেন ছদ্মবেশে।

ছুটতে ছুটতে এসে ভিড়ের মধ্যে চন্তু নায়ারকে মিশে যেতে দেখে আম্পু নায়ার চঞ্চল হয়ে ওঠেন। দুঃশাসনকে দেখে ভীমসেনের যে অবস্থা হয়েছিল, তাঁরও হলো সেই অবস্থা। কাম্মুও তার সঙ্গে ছিল। তিনি তরবারি তুলে বিদ্যুৎ গতিতে চন্তুর দিকে ধাবিত হলেন। কাম্মু তাঁকে অনুসরণ করল।

আম্পু মুখোমুখি হলে চন্তু নায়ার পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং ভয়াবহতা অনুধাবন করে বললেন, 'আজ আমার মৃত্যু হয় তাও ভালো, তবু তোমাকে আজ আর জীবন্ত ছাড়বো না। তোমাকে শেষ করে তবে আমি মরবো।' কথাটা বলেই তৎক্ষণাৎ তলোয়ার বের করে চন্তু নায়ার আম্পুকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। আম্পুও চট্ করে প্রস্তুত হয়ে সে আঘাত প্রতিরোধ করলেন। কাম্মু অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আম্পু ও চন্তুর মধ্যে অসিযুদ্ধ অল্পক্ষণের মধ্যেই ভয়াবহ রূপ ধারণ করল।

চোখের পলকে কাছাকাছি লোক সব দূরে সরে গেল; বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তারা লক্ষ্য করতে লাগল সেই অসিযুদ্ধ। সমানে সমানে যুদ্ধ চলেছে, একজনের মৃত্যু না হলে যেন তা আর থামবে না। নানাভাবে কৌশল প্রয়োগ করে চন্তু একের পর এক আক্রমণ চালাতে লাগলেন। আম্পু নায়ারও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতি আক্রমণ করলেন। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে কোনো পক্ষেই শিক্ষার অপূর্ণতা দেখা গেল না। মাঝে মাঝে আম্পুকে থমকে দাঁড়াতে হচ্ছিল। আবার কখনো বা সুযোগ সৃষ্টি করে একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। চন্তু নায়ার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে লড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেই সেই মুহূর্তে আম্পু হঠাৎ তাঁকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। কিন্তু একটি আঁচড়ও তিনি কাটতে পারলেন না চন্তুর গায়ে। উপস্থিত জনতার নিষ্পলক চোখ দেখতে লাগল তাঁদের সেই লড়াই।

অবশেষে দুজনেই তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তবু চন্তুর আঘাতে তখনো ধার এবং ভার দুই-ই ছিল। আম্পুকে কিছুটা ক্লান্ত দেখে হঠাৎ তাঁকে প্রচণ্ড এক আঘাত করতে উদ্যত হলেন চন্তু। কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস নিষ্ফল হলো। হঠাৎ তাঁর পা কলার খোসার উপরে পড়ে হড়কে গেল। ফলে সে আঘাত আম্পুর গায়ে না লেগে লাগল তার তলোয়ারের উপর। সাথে সাথে তাঁর

তলোয়ার ছিটকে পড়ল দূরে। চন্তু তৎক্ষনাৎ একলাফে আম্পু নায়ারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধের গতি যেন এখন আম্পুর জয়ের প্রতিকূলে। চন্তু নায়ার মরিয়া হয়ে লড়তে লাগলেন। এখন আম্পুর জীবন চন্তু নায়ারের হাতের মুঠোয়। আম্পু নায়ার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে হঠাৎ এক ঝটকায় চন্তুর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই চন্তুর প্যাঁচে পড়ে নিজেই অদূরে ছিটকে গিয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ কাম্মু উদ্যত তলোয়ার নিয়ে চন্তুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সে অপমানিত হয়েছে। সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের আজকের এই চরম সুযোগ হারানোর পাত্র সে নয়। কিন্তু চন্তু তা দেখে অবহেলার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। যা হোক কিছুক্ষণ চলল চন্তু এবং কাম্মুর মধ্যে অসিযুদ্ধ। দীর্ঘক্ষণ ধরে যুদ্ধ করায় অবশেষে চন্তু নায়ার ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর অসাড় দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তৎক্ষণাৎ কাম্মু তাঁর বুকের উপর বসে তাঁর গলা টিপে ধরল। কাম্মুর চোখে তখন জ্বলছে প্রতিশোধ স্পৃহার আগুন। আর তার তখনকার সেই রুদ্র রূপ দেখে মনে হয় যেন দুঃশাসনের বুকের উপর বসে আছেন স্বয়ং ভীমসেন!

তেইশ

শুভ মঘরব্রতের শেষদিন সকালবেলা। সূর্যদেব যেন নতুন তেজে কিরণ ছড়িয়েছেন। চারিদিক উজ্জ্বল আনন্দোচ্ছল। শহরের প্রতিটি বাড়ি সুসজ্জিত, পথ ঘাট সব পরিচ্ছন্ন। লোকের গায়ে পরিষ্কার রং-বেরংয়ের পোশাক। তাদের চলাফেরা কথাবার্তা আনন্দোজ্জ্বল। রাজপ্রাসাদের শিখরে আজ আর ইংরেজদের পতাকা নেই। সেখানে শোভা পাচ্ছে কোট্টায়াম রাজার নিশান। ইংরেজদের পরাজয় ও রাজার জয়ের বার্তা রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। তাই সে রাত্রে কোট্টায়ামের মানুষের চোখে ঘুম ছিল না বিজয়োল্লাসে। যুগপৎ জয়ের আনন্দে ও পালটা আক্রমণের আশঙ্কায় তারা রাত জেগে কাটিয়েছে। আজ সকালে বহু লোক জড়ো হয়েছে রাজ-প্রাসাদের কাছাকাছি। তাদের সবার মুখে একই বিষয়ে আলোচনা —রাজার বিজয় ও তাঁর গুণকীর্তন।

শুধু কোট্টায়ামেরই নয়, আশপাশের বহু গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লোক এসে সমবেত হয়েছে সেখানে। কুটালী নাম্প্যার, কীয়ুর সামন্ত প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিরাও সে সমাবেশে আছেন। ইতিমধ্যে চন্দ্রোত নাম্প্যারও প্রবেশ করলেন কোট্টায়ামে। সঙ্গে তাঁর পরিবারের আত্মীয়স্বজন ও অনুচররা সবাই। তাঁর সাথে সুসজ্জিত দুখানা পালকি দেখে জনসমুদ্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কৌতূহলের একটি ঢেউ খেলে গেল যেন।—কারা আছে ঐ পালকিতে? ধীরে ধীরে পালকি দুটো এলো রাজপ্রাসাদের

সন্নিকটে। অন্তপুরের কাছে এলে পালকির ভিতর থেকে যাঁরা নেমে এলেন, তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন স্বয়ং বড়রানী।

অতঃপর রাজোচিত জাঁকজমকের সঙ্গে গজদন্তের কারুকার্য করা সুদৃশ্য এক পালকিতে করে কেরলবর্মা যাত্রা করলেন মন্দিরের দিকে দেবীদর্শনের জন্য। পালকির সাথে সাথে চলতে লাগল সেই জন-সমুদ্র। রাজার বাহুতে বীরের কংকন, কণ্ঠে তাঁর জয়মাল্য। তাঁর আশপাশে বিখ্যাত সব ব্রাহ্মণ পরিবারের লোক, প্রভাবশালী সামন্ত ও অগণিত জনসাধারণ। সকলের চোখে মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস ও চঞ্চলতা, আর রাজার প্রতি তাদের শ্রদ্ধার স্বাক্ষর। সবাই বুঝতে পারল, রাজাই এবার তাঁর নিজের রাজ্য পরিচালনা করবেন। ইংরেজদের আমলে তাদের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিসহ—চোখের ঘুম তাদের কেড়ে নিয়েছিল বহু দুঃস্বপ্নময় সুদীর্ঘ রাত্রি। তারপর ইংরেজদের বিতাড়িত করলেন রাজা—তাদের অত্যাচারের মূলোৎপাটন করলেন তিনি, দেশে এবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজা আবার আগের মতোই কল্যাণকামী দৃষ্টিতে রাজ্য পরিচালনা করবেন।

দেবীদর্শন সমাপ্ত করে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতে দুপুর হয়ে গেল। তারপর জাঁকজমকের সঙ্গে সবাইকে খাওয়ানো হলো। যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষভাবে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, সেই এমন নায়ার, আম্পু নায়ার প্রভৃতি নেতারা পরিবেশনের ক্ষেত্রেও তাঁদের দক্ষতার পরিচয় দিলেন। কার পাতে কি কম পড়েছে, কে কি চাইছেন, কাকে আর একটু খাওয়ার জন্য অনুরোধ করা দরকার প্রভৃতি কোনো দিকেই তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারল না। গ্রামবাসীদের খাওয়া-দাওয়ার পর চন্ত্রোত নাম্প্যার সহ রাজার অতি অন্তরঙ্গ পার্শ্বচররা বসলেন।

আজ চারিধারে সর্বস্তরের সকল মানুষের মধ্যে শোনা যেতে লাগল রাজার গুণগান। এক সময় চন্ত্রোত নাম্প্যার প্রশ্ন করলেন, 'একটি বিষয়ে কিন্তু এখনো আমার খুবই আশ্চর্য লাগছে। ভাবছি,

কি করে রাজা সাহেব এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তিশালী সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যদের দ্বারা সুরক্ষিত এই কোট্টায়াম শহরটিকে তথা সমগ্র দেশকে নৃশংস ইংরেজদের কবল থেকে রক্ষা করতে পারলেন।'

শুধু চন্ত্রোতই নন, সেখানে উপস্থিত অনেকের মনেই এই একই প্রশ্ন জেগেছিল। সেনাপতিদের বিভিন্ন দিকে নিয়োজিত করে সর্বশেষে রাজা নিজেও যে বেরিয়ে পড়েছিলেন, এ রহস্য এডচ্চেন কুংকন বাদে আর কেউ জানতেন না। তিনি বললেন, 'এখন যুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জয় হয়েছে। সুতরাং কোনো কিছু আর গোপন করে রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই। মনত্তনার যুদ্ধের কথা আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। সেখানে ইংরেজ সৈন্যদের একটি বড় অংশ ছিল কানাড়ী। তাদের বেশীর ভাগ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা যায়। রাজার নির্দেশ অনুসারে তাদের প্রত্যেকের অস্ত্র ও পোশাক নিয়ে আমরা গোপনে রেখে দিয়েছিলাম। তাছাড়া কিছু সৈন্যও আমাদের হাতে ধরা পড়ে। তাদের অর্থাৎ ঐ কানাড়ীদের কাছ থেকে আমরা গোপনে ইংরেজদের যুদ্ধ করার পদ্ধতি মাস দুয়েকের মধ্যে আয়ত্ব করে নিই। মৃত কানাড়ী সৈন্যদের পোশাক ও অস্ত্র রেখে দেওয়ার ফলে পরে সেগুলো আমাদের খুবই কাজে লাগল—আমাদের সৈনিকরা সময় কালে সেগুলো ব্যবহার করায় কোম্পানীর সৈন্যরা প্রথমে আমাদের ধরতেই পারে নি। রাজা সাহেবের নির্দেশে এদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং চোক্করায়। তাঁর নেতৃত্বেই সৈন্যদল এদিকে অগ্রসর হয়। ইংরেজ সৈন্য ভেবেছিল, তাদেরই এক নতুন সৈন্যবাহিনী বুঝি দুর্গে থাকতে আসছে। যা হোক, তারপর শেষ মুহূর্তে রাজা নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এরপর যা যা ঘটেছে তা তো আপনারা সবাই জানেন।'

রুদ্ধ নিশ্বাসে এডচ্চেন কুংকনের কথাগুলো শুনবার পর আর একবার সবাই রাজার বুদ্ধি ও চাতুর্যের প্রশংসা না করে পারলেন না।

চন্ত্রোত নাম্প্যার বললেন, 'এতখানি নিপুণতার সঙ্গে সৈন্য পরিচালনা না করলে আমাদের পক্ষে চতুর কর্নেল ওয়েলেসলিকে পরাজিত করা অসম্ভব হতো।'

ঠিক সেই সময় চন্ত্রোত নাম্প্যার ও আম্পু নায়ারকে রাজা ডেকে পাঠালেন। কাল বিলম্ব না করে তাঁরা রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

রাজা সাহেব তখন চিন্তামগ্ন। গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'তলশেরী থেকে একটি দুঃসংবাদ এসেছে। এক্ষুণি তার একটা প্রতিবিধান করতে হবে।'

কথাটা শুনে উভয়েই রাজার নির্দেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

'এ বিষয়ে চন্ত্রোত নাম্প্যারের সাহায্যেরই বেশী প্রয়োজন।'

'বলুন, কি করতে হবে।'

'কর্নেল চিরুতাকুট্টিকে কঠোর শাস্তি দেবেন বলে ঠিক করে বসে আছেন।'

'এতখানি ধৃষ্টতা আর সহ্য করা যায় না। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েদের হত্যা করতেও তাঁর হাত একটু কাঁপে না।' এখন চিরুতাকে যে কোনো ভাবে হোক বাঁচানো আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।'

আম্পু বললেন, 'কিন্তু এদিকে চিরুতা তো জিদ ধরে বসে আছে যে, সুপারভাইসারকে ছেড়ে সে আর কোথাও যাবে না, গেলে সে নাকি আর এক মুহূর্তও বাঁচতে পারবে না। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম প্রথমেই তাকে অন্য কোথায় সরিয়ে দিতে। কিন্তু সে বেবরকে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী নয়।'

'চিরুতার এই জিদকে আমি অপরাধ মনে করি না। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা অপরাধ নয়। কিন্তু এই সংকটজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা বেবরের মুরদে কুলোবে না। এবং এটাও নিশ্চিত যে, কর্নেল চিরুতাকে ফাঁসি না দিয়ে ছাড়বেন না।'

'অধীন আপনার নির্দেশের প্রতীক্ষায় আছে, আজ্ঞা করুন।' চন্দ্রোত নাম্প্যার বললেন।

'একটিমাত্র উপায় আছে। মেজর হোম্‌স ও স্টুয়ার্ট এখন উন্নিমুপ্পনের হাতে বন্দী। তারা দুজনেই ইংরেজ-মহলে সম্মানিত। এমন কি, কর্নেল ওয়েলেসলিও স্টুয়ার্টকে শ্রদ্ধা করেন। তাছাড়া হোম্‌স তো কর্নেল ওয়েলেসলির বন্ধুই। এখন আমাদের করণীয় হচ্ছে কর্নেলকে এই কথাটা জানানো যে চিরুতাকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিলে আমরা এই দুজনকে মুক্তি দিতে পারি। এই শর্ত নিয়ে অগ্রসর হলে আমার ধারণা, চিরুতাকে মুক্ত করতে পারবো।'

চন্দ্রোত ইংরেজদের স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত। তাঁর কাছে রাজার এই প্রস্তাবটি ভালে লাগল। একজন গ্রাম্য মহিলাকে হত্যা করা ইংরেজদের কাছে এমন কিছু সমস্যার ব্যাপার নয়। কিন্তু মেজর হোম্‌স ও স্টুয়ার্টকে মুক্তি দেওয়ার শর্তে তারা চিরুতার মতো এমন বহু বন্দীকে অনায়াসে মুক্তি দিতে পারে।

'আমার মনে হয়, আপনার একটি চিঠি নিয়ে যাওয়াই ভালো হবে। সেই চিঠির বক্তব্যের ভিত্তিতেই ওয়েলেসলি চিন্তা করে দেখতে পারবেন।' নাম্প্যারের এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে রাজা তৎক্ষণাৎ তালপাতায় নিম্নরূপ চিঠিটি লিখে দিলেন।

'ওঁ। বর্তমানে কোট্টায়ামের রাজপ্রাসাদে অবস্থানকারী পুরলীশ্বর প্রতাপ শ্রীকেরলবর্মা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদলের অধিনায়ক কর্নেল ওয়েলেসলিকে জানাইতেছেন যে, শ্রীপোর্কলী দেবীর কৃপায় এখানকার অবস্থা সবই ভালো, আশা করি কর্নেল যেখানে আছেন, সেখানকার অবস্থাও মন্দ নয়।

'শুনলাম, আমাদের প্রজা চিরুতাকুট্টি নামে এক অসহায় মহিলাকে কর্নেলের নির্দেশ অনুসারে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। এবং ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কর্নেল ঐ মহিলাটিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া স্থির করেছেন।

'নারীহত্যা আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিরোধী। আমাদের দেশে ঐ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে তার পাপ থেকে আমরাও রেহাই পাবো না। কিন্তু কর্নেল ওয়েলেসলি যদি এসব জেনে শুনেও এই ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করেন, তাহলে শত্রুসংহারক আমাদের তলোয়ারও তার প্রতিশোধ না নিয়ে খাপে মুখ গুঁজে থাকবে না।

'তাছাড়া, কর্নেল হয়তো এত শীঘ্রই ভুলে যান নি যে, কোম্পানীর সৈন্যদলের হোমস্, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান কর্মচারী আজও আমাদের হাতে বন্দী। যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শক্তি, সামর্থ্য এবং ইচ্ছা আমাদের আছে। বাকি কথাগুলো পত্রবাহক চন্দ্রোত নাম্প্যারই বলবেন।'

পত্রলেখা শেষ হলে নাম্প্যারকে তা পড়ে শুনিয়ে রাজা বললেন, 'কর্নেলকে দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের বক্তব্য জানাবে। তোমার সঙ্গে আম্পু নায়ারও যাবে। আর শোন, প্রয়োজনমত অনুচর নিয়ে রাজকীয় জাঁকজমকের সঙ্গে কিন্তু দেখা করতে যাবে কর্নেলের সাথে। এখন আর আমাদের লুকিয়ে কিছু করার প্রয়োজন নেই।'

রাজার নির্দেশ অনুযায়ী চন্দ্রোত নাম্প্যার ও আম্পু নায়ার তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন। রাজা সাহেব পুনরায় রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত সামন্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। সে সব আলোচনার মূল বক্তব্য হলো ইংরেজদের অত্যাচার ও নিপীড়ন এবং তার প্রতিবিধান সম্পর্কে উপায় উদ্ভাবন; এছাড়া আগামী দিনের রাজকার্য পরিচালনা সম্পর্কে সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সেদিনই সন্ধ্যায় রাজা অর্লাত নাম্প্যার, এমন নায়ার এবং কুংকনকে অন্দরমহলে ডেকে পাঠালেন।

তারা এলে রাজা সাহেব বললেন, 'নাম্পির খবর কি?'

'আমরা যে নিজেদের জীবনেই আমাদের জয় দেখে যেতে পারবো, তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি নি। কিন্তু আমার সেই

কল্পনাতীত বিষয় আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। আজকের দিনে এর চেয়ে বড় খবর আর কি হতে পারে!'

'কয়েকদিন আগেও কিন্তু নাম্পির কাছ থেকে অভিযোগ শুনতাম, আমি উদাসীন, নিষ্ক্রিয়।'

'মহৎ ব্যক্তিদের মনের কথা বুঝতে পারা সকলের সাধ্য নয়।'

'একটি বিষয় সম্পর্কে তোমাকে কয়েকটি কথা বলবো বলে ডেকে পাঠিয়েছি। আম্পুর উপর তোমার একটা সন্দেহ ছিল। তোমার আশঙ্কা ছিল, আম্পু বুঝি বা কোম্পানীর লোক হয়ে গেছে। এই ধরনের সন্দেহ অবশ্য আজও কৈনেরীর কারো কারো মনে দানা বেঁধে আছে।'

রাজার কথায় নাম্প্যার একটু বিচলিত বোধ করলেন। রাজা সাহেবের প্রতি গভীর অনুরক্তির ফলেই একদিন আম্পু নায়ারের উপর তাঁর এই সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল।

রাজা পুনরায় বললেন, 'এতে অবশ্য তোমার তেমন কোনো দোষ নেই। কারণ এই ধরনের একটা কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং লোকের কাছে সেটা প্রায় সন্দেহাতীত বাক্যে পরিণত হয়েছে। কথাটা আমিও অনেকের মুখে শুনেছি, তোমার কানেও যে যায় নি তা নয়। তাছাড়া ছোটরানী সম্পর্কেও বহু লোক নানা ধরনের কথা প্রচার করেছে। মাক্কমের নামে অপপ্রচার কম রটে নি।'

'শুনেছি, চন্তু নায়ার আজও ছোটরানীকে একঘরে করে রেখেছে। আজকের এই শুভদিনে ছোটরানীর এখানে অনুপস্থিতির কারণ অনেকের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহজনক।'

কথাটি শুনে রাজা অদূরে দণ্ডায়মান একজনকে ডেকে তার কানে কানে কি যেন বললেন। তারপর লোকটি সেখান থেকে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বড়রানীর সঙ্গে ধীরে ধীরে ছোটরানী মাক্কমদেবী রাজার কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

দেখে নাম্প্যার যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'এখন নিশ্চয়ই আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সব রটনার মূলে যে ছিল, সে আজ আর পৃথিবীতে নেই।'

'চন্তুর মৃত্যু হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে।' এমন নায়ার বললেন।

'ঘটনাটি আমি ভালো করে শুনতে পারি নি। কিভাবে তার মৃত্যু ঘটল বল তো?' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

'শুনলাম, আমরা যখন ইংরেজদের দুর্গ ঘিরে ফেলি, তখন চন্তু নায়ার নাকি সেই দুর্গেই ছিল। তারপর প্রাচীর টপকে মন্দিরের সামনে সমবেত মানুষের ভিড়ে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আম্পু নায়ারের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। তখনই শুরু হয় ভীম ও দুঃশাসনের যুদ্ধ। কিন্তু দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আম্পু নায়ার চন্তুকে পরাজিত করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক সময় পা ফসকে যাওয়ার ফলে চন্তু ভূপতিত হলো। তারপর শুরু হয় কুস্তি। কিন্তু তাতেও আম্পু নায়ার নাকি ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

এমন সময় একটি যুবক চন্তুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যুবকটি আম্পুর অনুচর। তার হাতেই চন্তুর মৃত্যু ঘটে।

রাজা আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে সে যুবক? চন্তুকেও হারাতে পারে এমন ক্ষমতা কার? আমার তো ধারণা চন্তুকে পরাজিত করার মতো শক্তিমান কেরলে কেউ নেই।'

'শুনেছি, যুবকটির নাম কাম্মু। কৈনেরী বাড়িতে সে পাহারায় থাকতো।'

'ও। এখন চিনতে পেরেছি। আমাদের উন্নির ভাই। যুবকটির পৌরুষের পরিচয় এর আগেই একবার পেয়েছি। সত্যিই বুকের পাটা আছে।'

তারপর দুই রানীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রাজা বললেন, 'নাম্পি, আজ এঁরা দুজনে দেবীদর্শনে যেতে চান। এমন এবং তুমি এঁদের সঙ্গে গেলে ভালো হয়। রটনা যে ঘটনা নয়, তা লোকে নিজের চোখে দেখে জানুক, বুঝুক, এই আমি চাই।'

চব্বিশ

কর্নেল ওয়েলেসলির বিদায়ের দিন সমাগত।

তলশেরীর অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বেবরের পক্ষের লোকেরা দিনকে দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এমনকি আজকাল তারা কর্নেলকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে। ইতিমধ্যে একদিন তলশেরীতে খবর এলো, কোম্পানীর সৈন্যদের পরাজিত করে রাজা কোট্টায়াম দুর্গ দখল করেছেন। সংবাদটি এসে পৌঁছনোর পরই কর্নেল এবং সুপারভাইসারের দ্বন্দ্ব উগ্র রূপ ধারণ করল।

'কেরলবর্মা তো অনায়াসেই আমাদের পরাজিত করলেন।' বেবরের এই ব্যাঙ্গাত্মক কথায় সবাই বুঝল, তিনি ওয়েলেসলির দুর্বলতার প্রতি কটাক্ষ করছেন। তাঁর এই কথা শুনে কর্নেলের কানেও যেন জল গেল। এ কথার দ্বারা শুধু তাঁকেই নয়, তাঁর ভাইকেও উপেক্ষা করা হয়েছে বলে তিনি মনে করলেন।

ইতিপূর্বে কর্নেল ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেলকে জানিয়েছেন যে কেরলবর্মা পরাজিত হয়েছেন, সমস্ত রকমের বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে এবং সারা কেরলে স্থাপিত হয়েছে শান্তি। কর্নেলের ঐ সংবাদের উপর ভিত্তি করেই গভর্নর মারাঠাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ-যুদ্ধের সেনাপতির পদ দিয়েছেন কর্নেল ওয়েলেসলিকে। কিন্তু এখন কেরল-বর্মার বিজয়বার্তা হঠাৎ যেন কর্নেলের এতদিনকার সমস্ত গোপনীয়-তাকে ফাঁস করে দিল। এই ঘটনা প্রমাণ করে দিল যে, অতীতে কেরলবর্মা কোনোদিনই পরাজিত হন নি। সুতরাং কর্নেলের সংবাদ

মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কেবল তাই নয়, এই ঘটনাটি গভর্নর জেনারেলের বিরোধীদের হাতেও যেন তুলে দিল একটি মোক্ষম অস্ত্র। এতখানি অপমানিত কর্নেল অতীতে আর কোনোদিন হন নি। আজ তিনি গভর্নর জেনারেলের কাছে মিথ্যাবাদী।

কর্নেলের অসহায় ব্যাকুলতা যতই বাড়তে লাগল, ঠিক সেই পরিমাণে বেবরেরও আনন্দ বৃদ্ধি পেতে লাগল। কর্নেল কোনোদিন বোম্বাই সরকার এবং সিভিল অফিসারদের গ্রাহ্য করেন নি। সুতরাং আজ তাঁরা সবাই কর্নেলের পরাজয়কে নিজেদের জয় বলেই মনে করতে লাগলেন। এই পরাজয় কর্নেলের সমস্ত দম্ভ ও অহঙ্কার ভেঙে চুরমার করে ধূলিলুণ্ঠিত করে দিল।

এই উদ্বিগ্নতার মধ্যেও কর্নেল কোম্পানীর বিরোধীদের পক্ষে যারা তলশেরীতে কাজ করেছে, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। চিরুতাকুট্টি সম্পর্কে তদন্তের ফলে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলো এখন তাঁর হাতেই আছে। ঐ সব তথ্যের ভিত্তিতে তিনি আলীমূসা, চিরুতা এবং লুঈ পেরেরাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে মনস্থ করলেন। মূসাকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে যে লোক পাঠানো হয়েছিল তার মারফত কর্নেল জানতে পারলেন যে, তিনি তিন-চার দিন আগেই সিংহলে চলে গেছেন।

সংবাদটি দেবার জন্য ওয়েলেসলি, বেবর এবং অন্যান্য সিভিল অফিসারদের নিজের দপ্তরে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা কেউই জানতেন না কর্নেল কেন তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

কর্নেলের দপ্তরে তখন উপস্থিত ছিলেন কেরলের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সব সেনাপতি এবং কর্নেলের দেহরক্ষী। বাকি আর সবাই এসে উপস্থিত হবার পর কর্নেল বললেন, 'দুদিন বাদেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি মাননীয় গভর্নর জেনারেলের নির্দেশে। আমার পর অন্য একজন কেরলের সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে আসবেন। কিন্তু এই অন্তবর্তী কালে কোম্পানীর কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে

পরিচালিত হয় তার একটি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। এইমাত্র খবর পেলাম সমগ্র দেশে এখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কেরল-বর্মার অত্যাচার এখনো দু-একটা অঞ্চলে অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব আবার বেড়ে গেল। এ ব্যাপারে সৈন্যদের করণীয় কি, সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করেছি। কিন্তু সিভিল কর্তৃপক্ষের সাহায্য না পেলে সৈন্যদল দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। তদুপরি এই শহরেই আমাদের বিরুদ্ধে একটি সংগঠিত দল গোপনে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে—তার প্রমাণও আমার হাতে আছে। অবিলম্বে এই দলটির মূলোচ্ছেদ করা দরকার। এ সম্পর্কে সিভিল কর্তৃপক্ষের দু-একজনের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও করেছিলাম। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়ায় সমস্ত কিছু তদন্ত করার ভার দেওয়া হয় দুজন মধ্যস্থ ব্যক্তির উপর। শর্ত ছিল, ঐ দুজনের প্রস্তাব কার্যকরী করতে আমরা বাধ্য থাকব। আজ সকালে আমি তাদের রায় পেয়েছি। তাদের প্রস্তাব অনুসারে, ঐ গুপ্ত দলটির নেতা আলীমূসা, চিরুতাক্কুটি এবং লুঈ পেরেরাকে সামরিক আইনানুযায়ী ফাঁসি দেওয়া উচিত এবং দলের অন্যান্যদের খুঁজে বের করে বন্দী করা উচিত। মিঃ বেবর, এ বিষয়ে আপনার মত কি?'

বেবরের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। মন তার বিক্ষুব্ধ। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি একটি কথাও বলতে পারলেন না। একটু পরে বললেন, 'আমার কাছে এ রায় আদৌ সঙ্গত মনে হচ্ছে না। যে বীরত্ব কেরলবর্মার সামনে দেখানো সম্ভব হলো না, তা আজ এই একটি অসহায় নারীর সামনে দেখানো হবে? নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু আলীমূসাকে তো আগেভাগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই না হলে কি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি! সে যাই হোক, এই সিদ্ধান্তের আমি ঘোরতর বিরোধী। এ বিষয়ে যা কিছু করার তা সিভিল কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত। সুতরাং আমি এ সম্পর্কে বোম্বাই সরকারের কাছে

লিখে জানিয়েছি। আমার মতে, যতদিন না সেখান থেকে কোনো উত্তর আসে, ততদিন কিছু করা অনুচিত হবে।'

বেবরের এই বক্তব্য চারিদিকের আবহাওয়াকে কেমন যেন অস্বস্তিকর করে তুলল। ঠিক সেই সময় একজন সৈনিক এসে জানাল, কেরলবর্মার কাছ থেকে দুজন দূত অত্যন্ত জরুরী বিষয়ে কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। খবরটি শুনে সকলেই আশ্চর্য হলেন।

'কে, দূত! কেরলবর্মাব কাছ থেকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এঁরা নাকি সোজা কোট্টায়াম থেকেই আসছেন।'

'কর্নেল সাহেবের বিদায় মুহূর্তে কিছু ভেট দেওয়ার জন্যই হয়তো কেরলবর্মা এই দূতদের পাঠিয়েছেন।' ব্যঙ্গাত্মক সুরে বেবর বললেন।

রাগতকণ্ঠে কর্নেল নির্দেশ দিলেন, 'তাদের ভিতরে আসতে বল।'

নিজের পদমর্যাদার উপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জিত চন্দ্রোত নাম্প্যার এবং আম্পু নায়ার সেখানে প্রবেশ করলেন। ওয়েলেসলি বাদে সেখানে উপস্থিত আর সবাই নাম্প্যারকে চিনতেন। চন্দ্রোত ও আম্পুর প্রতি কিছুক্ষণ ভালোভাবে লক্ষ্য করে কর্নেল স্থিব করলেন যে, দূতের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করাই সঙ্গত। তাই চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'বসুন।'

চন্দ্রোত নাম্প্যার ও আম্পু নায়ার আসন গ্রহণ করলেন। 'আপনারা কেরলবর্মার কাছ থেকে আসছেন?' কর্নেল জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমরা কোট্টায়ামের মহামান্য নৃপতি কেরলবর্মার কাছ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এসেছি।'

'কেরলবর্মা বার্তা পাঠিয়েছেন! কিন্তু তার আগে আমিও আমার বক্তব্য জানিয়ে দিই যে, আপসের কোনো কথা যদি তাতে থাকে তবে ইতিমধ্যে তাব সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।'

সহজ একটি ছোট্ট হাসি হেসে নাম্প্যার বললেন, 'আমাদের বিজয়ী মহারাজ খুবই শান্তিপ্রিয় মানুষ। নিজের এবং দেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি সর্বক্ষণই যে কোনো রকমের আপস মীমাংসায় আসতে রাজী। কিন্তু আমাদের আজকের এই আগমনের কারণ সেটা নয়। তাঁর এই চিঠি পড়লে সমস্ত কিছু পরিষ্কার হবে।'

পত্রখানা নাম্প্যার কর্নেলের হাতে দিলেন। কর্নেল সেটা উলটে পালটে দেখে নিয়ে অনুবাদ করে তাঁকে শোনানোর জন্য চিঠিখানা সিক্কুবেরার হাতে দিলেন। দোভাষী সেটার আদ্যোপান্ত তর্জমা করে শোনাল।

সব শুনে কর্নেল যেন জ্বলে উঠলেন। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, 'নগণ্য এক রাজা, তাঁর এতখানি ধৃষ্টতা! আমার সঙ্গে এই জাতীয় ব্যবহার করবার সাহস তিনি পেলেন কোত্থেকে? তাঁকে বলবেন যে, কোম্পানী অপরাধীদের কখনো ক্ষমা করে না। একটি ইংরেজ সৈন্যও যদি তাঁর হাতে শাস্তি ভোগ করে, তাহলে সারা কেরল আমি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবো। কেরলবর্মার সমস্ত দর্প চূর্ণ করে দেবো।'

সিক্কুবেরা কর্নেলের এই কথা চন্ত্রোত নাম্প্যার ও আম্পু নায়ারকে অনুবাদ করে শোনালেন। . কিছুক্ষণ চিন্তা করে নাম্প্যার তার উত্তরে অত্যন্ত শান্তভাবে ফরাসী ভাষায় বললেন, 'রাজা সাহেব কোনোদিন নিরপরাধদের রক্তে কেরলের মাটি কলুষিত করেন নি। তিনি জানেন, মেজর হোম্‌স একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং ইংলণ্ডে তিনি অভিজাত মহলের একজন বলে গণ্য। রাজার কথাগুলোকে কর্নেল যদি গুরুত্ব না দিয়ে উপেক্ষা করেন, তাহলে তার ফল কি হতে পারে, তা বুঝা বোধ করি মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।—অবিলম্বেই বন্দী সেনানায়কদের পুরলী পাহাড়ে ফাঁসি দেওয়া হবে। তাই এখনো কর্নেলকে বিষয়টি ধীরস্থির ভাবে বিবেচনা করে দেখতে বলছি।'

উপস্থিত প্রায় সবাই নাম্প্যারের কথাগুলো দোভাষী ছাড়াই বুঝতে পারলেন। তাঁরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে

লাগলেন। একটি গ্রাম্য মহিলা ও একজন দোভাষীর জন্য যদি কয়েকজন বিশিষ্ট সেনানায়কের ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হয়, তাহলে তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। তাই এ ব্যাপারে তাঁরা কোনোক্রমেই একমত হতে পারলেন না। সমগ্র অবস্থা অনুধাবন করে বেবর বললেন, 'মেজর হোম্‌স একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। ইংলণ্ডে তাঁর স্থান সমাজের অতি উচ্চ স্তরে। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা যায়। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যদি তাঁদের জীবনহানি ঘটে, যদি তাঁদের মৃত গলিত দেহ কাক-শকুনির খোরাক হয় তাতেও বা কার কি আসে যায়! আমরা নিশ্চয়ই এতখানি মূর্খ নই যে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করবো। অপর পক্ষে, একটি গ্রাম্য মহিলা ও একজন দোভাষীকে অতি সাধারণ মনে করবার কোনো কারণ নেই। এখন তাদের ছেড়ে দেওয়া মানে কোম্পানীর সম্মান একেবারে রসাতলে যাওয়া।'

'আপনি কি বলতে চান মশাই?' উপস্থিতদের মধ্যে কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলেন।

একজন বললেন, 'আমরা এই সামান্য দুটি প্রাণের বিনিময়ে মেজর হোম্‌স ও অন্যান্যকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবো, বলতে চান? না, কখনই তা হতে পারে না। সাধারণ একটি মহিলার জন্য এতবড় শাস্তি ভোগ করবেন মেজর হোম্‌স? সবাই যে আমাদেরই দোষ দেবেন!'

অবস্থা যে তাঁর অনুকূলে নয়, সে কথা ওয়েলেসলির বুঝতে বাকি রইল না। অথচ কি যে করণীয়, তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। শ্যাম রাখবেন কি কুল রাখবেন, তাই স্থির করাই তাঁর কাছে এক প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। উপস্থিত সেনাপ্রধানদের কথার গুরুত্বও কম নয়। অন্য পরিস্থিতিতে রাজার এই শর্ত তিনি সানন্দে স্বীকার করতেন। কিন্তু এখন বেবরের উপস্থিতিতে এতে রাজী হওয়াটা

অপমানজনক মনে হলো তাঁর কাছে। এর ফলে যেন বেবরেরই জয় ঘোষিত হবে! এইসব সাতপাঁচ ভেবে তাঁর মন অশান্ত হয়ে উঠল। অথচ অন্য কিছু করারও নেই। তাই তিনি ফরাসী ভাষায় নাম্প্যারকে বললেন, 'আমি আপনাদের মতলব বেশ ভালো মতোই বুঝতে পেরেছি, অথচ একটি নীচ নারী এবং একজন দোভাষীকে হত্যা করে আমাদের কোনো লাভ দেখছি না। সুতরাং মেজর হোম্‌স এবং ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে মুক্ত করে আমাদের হাতে সঁপে দিলে এদের আমরা ছেড়ে দিতে পারি। তবে একটা কথা, কাল সন্ধ্যার আগেই ঐ দুজনকে এখানে পৌঁছে দিতে হবে।'

নাম্প্যার রাজী হয়ে বললেন, 'আপনার উচিত, হয় এখনই এই শর্তানুসারে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে দেওয়া অথবা এই মুহূর্তে চিরুতাকুট্টিকে তলশেরী থেকে সরিয়ে আপনাদের সীমার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া।'

বেবর বললেন, 'ও সবের কোনো দরকার হবে না। মেজর হোম্‌স প্রভৃতিকে এখানে পৌঁছে দিলেই আপনাদের লোককে আমি ছাড়িয়ে দেবো। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, এই আদান প্রদানের বিষয়ে মিঃ ওয়েলেসলির স্বীকৃতি আছে কিনা!'

কর্নেলের ব্যক্তিগত মতামত জানানোর মতো অবস্থা তাঁর নেই। তিনি বললেন, 'আপনাদের যা ইচ্ছা করুন।' বেবর এ কথা শুনে খুশীই হলেন।

'আপনাদের আর কিছু বলার আছে?' ওয়েলেসলি জিজ্ঞাসা করলেন।

চন্দ্রোত নাম্প্যার মালয়ালম্ ভাষায় উত্তর দিলেন, 'রাজার পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানানো বাকি আছে। আপনার যাত্রা শুভ হোক।'

কর্নেলের কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়ল। রাজার অভিনন্দন! এই অভিনন্দনের মাধ্যমে কি তাঁকে পরোক্ষে অপমান

করা হচ্ছে না! অসহ্য ক্রোধে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে কাউকে কিছু না বলেই তিনি ভিতরে চলে গেলেন। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারপর সভাও গেল ভেঙে।

বেবর বাইরে গিয়ে নাম্প্যারকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোম্পানীর হিতৈষী হয়েও আপনি রাজার দলে কি করে জড়িয়ে পড়লেন বলুন তো?'

'আমি কোম্পানীর হিতৈষী বলেই এই কাজে অগ্রসর হতে সাহস করেছি। আজ আমি যে প্রস্তাব এনেছি, আমি জানতাম কর্নেল বিষয়টিকে ভুল বুঝবেন। কিন্তু আশাও ছিল এই যে, আপনার মতো উদার লোক থাকার ফলে ভুল নাও বুঝতে পারেন। সত্যি কথা বলতে কি, অতীতে এক সময় আমি চিরুতাকুট্টির কাছে সাহায্য পেয়েছি। সুতরাং আজ এই বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করা আমার কর্তব্য বলে মনে করলাম।'

'সে আবার আপনাকে কি সাহায্য করেছে?'

'আপনার হয়তো মনে নেই, কিছু দিন আগে আমার আশ্রিত একটি মেয়েকে কয়েকজন সৈনিক জোরপূর্বক ধরে আনে। তখন আপনিই আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ঐ বিষয়ে চিরুতা আমাকে…'

'আপনি ন্যায়সঙ্গত কাজই করেছিলেন। তা না করলে এরা হয়তো মেয়েটিকে ফাঁসিকাঠেই ঝোলাত। তবে এখন আমি নিশ্চিত যে, চিরুতা অপরাধী। কারণ কেরলবর্মারই একটি আংটি নাকি তার হাতে আছে; এবং ঐ আংটির জন্যই তাকে রাজার দলের লোক বলে সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু তবুও কেন জানি না, বারবার আমার মনে হচ্ছে, চিরুতার কোনো দোষ নেই।'

'আংটির ব্যাপারে আপনি ওকে কোনরূপ সন্দেহ করবেন না। অতীতে কোনো এক সময়ে রাজা আমাকে ঐ আংটিটি পুরস্কার

দিয়েছিলেন। আর আমিও সেটি আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ চিরুতাকে দিয়েছিলাম।'

'তাই নাকি! আপনি আমার মন থেকে এক বিরাট সন্দেহ দূর করে দিলেন।' বেবর উচ্ছ্সিত আনন্দে বলে উঠলেন।

ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে তাঁরা তিনজন বেবরের বাংলোয় গিয়ে পেঁাছলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন চাকর ছুটে এসে ভীত সন্ত্রস্তভাবে বেবরের কানে কানে কি বলল। শুনে বেবর ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই যে দৃশ্য সকলের চোখে পড়ল, তা যেমন অচিন্তিত পূর্ব, তেমনই বিস্ময়াবহ! —মেঝেতে চিরুতার মৃতদেহ পড়ে আছে। অম্পু নায়ার ছুটে গিয়ে চিরুতার মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলে নিলেন। চোখ দুটি তাঁর সজল হয়ে এলো। নাম্প্যার নির্বাক এবং বেবর নিস্তব্ধ কঠিন হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ফিরবার পথে অনেকক্ষণ পর পথ চলতে চলতে আম্পু নাম্প্যারকে চিরুতার জীবন-কাহিনী শোনালেন। তাঁর স্ত্রী এবং চিরুতাক্কুট্টির মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়। টিপুর আক্রমণের সময় ওরা দুজনে মুসলমান দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে। তাঁর স্ত্রী অনন্যোপায় হয়ে আত্মহত্যা করে নিজের সম্মান রক্ষা করে। কিন্তু অবিবাহিতা যুবতী চিরুতা তাদের দাসী হিসাবে থেকে যায়। কিছুদিন পর একটি লোক তাকে কিনে নেয়। ইত্যবসরে লুঈ পেরেরার সঙ্গে চিরুতার পরিচয় হলো। এদিকে আম্পু নায়ার স্ত্রীকে খুঁজতে লাগলেন চারিদিকে। সেই সময়েই হঠাৎ জানতে পারেন যে, চিরুতা বেঁচে আছে। পেরেরার হাত থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য আম্পু চেষ্টা করেছিলেন। যাই হোক, সেই চিরুতার কাছ থেকেই তিনি স্ত্রীর আত্মহত্যার সংবাদ জানতে পারেন। তারপর হলো পটপরিবর্তন। বেবরের সান্নিধ্যে এলো চিরুতা। সমাজবহিষ্কৃতা নারীকে ঘরে নিলো না কেউ; অসহ্য কষ্ট সহ্য করে, বহু অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সামাজিক জীবনে প্রবেশ করতে চেয়েছিল সে। তারপর আম্পু যখন বুঝলেন, বেবর চিরুতাকে

গভীরভাবে ভালোবাসেন আর চিরুতাও ভালোবাসে বেবরকে নিবিড়ভাবে, তখন আর তিনি চিরুতার সামাজিক জীবন সম্পর্কে বেশী মাথা ঘামান নি।

সমগ্র কাহিনীটি শোনবার পর চন্দ্রোত নাম্প্যারের বুক থেকে শুধু বেরিয়ে এলো একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

পঁচিশ

কেরলবাসীদের পুরাতন রাজধানী ইংরেজ সৈন্যদের থেকে মুক্ত করার কথা রাতারাতি সারা কেরলে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের মনে জাগল সাড়া। কোট্টায়াম শহর থেকে পর্তুগালদের বিতাড়িত করার পর ইংরেজদের বিরুদ্ধে কেরলের রাজাদের এতবড় মহত্বপূর্ণ বিজয় আর কোনোদিন হয় নি। কন্যাকুমারী থেকে শুরু করে গোকর্ণম্ পর্যন্ত জনতা এই জয়ের জন্য রাজাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করল। উদ্দণ্ড শাস্ত্রী কোট্টায়াম রাজের প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'যুদ্ধে যেষা মহিত হওয়ে চণ্ডিকা মন্নি ধত্তে।' এখন পণ্ডিতেরা বললেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হলো। স্বয়ং ভগবতী শ্রীপোর্কলী হয়তো এই যুদ্ধে রাজা সাহেবের পক্ষে এগিয়ে এসেছিলেন। সংগ্রামের মাধ্যমে স্বদেশের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আনন্দে আনন্দিত আজ কেরলবাসীরা; গর্বিত তারা জাতির শৌর্য ও প্রতাপের শ্রেষ্ঠত্বে, অভিজ্ঞান যার কোট্টায়াম পুনরধিকার। শুধু তাই নয় জনসাধারণ আজ কেরলবর্মার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলতে লাগল, একমাত্র তিনিই কেরল সিংহ আখ্যায় বিভূষিত হওয়ার যোগ্য।

এদিকে রাজা সাহেব নিজের প্রাসাদে এমনভাবে দিন কাটাতে লাগলেন যে মনে হতে লাগল যেন যা ঘটেছে তা তাঁর কাছে এমন কিছুই নয়। রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে পার্ষদদলের সাথে আলোচনায় তাঁকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল। বিভিন্ন অঞ্চল

থেকে সামন্ত নৃপতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপহার নিয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতে লাগলেন। রাজা তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বিদায় দিতে লাগলেন।

তাঁর কথাবার্তায় সাক্ষাৎকারীরা অনুমান করলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি কোট্টায়ামেই থাকা স্থির করেছেন।

রাজা সাহেবের মনও ছিল খুব প্রসন্ন। ছোটরানী মাক্কম সম্পর্কে কিছু কিছু লোক এতকাল যে কুৎসা এবং অপপ্রচার চালিয়েছে, এতদিনে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। মাক্কমের অসুস্থতা সম্পূর্ণ না সারা অবস্থাতেই তাঁরা দেবীদর্শনে গেলে মাক্কমকে সচক্ষে দেখার জন্য পথে লোকের ভিড় হয়েছিল খুব বেশী।

ইতিমধ্যে একদিন তলশেরী থেকে চন্দ্রোত্তবাব এবং আম্পু নায়ার ফিরে এসে রাজার কাছে সমস্ত ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, এবং পরিশেষে তাঁরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করে বললেন যে, ওয়েলেসলির সঙ্গে যে শর্ত করা হয়েছে, চিরুতাক্কুট্টির মৃত্যুর ফলে এখন আর তার কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু রাজার মত ঠিক তার বিপরীত। শর্ত অনুসারে তিনি মেজর হোম্স এবং ক্যাপ্টেন স্টুওয়ার্টকে মুক্তি দেবেন স্থির করলেন। চোক্করায় তা সমর্থন করে বললেন, 'এদের আটক করে রাখায় আমাদেরই ক্ষতি হচ্ছে। আমরা যদি তাদের ছেড়েদি এবং প্রতিদানে কিছু দাবি না করি, তবে আমাদের উদার মনেরই একটা দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। এমন কি ওয়েলেসলিও এই ঘটনাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারবেন না। ফলে এও প্রমাণিত হবে যে ইংবেজদের প্রতি ভয়বশত আমাদের কোনো কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় না।'

চোক্করায়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে কেরলবর্মা চন্দ্রোত নাম্প্যারকে নির্দেশ দিলেন, 'এই দুইজন অফিসারকে তলশেরী নিয়ে গিয়ে কর্নেলের হাতে সমর্পণ করে এসো।'

যাওয়ার আগে রাজা নাম্প্যারকে দুটি বীর-কংকন এবং নানা

ধরনের জিনিস উপহার দিলেন। তারপর বিদায় মুহূর্তে তিনি বললেন, 'দিন কয়েকের মধ্যেই আমি বয়নাড় যাবো ভাবছি, একথা আগেই আমি তোমাকে জানিয়েছি। আশা করি, অতীতের মতো ভবিষ্যতেও তোমার যথাসাধ্য সাহায্য পাবো।'

আবেগে নাম্প্যারের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে এলো। তিনি বললেন; 'আপনি যেখানেই থাকুন, আমার কাছে পূজনীয় হয়েই থাকবেন। আশা করি, ভগবতীর কৃপায় অমঙ্গল কিছু ঘটবে না।'

নাম্প্যার চলে যাওয়ার পর আম্পু নায়ার অন্তঃপুরে গেলেন। তিনি শুনেছিলেন যে রানীর সঙ্গে উন্নিও সেখানে এসেছে। এতদিন তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয় নি। আম্পুর আগমনের সংবাদ পেয়ে রানী তাঁকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে ছিল উন্নি। আম্পু বুঝতে পারলেন যে তাঁর এই অন্তঃপুরে অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্য বড়রানী বুঝতে পেরেছেন।

'মাক্কম এখনো সম্পূর্ণ সেরে ওঠে নি; আশা করা যায়, দু-এক দিনের মধ্যেই সেরে উঠবে। ভয়ের কোনো কারণ নেই।' বড়রানী বললেন।

'দেখাশোনা যখন আপনি নিজেই করছেন, তখন আর ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে।'

'আমি নিজে আর কতটুকু দেখাশোনা করছি; সারাক্ষণ তো উন্নিই সেবা-শুশ্রূষায় লেগে আছে। এমন মায়া-মমতা আর শ্রদ্ধার সাথে সেবা করতে জীবনে আর আমি কাউকে দেখি নি। এক মুহূর্তের জন্যও ও মাক্কমকে ছেড়ে কোথাও যায় না।'

নিজের সামনে নিজেরই প্রশংসা শুনে উন্নির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। পরক্ষণেই বড়রানী আবার বললেন, 'আম্পু, তুমি খুব ভাগ্যবান। এই মাতৃহীনা মেয়েটিকে আমি চাই তোমার হাতেই তুলে দিতে।'

'সে কি বড়রানী, এবিষয়ে কি আমার মতামতের কোনো প্রয়োজন

নেই।' রাজার কণ্ঠস্বর শুনে সবাই চমকে উঠলেন। রাজা সাহেব আবার বললেন, 'এবিষয়ে অবশ্য আমি বড়রানীর সঙ্গে একমত নই। মাতৃপিতৃহীনাদের অভিভাবক হলেন স্বয়ং রাজা। সুতরাং কন্যাদানের ভার সম্পূর্ণ আমারই হাতে।'

লজ্জায় উন্নি আর সেখানে থাকতে পারল না, ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে মাক্কমের কাছে চলে গেল।

'সব ব্যাপারেই রাজার এই হস্তক্ষেপ কিন্তু আমরা সহ্য করবো না।'

'রাজাকে প্রয়োজনে সব কিছুই করতে হয়। ভালো কথা আম্পু, চন্তুর সাথে তোমার দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা শুনলাম।'

'অধীন তাতে পরাজিত হয়েছে।'

রাজা সহাস্যে বললেন, 'থাক, আম্পু তাহলে জীবনে অন্তত একবার পরাজিত হন। আমি জানতাম, চন্তু নায়ারকে মোকাবিলা করা চারটিখানি কথা নয়। খুব কৌশলে অগ্রসর না হলে তাকে পরাস্ত করা অসম্ভব। সময়মতো কাম্মু এগিয়ে না গেলে কী যে অবস্থা হতো ভাবতেও গা শিউরে ওঠে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার অনুমানই সত্য। চরম মুহূর্তে জীবন তুচ্ছ করে কাম্মু এগিয়ে এসেছিল। তার সাহসিকতা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

'আমি তার পরিচয় কৈনেরী-বাড়িতেই পেয়েছি। সে খুব বড় কোনো আঘাত পায় নি তো? কাল সকালে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে আমি আমার দেহরক্ষীর পদে নিয়োগ করতে চাই।'

'তাহলে আরো একটি কন্যাদানের বিষয় এখনই পাকাপাকি হয়ে যাক। মনে হচ্ছে আজ মহারাজ সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চান।' বড়রানী বললেন।

'সেটা আবার কি ব্যাপার?' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

বড়রানী ধীরকণ্ঠে নীলুক্কুট্টি এবং কাম্মুর ভালোবাসার কথা বিবৃত করলেন।

'তাহলে তো ভালোই হলো। শুভস্য শীঘ্রম্। বস্ত্র-দানের লগ্ন এখনই ঠিক করে ফেলা যাক।' (নায়ার সমাজে বস্ত্র-দান বিবাহ-কর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর কনের হাতে বস্ত্র দিয়ে তাকে সহধর্মিণী হিসেবে গ্রহণ করার শপথ নেয়।)

উভয়ের বিবাহ-অনুষ্ঠান রাজার উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হলো। এ ব্যাপারে মাক্কমেরও আনন্দ কম নয়। তিনি বললেন, 'উন্নির সেবাই আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। এমন গভীর মমতার সাথে আমাকে সেবা করার শক্তি ও উৎসাহ সে কোথায় পেলো আজ তা বুঝতে পেরেছি।' উন্নি এ কথায় লজ্জা পায়। মুখ তার আরক্তিম হয়ে ওঠে।

উন্নিমুপ্পনের হেপাজতে আগেই বন্দী হোম্স এবং স্টুয়ার্টকে চন্ত্রোত আনা হয়েছিল। রাজার নির্দেশানুযায়ী চন্ত্রোত নাম্প্যার তাদের নিয়ে ওয়েলেসলির কাছে গেলেন। ওয়েলেসলি ততক্ষণে জাহাজ ঘাটে পৌঁছে গেছেন। রওনার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে, বিভিন্ন পদস্থ কর্মচারী এবং অফিসাররা তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। বেবরও ছিলেন সেখানে। অসাফল্য ও ব্যর্থতার যন্ত্রণা মুখাবয়বে স্পষ্ট ধরা পড়লেও ওয়েলেসলি তা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। হঠাৎ এক সময় সুপারভাইসারের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'মিঃ বেবর, আমি আজ কেরল ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি চেয়েছিলাম কেরলবর্মাকে দমন করে দেশে পূর্ণ শান্তি স্থাপন করতে। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমার সেই মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারল না, একথা আজ আমি স্বীকার করছি। মেজর হোম্স এবং ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আজও শত্রুর কয়েদে বন্দী। লজ্জায় অপমানে আমার মাথা নত হয়ে আসছে। তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে

আবার হয়তো আমি এখানে আসবো এবং আমার অসম্পূর্ণ কাজ পূর্ণ করে তবে ফিরবো। যতদিন না কেরলবর্মা পরাজিত হন, ততদিন আমি নিজেকে পরাজিতই মনে করবো।'

'আপনি অহেতুক উদ্বিগ্ন হবেন না।' বেবর সান্ত্বনার বাণী শোনালেন, 'এখানে শান্তি স্থাপনের জন্য আপনার মতো মহারথীর প্রয়োজন হবে না। সবকিছু আস্তে আস্তেই ঠিক হয়ে যাবে।'

ঠিক সেই সময় একজন সৈনিক এসে দুজন বন্দীসহ রাজার কাছ থেকে একজন দূতের আগমন-সংবাদ ওয়েলেসলিকে জানাল।

সেখানে আসবার অনুমতি পেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রোত নাম্প্যার এসে উপস্থিত হলেন এবং ওয়েলেসলিকে ফরাসী ভাষায় বললেন, 'ভগবান আমাদের ইচ্ছা পূরণ হতে দিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মহান রাজা আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে এই দুজন বন্দীকে মুক্তি দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, কর্নেল ওয়েলেসলি এদেশ থেকে ফিরে যান সন্তুষ্ট ও আনন্দিত মন নিয়ে।'

ম্লান মুখে বিবর্ণ হাসি হেসে ওয়েলেসলি ফরাসী ভাষায় উত্তর দিলেন, 'রাজাকে বলবেন যে, মনত্তনায় আমাদের সৈন্যদের ব্যাপক ভাবে হত্যা করে কিংবা কোট্টায়ামে নিজের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি আমাকে পরাজিত করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর উদার মনোভাবপ্রসূত এই কাজের ফলে আমি এখন নিজেকে পরাজিত বোধ করছি। কোম্পানীকে এই ধরনের একজন মহাপ্রাণ নৃপতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে বলে ব্যক্তিগতভাবে আমি দুঃখিত। আমি নিজে গভর্নর জেনারেলের কাছে রাজার এই উদার মনোভাবের কথা জানাবো।'

পরক্ষণেই নাম্প্যারও রাজার পক্ষ থেকে ওয়েলেসলির কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। সত্যমুক্ত হোম্‌স এবং স্টুওয়ার্ট সমবেত অফিসারদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। এবং তাঁরা কর্নেলের

অনুগমন করবার অনুমতি পেলেন। সমবেতদের জয়ধ্বনির মধ্যে অনুচরবৃন্দসহ কর্নেল জাহাজে উঠলেন।

তারপর জাহাজ-ঘাট থেকে যে যার গন্তব্য স্থানের দিকে প্রস্থান করল। বেবর চন্দ্রোত নাম্প্যারকে বললেন, 'ওঃ! এই কর্নেলটি যে আমাদের সঙ্গে কত রকমের চালাকি খেলে গেল, তার আর হিসাব নিকাশ নেই। এখানে রাজার পক্ষের কোনো গুপ্তচর থেকে থাকে তো সে ছিল আলীমূসা মারাক্কার। সে তো চলে গেছে আগেই।'

নাম্প্যার বললেন, 'এখানেও গুপ্তচর কেউ ছিল নাকি? ভাবতেও যেন কেমন লাগে!'

'আজ আপনি কোম্পানীর সত্যি একটি বিরাট উপকার করলেন। কর্নেলের বিদায়ের পরও ঐ তুজন বন্দী অবস্থায় থাকলে তাদের মুক্তির ভার এসে পড়তো আমার উপর।'

'এটুকু যে আমি করতে পেরেছি তার জন্য সত্যই আমি আনন্দিত।'

'চলুন, একটু কফি খেয়ে বাংলোয় ফেরা যাক।'

দিন তুই পরে রাজা নিজের তুইজন সচিবের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় চোক্করায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে পাশে বসিয়ে বললেন, 'ভাই, আমার একটা তুঃখ রয়ে গেল। সেটা হলো আমার সঙ্গে থাকতে আপনার অসম্মতি।'

'আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকতে পারা আমি সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করি। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমাকে আমার জন্মভূমি ডাকছে অহরহ। সে ডাকে সাড়া দেওয়া আমার প্রধান কর্তব্য।'

'এই ব্যাপারে আমি আপনাকে কখনো বাধা দেবো না। আজকের দিনে নিঃসন্দেহে মহীশূরে আপনার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক।

আপনাদের যুবরাজ এবং তাঁর সহধর্মিণীকে জানাই আমার অভিনন্দন। নিজের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার প্রমাণস্বরূপ আমি যে উপহার প্রেরণ করছি আপনার হাত দিয়ে. দয়া করে তা আমার হয়ে আপনি তাঁদের হাতে তুলে দেবেন।'

'সেখানকার সবাই আপনার ঔদার্য সম্পর্কে অবহিত। কাজেই সে কথার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। দেবীর অনুগ্রহেই আমি এতদিন আপনার সঙ্গে থাকতে পেরেছি। আমার সৌভাগ্য যে, আপনার অফুরান ভালোবাসা এবং বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি।'

'ওকথা বলবেন না। আমি তো জানি আপনি আমায় কতখানি সাহায্য করেছেন। তার জন্য সারা জাবন আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। আপনারই জন্য আমি এখানে, এই রাজমহলে আবার মর্যাদার সঙ্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি। কোট্টায়াম শহরের বিজেতা আমি নই। বিজেতা হচ্ছেন চোক্করায় নিজে।'

বিনয় প্রকাশ মহাত্মাদের সবচেয়েও বড় গুণ। চোক্করায় বললেন, 'কাজেই আপনার এই কথায় আমি আশ্চর্য হচ্ছি না। কিন্তু তবুও বলবো, এই বিজয়ে আমার অংশ অতি নগণ্য।'

'বয়নাড়ুর অবস্থা এর চেয়েও ভালো। আপনি সেখানে যে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে যতদিন না কোনো প্রতিবন্ধ ঘটে, ততদিন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শত শত ওয়েলেসলি এসেও আমাদের বয়নাড়ুকে পদানত করতে পারবে না।'

'ভগবানের কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা যেন বয়নাড়ুর দিকে যাওয়ার আপনার কোনো প্রয়োজনীয়তা না ঘটে।'

'বর্তমানে আমি এখানেই থাকবো ঠিক করেছি। তলক্কল চন্তু বলছে, বয়নাড়ুতে আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ় করা হয়েছে। ওয়েলেসলির পরিবর্তে যে সেনাপতি আসছে তার সঙ্গেও একবার মোকাবিলা করতে হতে পারে।'

'তাহলে আমি এখন আসি।' চোক্করায় বললেন।

বাজা সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে চোক্করায়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চোক্করায় বয়নাড়ু হয়ে যাবেন। তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য এমন নায়ারকে নির্দেশ দেওয়া হলো।

চোক্করায়কে বিদায় দিয়ে রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। সেখানে মাক্কমের সঙ্গে উন্নি এবং নীলুক্কুট্টিও উপস্থিত ছিল। বাজাকে আসতে দেখে তারা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল।

'এখানে আসার সময় হলো তাহলে?' মাক্কম জিজ্ঞাসা করলেন।

'সে কি! আমি কি তাহলে অসময়ে এলাম?'

'অসময়! বেশ তো অমাবস্যার চাঁদ হয়ে ছিলে?'

'একথা কেন বলছ বলতো? যাক শোন, এখন দিন কয়েক এখানেই থাকবো ঠিক করেছি।'

'সেকথা আমি আগেই দিদির কাছ থেকে শুনেছি। কিন্তু আমার একটিমাত্র প্রার্থনা আছে, এবার পাহাড়ে গেলে দয়া করে আমাকেও তোমার সঙ্গে নেবে কিন্তু। তুমি বাড়িতে রেখে চলে যাও আর লোকে আমার নামে অপবাদ ছড়ায়। আর তোমারও ধারণা ... আমি বুঝি খোঁপায় ফুল গুঁজে সাজগোজ করে থাকি। স্বামী যার অরণ্যে পর্বতে, সে কখনো আনন্দে থাকতে পারে? মেয়েদের সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় অপবাদ আর কি হতে পারে?'

'আমি জানি, ওটা আমার ভুল হয়েছিল। তাই প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনোদিন ঐ ধরনের কিছু লিখবো না, কেমন, হলো তো?'